কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পঞ্চম খণ্ড

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৯৫৪

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রক :

মনোজ বিশ্বাস

শ্রীবিজয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন

কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
মন পবন
অদৃশ্য শত্রু
প্রজাপতি রঙ
চাবের অঙ্ক
আদিম রিপু

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

ভূমিকা

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে একটি অতি-পরিচিত নাম। তিনি সামাজিক, রোমান্টিক নানা প্রকারের গল্প-উপন্যাস রচনা করলেও রহস্যলেখক হিসাবে তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে 'ক্রাইম' বিষয়ক রচনা বহুদিন ধরে চলে আসছে। অনেক প্রথম শ্রেণীর লেখক এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্যেও কয়েকজন লেখক রহস্য-কাহিনী রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নীহার-রঞ্জন গুপ্তের নাম নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য।

বাঙ্গালীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে রহস্যের উপকরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, আমাদের জীবন পরিবারের বাইরে বেশিদূর বিস্তৃত নয়। তবে এ কথা সত্য, আমাদের জীবনেও নানা প্রকারের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হবার সূচনা দেখা দিয়েছে; যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি নাগরিক হয়ে উঠেছি এবং পাশ্চাত্ত্য ধরনে জীবনের মানকে তৈরী করতে গিয়ে তার অনুকরণে আমরা আমাদের জীবনকেও নানা ভাবে জটিল করে তুলতে আরম্ভ করেছি। বর্তমান জগতে অপরাধ-প্রবণতাও আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষও ক্রমশঃ নানা ভাবে অনেক অপরাধ-চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে অপরাধ-বিষয়টি কেবল-মাত্র একটি স্বতন্ত্র উপাদান হিসাবেই নয় বরং স্বাভাবিক সূত্রেই বাংলা কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক সমাজের মধ্যে এই নবজাত অপরাধ জগতের অনেক অভাবনীয় গোপন তথ্য সুকৌশলে আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

সোনা-চোরাইকারবারী একটি দলকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিতে কি ভাবে কিরীটী রায় সাহায্য করল, 'মন-পবন' কাহিনীটিতে তার এক লোমহর্ষক বিবরণ আছে। আজকের সমাজ-জীবন আমাদের যে ভাবে চলছে, তাতে এই ধরনের কাহিনী অতিরঞ্জিত কিংবা অসম্ভব বলে আর মনে হয় না। অপরাধ জগৎটি জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই থাকে, সেইজন্যে যখনই তার কোন ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন তা আমাদের কাছে অসম্ভব এবং অবাস্তব বলে মনে হয়ে সহসা চমকের সৃষ্টি করে। কিন্তু অপরাধ-জগতের নিয়মে তা স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ বাস্তব। সেইজন্যই কাহিনীগুলোর একটি বিশেষ মূল্য আছে। নীহারবাবুর প্রধান কৃতিত্ব তিনি কোথাও তাঁর কাহিনীকে থামিয়ে রাখেন না, দুরন্ত গতিতে পরিণতির পথে তাঁর কাহিনী এগিয়ে চলে এবং সে পরিণতি এমন আকস্মিক যে তার চমক কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। রহস্য-কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঘটনার

আকস্মিকতা এবং চমক। এর কোনটির ঘাটতি নীহারবাবুর কাহিনীর মধ্যে নেই। 'মন-পবনে'র পটভূমি শহর-কলকাতা, কিন্তু পরিবেশ বর্ণনায় লেখক পরিচিত শহরকেও রহস্য-লোকে পরিণত করেছেন, কলকাতা হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী। নীহারবাবুর অপর কৃতিত্ব তিনি চরিত্র আঁকেন না, তার ছবি তুলে রাখেন। অল্প কথায় একটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। যেমন, একদা ব্যারাকপুর থানার ও. সি. নির্মলশিববাবুর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—

'মোটাসোটা নাদুসনুদুস নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের ভুঁড়িয়াল সেই ভদ্রলোক এবং দেহের অনুপাতে পদযুগল যার কিঞ্চিৎ ছোট এবং চৈনিক প্যাটার্নের বলে বাজারের যাবতীয় জুতোই যার পায়ে কিছুটা সর্বদাই বড় হত।'

নীহারবাবুর বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি রহস্য-কাহিনী রচনা করতে বসে পরিবেশকে অকারণে থমথমে করে তোলেননি। বাঙ্গালী ঘরের পারিবারিক জীবনের ছোটখাটো রসঘন মুহূর্তগুলো সুপরিচ্ছন্ন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোয়েন্দা কিরীটী রায় এবং তার পত্নী কৃষ্ণার ঘরোয়া মুহূর্তগুলো এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়।

'অদৃশ্য শত্রু' ভিন্ন স্বাদের গল্প। এর সময় বেছে নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কাল। সে সময়কার কলকাতার পরিবেশ রচনায় লেখক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কল্পনা কোথাও বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায়নি। পাত্রপাত্রী নির্বাচনে এবং খুনের উপকরণ সংগ্রহে তিনি যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কাহিনীর মধ্যে এনেছেন, ফলে কাহিনীটিকে কোথাও অবাস্তব বলে মনে হয় না। এ গল্পে কিরীটী রায়ের আবির্ভাব অনেক পরে। কিরীটী রায় পাঠকের কাছে যে কত প্রিয় তা এ গল্প পাঠেই বোঝা যায়। তার আবির্ভাবের জন্য পাঠককে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, কেননা তার কাছে পাঠকের অনেক প্রত্যাশা। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হয় না, আমাদের সব প্রত্যাশাই মিটিয়ে দেয়। উৎকণ্ঠা (suspense) সৃষ্টি করা এবং শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করা—এ দুটিই নীহারবাবুর সহজ আয়ত্তাধীন। নীহারবাবুর কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিনি অকারণে কাহিনীকে পল্লবিত করেন না। প্রতিটি ঘটনা কাহিনীর অনিবার্য ধারায় সংঘটিত হয় এবং প্রতিটি চরিত্র কাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গ। তাঁর বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ পূর্বাপর কৌতূহল রক্ষা করে কাহিনীগুলোকে উপাদেয় করে তুলেছে। এক নিশ্বাসে দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছুতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

'প্রজাপতি রঙ' শ্বাসরুদ্ধকারী অপরাধ-কাহিনী। 'ওয়াগন ব্রেকারে'র দলকে ধরতে এসে সত্যসন্ধানী কিরীটী রায় কি ভাবে কতকগুলো নিষ্ঠুর হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করল

এই কাহিনীটিতে তারই রোমাঞ্চকর বিবরণ শুনতে পাওয়া যায়। কাহিনীটি কেবল অপরাধ আর অপরাধীদের নিয়েই লেখা গল্প নয়, তার মধ্যে দুই বোন মাধবী আর সাবিত্রীর দুটি সরস চরিত্র আছে। একই বাড়ির মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বাইরের কোন মিল নেই—একজন মধ্যাহ্নের দীপ্তসূর্য, আর একজন ভোরের শুকতারা; একজন আলো, একজন ছায়া। পাশাপাশি দুটি স্রোত বয়ে গেছে—একদিকে ভয়ঙ্কর হত্যার লীলা, আর একদিকে নতুন সম্পর্ক গড়ার স্বপ্ন।

বাংলা সাহিত্যে অপরাধমূলক কাহিনীকে সাহিত্যরসসিক্ত করবার গৌরব নিঃসন্দেহে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের প্রাপ্য। তিনি তাঁর কাহিনীগুলোর মধ্যে মনে উঁকি-মারা সব কটি প্রশ্নেরই বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাঁর কাহিনীকে ধাপে ধাপে এমন জায়গায় এগিয়ে নিয়ে যান যে সেখান থেকে ফিরে আসা আর সম্ভব হয় না। লেখার ভঙ্গীটি একেবারেই তাঁর নিজস্ব। তিনি স্বভাব-ঔপন্যাসিক। লেখনীর সামান্য স্পর্শে রহস্যের সমস্ত দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়; যার জন্য তাঁকে ভাবতে হয় সামান্যই, কিন্তু পাঠককে ভাবিয়ে তোলে শুরু থেকেই। নীহারবাবুর অনেক অনুকরণকারী থাকতে পারে, থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

মন পবন

সেই মুখখানা যেন আজও ভুলতে পারিনি।

সত্যি, এমন এক একটি মুখ এক এক সময় আমাদের চোখে পড়ে যা কখনও বুঝি মনের পাতা থেকে মুছে যায় না।

সে মুখের কোথায় যেন এক বিশেষত্ব মনের পাতায় গভীর আঁচড় কেটে যায়।

এবং সেই মুখখানা যখনই মনের পাতায় ভেসে উঠেছে তখনই মনে হয়েছে কেন এমন হল! শেষের সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের জন্য দায়ী কে!

কিরীটীর মতে অবিশ্যি সেই বিচিত্র শক্তি যে শক্তি অদৃশ্য, অমোঘ সেই নিয়তি, নিষ্ঠুর নিয়তিই দায়ী।

কিন্তু তবু আমার এক এক সময় মনে হয়েছে সত্যি কি তাই, পরক্ষণেই আবার মনে হয়েছে তাই যদি না হবে তো এমনটাই বা ঘটে কেন?

ঘটছে কেন?

থাক।. যার কথা আজ বলতে বসেছি তার কথাই বলি।

কিস্তি।

কথাটা বলে কিরীটী হাত তুলে নিল।

দেখলাম শুধু কিস্তিই নয়, মাত।

পর পর তিনবার মাত হলাম এইবার নিয়ে এবং ব্যাপারটা যে সুখপ্রদ হয়নি সেটা বোধ হয় আমার মুখের চেহারাতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

এবং কিরীটীর নজরেও যে সেটা এড়ায়নি প্রকাশ পেল তার কথায় পরক্ষণেই।

বললে, কি রে, একেবারে যে চুপসে গেলি। মাত হয়েছিস তো আমার হাতে—

অদূরে সোফায় বসে কৃষ্ণা একটা নভেল পড়ছিল। এবং এতক্ষণ আমাদের খেলার মধ্যে একটি কথা বলেনি বা কোন মন্তব্য প্রকাশ করেনি।

কিরীটীর ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণে সে কথা বললে, হ্যাঁ, কিরীটী রায় যখন তখন মাত হওয়াটাও তো তোমার গৌরবেরই সামিল হল ঠাকুরপো তার হাতে।

কিরীটী দেখলাম তার স্ত্রীর দিকে একবার আড়চোখে তাকাল মাত্র কিন্তু কোন কথা বলল না।

কৃষ্ণা স্বামীর আড়চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করেও যেন লক্ষ্য করেনি এমনি ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললে, তবে তোমাকে একটা সংবাদ দেওয়া

কর্তব্য বলে বোধ করছি, ভদ্রলোক নিজেও এবারে মাত হয়েছেন।

কিরীটী তার ওষ্ঠধৃত পাইপটায় একটা কাঠি জেলে পুনরায় অগ্নি-সংযোগে উদ্যত হয়েছিল, হঠাৎ তার উদ্যত হাতটা থেমে গেল এবং স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, কি বললে?

বললাম আপনিও এবারে মাত হয়েছেন!

কথাটা বলে যেন একান্ত নির্বিকার ভাবেই কৃষ্ণা নভেলের পাতায় আবার মনঃসংযোগ করল।

মাত হয়েছি?

হুঁ।

পূর্ববৎ সংক্ষিপ্ত জবাব।

মানেটা যদি বুঝিয়ে বলতে সখি!

মানে?

হুঁ।

সে তো অতিশয় প্রাঞ্জল, বেচারী নির্মলশিব সাহেব না বুঝতে পারলেও আমার কিন্তু বুঝতে দেরি হয়নি।

কি, ব্যাপার কি বৌদি! আমি এবার প্রশ্নটা না করে আর পারলাম না। কিরীটী মাত হয়েছে, বেচারী নির্মলশিব সাহেব—

এতক্ষণে কিরীটী হো হো করে হেসে ওঠে।

এবার আমি কিরীটীকেই প্রশ্ন করি, ব্যাপার কি রে?

জ্বলন্ত পাইপটায় একটা সুখটান দিয়ে কিরীটী বললে, তোকে বলা হয়নি সুব্রত, গত এক মাস ধরে নির্মলশিব সাহেব আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

তা যেন বুঝলাম, কিন্তু নির্মলশিব সাহেবটি কে?

মনে নেই তোর, সেই যে 'কি আশ্চর্য' নির্মলশিব সাহেব! একদা ব্যারাকপুর থানার ও. সি. ছিল, বছর দুই হল হেডকোয়ার্টারে বদলি হয়ে এসেছে!

এতক্ষণে আমার মনে পড়ে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহারাটিও মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

মোটাসোটা নাদুসনুদুস নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের ভুঁড়িয়াল সেই ভদ্রলোক!

এবং দেহের অনুপাতে পদযুগল যার কিঞ্চিৎ ছোট এবং চৈনিক প্যাটার্নের বলে বাজারের যাবতীয় জুতোই যার পায়ে কিছুটা সর্বদাই বড় হত!

যার প্রতিটি কথার মধ্যে বিশেষ মুদ্রাদোষ ছিল, 'কি আশ্চর্য'!

বললাম, হঠাৎ সেই নির্মলশিব সাহেব তোকে গত একমাস ধরে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, মানে ?

বলিস না আর তার কথা। আমিও শুনব না, সেও শোনাবেই।

কৃষ্ণা ঐ সময় টিপ্পনী কেটে বলে ওঠে, অত ভণিতার প্রয়োজন কি ? কেউ কোন কথা দশ হাত দূরে বসে বললেও যার ঠিক ঠিক কানে যায় সে ঐ ভদ্রলোকের কথা শোনেনি এ কথাটা আর যেই বিশ্বাস করুক ঠাকুরপোও বিশ্বাস করে না— আমিও করি না। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতেই বা অত লজ্জা কিসের! কেন বলতে পারছ না, শুনে বুঝতে পেরেছ, রীতিমত জটিল ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত মাত হবে তাই শুনেও না শোনার ভান! এড়িয়ে যাবার অছিলা করছ একমাস ধরে!

তাই সখি, তাই। পরাজয় স্বীকার করছি, হার মানছি। কিরীটী বলে ওঠে।

হ্যাঁ, তাই স্বীকার কর, তাই মান।

বললাম তো, তোমার কাছে হার মানি সেই তো মোর জয়। কিরীটী হাসতে হাসতে আবার বলে।

কথা বললাম এবার আমি।

কিন্তু কি ব্যাপারটা রে ?

কে জানে কি ব্যাপার। বলছিল—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, সে বলে, ঐ যে এসে গিয়েছেন জুতো!

জুতো ?

হ্যাঁ রে, মনে নেই তোর, নির্মলশিব সাহেবের জুতো সম্পর্কে তার অধীনস্থ কর্মচারীদের সেই বিখ্যাত রসিকতাটা! কে যায় ? জুতো। কার ? না ভুঁড়ির। ভুঁড়ি কার ? নির্মলশিব সাহেবের। সাহেব কোথায় ? আর একটু উপরে—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সত্যি সত্যি নির্মলশিব সাহেবই ঘরে এসে প্রবেশ করল।

এবং ঘরে ঢুকেই আমার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইল।

তারপরই হঠাৎ ভ্রূ সোজা হয়ে এল এবং সহাস্য মুখে বলে ওঠে, কি আশ্চর্য! আরে সুব্রতবাবু না ?

হ্যাঁ, নমস্কার। চিনতে পেরেছেন তাহলে!

চিনব না মানে? কি আশ্চর্য। বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে নির্মলশিব সাহেব।

বসুন নির্মলশিববাবু। কিরীটী এবার বলে।

কি আশ্চর্য! বসব না? আরে বসবার জন্যেই তো আসা! আর আজ যতক্ষণ না হঁ্যা বলবেন উঠব না—একেবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই এসেছি।

কথাগুলো বলতে বলতে জাঁকিয়ে বসে নির্মলশিব এবং কথা শেষ করে বলে, এই বসলাম!

কি ব্যাপার বলুন তো নির্মলশিববাবু? এবারে আমিই প্রশ্ন করি।

কি আশ্চর্য! কিছুই জানেন না সত্যি বলছেন আপনি?

সত্যিই জানি না।

কি আশ্চর্য! আরে মশাই সে এক বিশ্রী নাজেহালের ব্যাপার। বুঝলেন কিনা সুব্রতবাবু, গোল্ড, একেবারে যাকে বলে সত্যি সত্যি pure gold মশাই।

গোল্ড।

হঁ্যা, হঁ্যা—সোনা, খাঁটি সোনা এন্তার স্মাগল করছে।

॥ দুই ॥

নির্মলশিববাবুর মুখে গোল্ড এবং সেই গোল্ড স্মাগল—কথা দুটি শুনেই বুঝেছিলাম তার বক্তব্যটা কোন পথে এগুচ্ছে।

এখন আরও স্পষ্ট হল।

নির্মলশিববাবু আবার বলতে শুরু করে, কিছুই খবর রাখেন না দেখছি!

মৃদু হেসে বললাম, আদার ব্যাপারী আমি। ওসব সোনাদানার ব্যাপার—কিন্তু কিরীটীর শরণাপন্ন হয়েছেন যখন—

সাধে কি আর হয়েছি মশাই! আমি তো ছাড়, সরকারের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ, কাস্টমস্ এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ সকলের চোখে ধুলো দিয়ে স্রেফ যাকে বলে সকলকে একেবারে গত কয়েক মাস ধরে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়ে দিল!

বুদ্ধু?

তা না হলে আর বলছি কি! স্রেফ বুদ্ধু!

তা কোন হদিসই করতে পারলেন না এখনও?

কি আশ্চর্য! কি বললাম তবে?

তা যেন হল, কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ কেমন করে আপনাদের নজরে এসে পড়ল—অর্থাৎ বলছিলাম, ব্যাপারটা টের পেলেন কি করে? শুধালাম।

কিরীটী কিন্তু একান্ত নির্বিকার ভাবে পাইপ টেনেই চলেছে সোফায় হেলান দিয়ে দুটি চক্ষু বুজে তখন।

কিন্তু যতই সে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে থাকুক না কেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম তার ঐ নিষ্ক্রিয়তা আদৌ নিষ্ক্রিয়তা নয়, রীতিমতই যাকে বলে তার শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

অনাগ্রহের ভাবটা তার ভান মাত্রই।

কি আশ্চর্য! সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার! আবার কথা বলে নির্মলশিব।

কি রকম? শুধালাম।

একটা চিঠি—

চিঠি?

হ্যাঁ। একটা বেনামা চিঠি পেয়ে কর্তাদের সব টনক নড়ে উঠেছে। তাঁদের টনক নড়েছে—আর প্রাণান্ত হচ্ছে আমাদের।

তা সে বেনামা চিঠিটা আপনি দেখেছেন?

তা আর দেখিনি, কি আশ্চর্য! কি যে বলেন?

কি লেখা ছিল চিঠিতে?

কি আশ্চর্য! মুখস্থ করে নিয়েছি চিঠিটা, আর কি লেখা ছিল তা মনে থাকবে না? শুনুন, লিখেছে, মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের সমীপেষু—ভেবে দেখুন একবার সুব্রতবাবু, ইয়ার্কির মাত্রাটা। কমিশনার বাহাদুরের সমীপেষু, কেন রে বাপু, পাকামি করতে কে বলেছিল, জানাতে যদি হয় তো আগে আমাদের জানালেই হত।

তা তো নিশ্চয়ই।

তবেই বুঝুন! পাকামি ছাড়া কি আর বলুন তো!

কিন্তু চিঠিতে কি লেখা ছিল যেন বলছিলেন—

হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি, লিখেছে, আপনি কি খবর রাখেন স্বাধীন ভারত থেকে একদল চোরাকারবারী কত সোনা গত এক বছর ধরে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আমেরিকায় চালান করে দিয়েছে আর আজও দিচ্ছে? এখনও যদি ঐভাবে সোনার চোরাই রপ্তানিতে বাধা না দিতে পারেন তো জানবেন আর দু' এক বছরের মধ্যে এক তোলা বাড়তি সোনাও এ দেশে আর থাকবে না।

বলেন কি, সত্যি ?

কি আশ্চর্য ? সত্যি মানে, চিঠিতে তো তাই লিখেছে—

লিখেছে বটে, তবে—

তবে কি ?

মানে উড়ো চিঠি তো—

মানে ?

মানে বলছিলাম, এমনও তো হওয়া অসম্ভব নয় যে আপনাদের খানিকটা নাজেহাল করার জন্যই কোন দুষ্টপ্রকৃতির লোক ঐ উড়ো চিঠিটা দিয়েছে।

হুঁ, আপনি বুঝি তাই ভাবছেন সুব্রতবাবু!

মানে বলছিলাম, ব্যাপারটা খুব একটা অসম্ভব কি ?

আরে মশাই, না না—সোনাদানার ব্যাপার, ও ঠিকই—তাছাড়া--

তাছাড়া ?

গত বছর-দুই ধরে কতকগুলো খবরও যে আমরা পেয়েছি সোনা স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে! তারপর ঐ চিঠি—

কিরীটী এতক্ষণ চুপচাপই ছিল।

আমাদের কথার মধ্যে কোন মন্তব্য করেনি।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী কথা বললে ; প্রশ্ন করল, নির্মলশিববাবু ?

আজ্ঞে ?

বলছিলাম, কিরীটী বললে, চিঠিটা আপনারা কিভাবে পেয়েছিলেন নির্মলশিববাবু ? হাতে, না ডাক মারফৎ ?

কি আশ্চর্য! ওসব চিঠি—বেনামা উড়ো ব্যাপার, ডাক মারফতই চলে জানবেন চিরদিন।

চিঠিটা হাতে লেখা, না টাইপ করা ? পুনরায় প্রশ্ন করে কিরীটী।

টাইপ করা।

খামে, না পোস্টকার্ডে ?

খামে।

খামের উপর ডাকঘরের ছাপটা দেখেছিলেন ?

কি আশ্চর্য! বিলক্ষণ, তা আর দেখিনি ? ভবানীপুরের পোস্ট অফিসের ছাপ মারা ছিল খামটার গায়ে।

ভবানীপুর ডাকঘরের ?

হুঁ।

কিরীটী তারপর চোখ বুজে যেন কি ভাবে।

তারপর একসময় চোখ খুলে বলল, চিঠিটা আপনারা যা ভাবছেন, সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে তো—

কি?

তাহলে তো এক দিক দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্তই হতে পারেন—

নিশ্চিন্ত হতে পারি?

হুঁ।

কি রকম?

হ্যাঁ, ধরে নিই যদি ব্যাপারটা সত্যিই, তাতে করে আপনাদের চিন্তার কি আছে এত?

কি আশ্চর্য! চিন্তার ব্যাপার নেই মানে?

নিশ্চয়ই। ভাঙনের মুখে আর কতদিন বাঁধ দিয়ে রোধ করবেন?

কি বলছেন!

ঠিকই বলছি। বুঝতে পারছেন না, দলে ভাঙন ধরেছে? দলের কেউ মীরজাফরের রোল নিয়েছে এ নাটকে। অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন, পলাশীর যুদ্ধ একটা শীঘ্রই হবে এবং হতভাগ্য সিরাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।

কি আশ্চর্য!

আশ্চর্যের আর কি আছে? প্রবাদই তো আছে—History always repeat itself! ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—এ যে সর্বকাল ও সর্ববাদিসম্মত। আপনার কর্তাদে শুধিয়ে দেখবেন, তাঁরাও কথাটা স্বীকার করবেন।

দোহাই আপনার মিঃ রায়, নির্মলশিববাবু বলে ওঠে, আর কি আশ্চর্য! অ আমাকে নাকানিচোবানি খাওয়াবেন না, একটা বুদ্ধি বাতলান।

কিরীটী আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন সাড়াই দেয় না।

মিঃ রায়? করুণ কণ্ঠে আবার ডাকে নির্মলশিববাবু। কি আশ্চর্য! বুঝতে পারে না কি বিপদেই পড়েছি। এযাত্রা আমাকে সাহায্য না করলে এই পেনসনের কা কাছি এসে সত্যি বলছি যাকে বলে ভরাডুবি হয়ে যাব, বিশ্রী কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে

অবশ্যই নির্মলশিব সাহেবকে সেবারে কিরীটী শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছিল। কিরীটী সাহায্য না করলে সেবারে সোনা পাচারের ব্যাপারটা আরও কতদিন যে চলত তার ঠিক নেই।

॥ তিন ॥

এবং সে-কাহিনীও বিচিত্র।

তবে এও ঠিক, কৃষ্ণা সেবারে অমন ভাবে হঠাৎ সেদিন খোঁচা দিয়ে সুপ্ত সিংহকে না জাগালে নির্মলশিববাবুর শিবত্বপ্রাপ্তি তো হতই—তার এক চাকুরে ভাই মোহিনীমোহনের মত এবং চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালেরও দর্শন আমরা পেতাম না হয়ত।

শুধু কি চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল?

সেই তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য?

চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল!

তিলোত্তমা!

সত্যি বার বার কত ভাবেই না অনুভব করেছি, কি বিচিত্র এই দুনিয়া!

কিন্তু যাক্, যা বলছিলাম।

কিরীটীর ঐ ধরনের নিরাসক্তির কারণটা নির্মলশিববাবুর জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের—মানে আমার ও কৃষ্ণার জানা ছিল খুব ভালই।

সে কিরীটীর এক ব্যাধি।

মধ্যে মধ্যে সে এমন ভাবে শামুকের মত নিজেকে খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিত যে কিছুতেই তখন যেন তার সেই নিরাসক্তির জাগ্রত তন্দ্রা ভাঙানো যেত না।

সত্যিই বিচিত্র তার সেই আত্মসমাহিতের পর্ব।

বলাই বাহুল্য, আত্মসমাহিতের সেই পর্ব তখন কিরীটীর চলেছিল বলেই নির্মলশিববাবু প্রত্যহ এসে এসে ফিরে যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত একদিন, বিধি যদি হন বাম তো ভাগ্যের হাতেই আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর উপায় কি ভেবে, সে কৃষ্ণার কাছেই আত্মসমর্পণ করল, আমাকে এবারটা বাঁচান মিসেস রায়।

তাই তো নির্মলশিববাবু, মহাদেবটির আমার এখন জেগে ঘুমোবার পালা চলেছে। নিজের নেশায় নিজে এখন উর্ধ্বনেত্র। ওর কানে তো এখন কোন কথাই যাবে না। কৃষ্ণা বলে।

কিন্তু আমি যে অনন্যোপায় মিসেস রায়।

আচ্ছা দেখি।

কিন্তু নানা ভাবে অনেক চেষ্টা করেও কৃষ্ণা কিরীটীর সাড়া জাগাতে পারে না।

তবু নির্মলশিবও আশা ছাড়ে না, সে-ও আশা ছাড়ে না।

অবশেষে সেদিন কিস্তিমাতের ব্যাপারের মোক্ষম মুহূর্তে ছোট্ট একটি মোক্ষম বাণে কিরীটীর নিদ্রাভঙ্গ হল।

কিন্তু পরের কথাপ্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলাম, সেবারকার কিরীটীর নিরাসক্তির ব্যাপারটা সত্যি-সত্যিই নিরাসক্তির তন্দ্রা ছিল না।

সোনা স্মাগলের ব্যাপারটা ইতিপূর্বেই তার মনকে নাড়া দিয়েছিল। এবং কিছুদিন যাবৎ ঐ ব্যাপারের প্রস্তুতির মধ্যেই ডুবে ছিল সে।

কাজেই কৃষ্ণার কিরীটীর তন্দ্রা ভাঙানোর ব্যাপারটা বাইরে আকস্মিক হলেও ভিতরে ভিতরে সত্যিই আকস্মিক ছিল না।

কিন্তু যা বলছিলাম, সেদিনকার কথা—

কিরীটীর সহসা আবার সাড়া পাওয়া গেল।

নির্মলশিববাবু!

আজ্ঞে?

মোহিনীমোহন চৌধুরীর কথা মনে আছে আপনার?

মোহিনীমোহন—মানে আমাদের সেই ব্রাদার অফিসার মোহিনীমোহন?

হ্যাঁ, যিনি অকস্মাৎ মাস ছয়েক আগে এক রাত্রে এই কলকাতা শহর থেকে, সুব্রতর ভাষায়, যাকে বলে স্রেফ একেবারে কর্পূরের মত উবে গেলেন! এবং যাঁর কোন পাত্তাই এখন পর্যন্ত আপনাদের বড়কর্তারাও করতে পারেননি, মনে আছে তাঁর কথা?

আহা, মনে থাকবে না—মনে আছে বৈকি। মোহিনীর বেচারী বুড়ী মা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সে কি কান্না—

কিন্তু আপনার তো শুধু মাতৃদেবীই নন, ঐ সঙ্গে স্ত্রী ও আপনার পঞ্চকন্যা আছে—একসঙ্গে বারো জোড়া চক্ষু যদি কাঁদতে শুরু করে!

মানে—মানে—

মানে অতীব প্রাঞ্জল। সোনার কারবার যাদের, তাদের হৃদয়টা ঐ সোনার মত নিরেট হয়ে থাকে বলেই আমার ধারণা।

সত্যি কথা বলতে কি, ঐসময় আমারও কিরীটীর কথাটা কেমন যেন হেঁয়ালি মতই বোধ হচ্ছিল। কারণ তখনও আমি বুঝতে পারিনি, অতঃপর কোন্ দিকে কিরীটী মোড় নিচ্ছে।

নির্মলশিববাবু! আবার কিরীটী ডাকল।

বলুন ?

এবং প্রায় ঐ সময়েই এই কলকাতা শহরে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল—মনে আছে বোধ হয় সেই ঘটনাটাও সকলেরই আপনাদের—

কোন্—কোন্ হত্যাকাণ্ডের কথাটা বলছেন বলুন তো মিঃ রায় ?

বলছি, তবে একটা ব্যাপার সে-সময় অনেকেই লক্ষ্য করেননি যে—নৃশংস দ্বিতীয় সেই হত্যাকাণ্ডটা ঘটে ঠিক মোহিনীমোহনের নিরুদ্দেশ হবার সাতদিন পরে—

তার মানে ?

এতক্ষণে দেখলাম সত্যি-সত্যিই যেন নির্মলশিববাবু সচকিত হয়ে ওঠে।

মানে আর কি—খুব সম্ভবত অর্থাৎ মোহিনীমোহনের নিরুদ্দেশ ও ঐ হত্যাকাণ্ড ব্যাপার দুটো যোগ দিলে দুয়ে দুয়ে চারের মতই তাদের যোগফল দাঁড়াবে !

কিন্তু—কিন্তু—

তাই বলেছিলাম, এ সোনা নয়—মায়ামৃগ ! মৃত্যুবাণ যে কখন কোন্ পথে কার বুকে এসে বিঁধবে !

মনে হল কিরীটীর এই কথায় যেন নির্মলশিব সত্যিসত্যিই একেবারে হাওয়া-বের-হয়-যাওয়া বেলুনের মতই চুপসে গেল মুহূর্তে।

এবং হঠাৎ যেন একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল।

কিরীটীর সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথায় আমার তখন মনে পড়ে যায় ছ'মাস আগেকার সত্যি-সত্যিই সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথাটা।

নৃশংসতারও বুঝি একটা সীমা আছে। কিন্তু সেই বিশেষ হত্যাকাণ্ডটা যেন সে সীমাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।

সংবাদপত্রে সেদিন প্রথম ব্যাপারটা জানতে পেরে সত্যিই যেন মূক হয়ে গিয়েছিলাম।

আজকের দিনের সভ্য মানুষের মনের কি নির্মম বিকৃতি !

অবশ্যই আজকের দিনে শিক্ষা কৃষ্টি ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে মানুষ যত এগিয়ে চলেছে, তাদের চরিত্রও যেন ততই বিচিত্র সব বিকৃতির মধ্যে দিয়ে বীভৎস হয়ে উঠছে।

তবু কিন্তু সেদিনকার সেই মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডটা মনকে আমার বিমূঢ় বিকল করে দিয়েছিল।

কোন একটি মানুষের দেহকে সম্ভবতঃ কোন অতীব ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে টুকরো টুকরো করে দেহের সেই টুকরোগুলো বালিগঞ্জ স্টেশনের ধার থেকে

কালীঘাট ব্রীজের ওপারে বেলভেডিয়ার পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শহরের এক বিখ্যাত সার্জেনের সাহায্যে পুলিসের কর্তৃপক্ষ পরে সেই দেহখণ্ডগুলিকে একত্রিত করে সেলাই করে জোড়া দেয়।

কিন্তু তথাপি সে দেহ কোনমতে আইডেনটিফাই করতে পারে না।

কারণ সেই খণ্ডগুলিতে কোন চামড়া নখ বা কেশের কোন অস্তিত্ব না থাকায় দেহটি পুরুষ না নারীর সেটুকুও তখন বোঝবার উপায় ছিল না।

কিরীটীর সাহায্য নেবার জন্য কর্তৃপক্ষ সে সময় তাকেও ডেকে নিয়ে মর্গে সেই সেলাই করা দেহটি দেখিয়েছিল।

কিরীটী সে-সময় কর্তৃপক্ষকে কেবল বলে এসেছিল—ঐ সেলাই করা বস্তুটির একটা ফটো তুলে রাখুন আর এই তল্লাট ও এর আশপাশের এলাকাগুলো ভাল করে একবার খোঁজখবর করে দেখুন।

বলাই বাহুল্য, সেই সময়ের কিছু আগে থাকতেই কিরীটীর নিষ্ক্রিয় জাগরণ-নিদ্রা চলেছে।

অতএব সুপ্ত সিংহকে জাগানো যায়নি ঐ সময়।

অবশ্যই ব্যাপারটা ঐখানেই সে-সময় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

তবে কিরীটী কর্তৃপক্ষকে ঐ সময় আরও একটা কথা বলেছিল, যার মোহিনীমোহন চৌধুরীর নিরুদ্দেশের ব্যাপারের একটা যোগাযোগের ইঙ্গিতও ছিল।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিকে তখন দৃষ্টি দেওয়াই প্রয়োজন বোধ করেননি।

তাঁদের তখন স্থির বিশ্বাস, মোহিনীমোহন চৌধুরী সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন, কারণ তাঁর চরিত্রের মধ্যে সর্বস্ব ত্যাগের নাকি একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তে ছিলই—তাঁর কোষ্ঠীতেও নাকি সন্ন্যাস যোগ ছিল।

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার সে-সময় ঘটেছিল।

মোহিনীমোহনের মা মোহিনীর নিরুদ্দিষ্ট হবার ঠিক পাঁচদিন পরে হরিদ্বার থেকে ডাকযোগে পুত্রের হস্তলিখিত একটা চিঠি পান।

তাতে লেখা ছিল—আমি চললাম, আমার খোঁজ করো না। ইতি মোহিনী।

কর্তৃপক্ষ ঐ চিঠিটা পেয়ে সে-সময় দুর্নাম ও অকৃতকার্যতার লজ্জার হাত থেকে বুঝি নিষ্কৃতিও পেয়েছিল।

॥ চার ॥

নির্মলশিব আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন্ হত্যাকাণ্ডের কথাটা বলছিলেন, মিঃ রায়?

কিরীটী তখন সংক্ষেপে সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথাটা বিবৃত করে গেল।

I see! আপনি সেই হত্যাকাণ্ডের কথাটা বলছেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

কি?

কিন্তু মোহিনীমোহন তো সন্ন্যাস নিয়েছেন এবং তার প্রমাণও আছে—তাঁর সেই চিঠি—

হ্যাঁ সেই চিঠি, কিন্তু সে চিঠি যে তাঁরই লেখা তার তো অবিসংবাদী প্রমাণ সেদিন আমরা পাইনি নির্মলশিববাবু!

সে কি? পেয়েছি বইকি। তাঁর মা-ই তো ছেলের হাতের লেখা দেখে চিনেছিলেন।

না।

মানে?

মানে হচ্ছে, মোহিনীমোহনের মা তখন চোখে ছানি পড়ায় কিছুই একপ্রকার দেখতে পান না—

ছানি পড়েছিল তাঁর চোখে?

হ্যাঁ।

কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কি করে, মিঃ রায়?

কারণ মোহিনীমোহনের ছোট একজন ভাই আছে, জানেন?

হ্যাঁ, রমণীমোহন—

সেই রমণীমোহন সে-সময় এসেছিল আমার কাছে ঐ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করবার জন্য। এবং তার মুখেই সেদিন সেকথা আমি শুনেছিলাম।

কিন্তু—

যাক সেকথা নির্মলশিববাবু, বলছিলাম সেদিনও যা বলেছিলাম আপনার কর্তৃপক্ষকে—আজ আপনাকেও তাই বলব, সে চিঠি মোহিনীমোহন চৌধুরীরই যে হাতের লেখা তার কোন সত্য বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছিল না।

তবে কি আপনি মনে করেন, মিঃ রায়, সত্যি-সত্যিই—

হ্যাঁ, সেই সোনার হরিণের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যই তাঁর মৃত্যু—অর্থাৎ তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল দানবীয় নৃশংসভাবে।

ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করছিলাম, ধীরে ধীরে নির্মলশিব সাহেবের সমস্ত উৎসাহই যেন নির্বাপিত হয়ে এসেছে।

তাহলে দেহটা তাঁর কোথায় গেল? শুধাল এবার একটা ঢোক গিলে নির্মলশিব।

দেহ!

হ্যাঁ।

খোঁজেননি ভাল করে চোখ মেলে তাই পাননি, নচেৎ নিশ্চয়ই পেতেন।

কিন্তু—

তবে মনে হচ্ছে এবারে সন্ধান পাবেন।

পাব?

পাবেন।

কৃষ্ণা কখন একফাঁকে ইতিমধ্যে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্য করিনি।

এমন সময় জংলীর হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে সে পুনরায় ঘরে এসে প্রবেশ করল।

আমি ও কিরীটী একটা করে ধূমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিলাম, কিন্তু নির্মলশিব বাবু জংলীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চা নয়—আমাকে এক গ্লাস জল দাও—

নির্মলশিবের শুষ্ক কণ্ঠে সেই 'এক গ্লাস জল' কথাটি যেন অতিকষ্টে উচ্চারিত হল।

কৃষ্ণা হেসে বলে, নিন নিন, চা খান!

করুণ দৃষ্টিতে তাকাল নির্মলশিব কৃষ্ণার মুখের দিকে এবং পূর্ববৎ শুষ্ক কণ্ঠেই বললে, চা খাব?

হ্যাঁ, নিন!

কিরীটী টিপ্পনী কাটল, আরে মশাই, মৃত্যুকে ভয় করলে কি আপনাদের চলে—আপনাদের তো জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য!

অতঃপর চা নয়, যেন চিরতার জল—এইভাবে অতিকষ্টে একটু একটু করে গলাধঃকরণ করলে নির্মলশিব সাহেব।

তারপর নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, কি আশ্চর্য। এ যে দেখছি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুল বলে মনে হচ্ছে—

কিরীটী মৃদু হেসে আবার টিপ্পনী কাটল, হ্যাঁ, ঢোঁড়া নয়, জাতসাপ একেবারে। তা যাক গে সেকথা, আপনাকে আমি সাহায্য করব নির্মলশিববাবু, তবে এক শর্তে—

শর্তে!

হ্যাঁ, আপাতত আপনি ঐ ব্যাপারে আমাকে যে সঙ্গে নিয়েছেন সেকথা কাউকেই জানাতে পারবেন না।

বেশ।

আপনার কর্তৃপক্ষকেও নয় কিন্তু।

তাই হবে।

সেদিনকার মত নির্মলশিব গাত্রোত্থান করল।

নির্মলশিবের প্রস্থানের পর আধ ঘণ্টা কিরীটী যেন কেমন ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল।

দুটি চক্ষু বোজা।

বুঝলাম কিরীটী নির্মলশিবের ব্যাপারটাই চিন্তা করছে।

অগত্যা আজ আর এসময় এখানে বসে থাকা বৃথা। উঠব উঠব ভাবছি, এমন সময় কিরীটী সহসা চক্ষু মেলে একটা আড়মোড়া ভেঙে বললে, চল্ সুব্রত, একটু সন্ধ্যার হাওয়া খেয়ে আসা যাক পদব্রজে।

জুন মাস। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় সেটা।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এলেও বাইরের প্রচণ্ড তাপ যে এখনও অগ্নিবর্ষণ করছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ আমি।

কিরীটীর এয়ার-কন্ডিশন ঘরে বরং আরামেই বসে আছি; তাই বললাম, বাইরে এখনও গরম—

চল্ চল্, বেশ ফুরফুরে দখিনা হাওয়া বাইরে দেখবি।

সত্যি-সত্যিই অতঃপর কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণাও এবারে স্বামীর মুখের দিকে একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে শুধাল, সত্যিই বেরুচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ যাই, অনেকদিন ঘরের বাইরে পা দিইনি—ভবানীপুর অঞ্চলটার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বলতে বলতে কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী ঘর থেকে বের হতেই সহাস্যে কৃষ্ণা বললে, ভাগ্যে তুমি দাবা খেলায় আজ ওর কাছে মাত হয়েছিল ভাই, নচেৎ সত্যি বলছি, গত ছ-সাত মাস ও ঘরের বাইরেই পা দেয়নি—

কিন্তু তাতে করে তো তোমার দুঃখ হওয়া উচিত নয় বৌদি। বরং—

না ভাই, ওকে নিষ্ক্রিয় দেখলে কেমন যেন আমার ভয়-ভয় করে—

ভয় করে নাকি !

হ্যাঁ, সে সময়টা ও যেন কেমন আলাদা মানুষ হয়ে যায়। কেমন অন্যমনস্ক—

হবেই তো, ও হচ্ছে প্রতিভার আত্মকণ্ডূয়ন। প্রতিভা জেনো চিরদিনই একক—নিঃসঙ্গ।

আমাদের কথার মধ্যেই কিরীটী প্রস্তুত হয়ে পুনরায় ঘরে এসে ঢুকল। বললে, চল—

॥ পাঁচ ॥

দুজনে রাস্তায় বের হয়ে হেঁটে চললাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার সবে ঘন হয়ে এসেছে, চারিদিকে রাস্তায় ও দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

কিরীটী কিন্তু মিথ্যা বলেনি।

বাইরে সত্যিই যেন ভারি একটা মিষ্টি হাওয়া ঝিরঝির করে বইছিল।

সারাটা দিনের প্রচণ্ড তাপের দহনের পর ঐ ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু সত্যিই উপভোগ্য।

কিন্তু রাস্তায় বের হয়ে কিরীটী যেন হঠাৎ কেমন বোবা হয়ে যায়।

নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে লক্ষ্য করলাম কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

অফিসের ছুটির পর ঘরমুখো হাজার হাজার চাকুরেদের রাস্তায় ও ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা ভিড় চোখে পড়ে।

হঠাৎ কিরীটী এক সময় বলে, শেষ কবে আদমশুমারী হয়েছে রে সুব্রত ?

কেন ?

না, তাই বলছি। অনেকদিন বোধ হয় জনসংখ্যা গোনা হয় নি।

বুঝলাম মানুষের ভিড়কে লক্ষ্য করেই কিরীটীর ঈদৃশ বক্রোক্তি।

হেসে বললাম, জনসংখ্যা তো বাড়ছেই।

বাড়ছে বলেই তো এত খাদ্যাভাব, এত বাসস্থানের অভাব, আর তাই ক্রাইমও বেড়ে চলেছে। তবে লোকগুলোকে বাহবা না দিয়ে পারছি না।

কাদের কথা বলছিস ?

কেন? যারা স্বর্ণর ব্যবসায়ে নেমেছে। যারা নির্মলশিবের মাথার চুলগুলো প্রায় পাকিয়ে তুলল।

হাসলাম আমি সশব্দে।

না রে না, হাসি নয়। কথাই তো আছে—অভাবেই স্বভাব নষ্ট, কিন্তু আমি ভাবছি—

কি?

ভেক না নিলে তো ভিক্ষার্জন হয় না, তা কিসের ভেক নিয়েছে তারা ঐ স্বর্ণ-মৃগয়ায়? বলতে বলতে চড়কডাঙার কাছাকাছি এসে থেমে পড়ল ও।

কি রে, থামলি কেন?

বিরাট ঐ নিয়ন-বোর্ডটা লক্ষ্য করেছিস! লাল সবুজের ঝিলিক হেনে জ্বলছে নিভছে। মাস ছয়েক আগেও তো ওটা দেখেছি বলে কই মনে পড়ছে না।

কিরীটীর কথায় সামনের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল, বিরাট একটি নিয়ন-বোর্ড চারতলা একটা নতুন বাড়ির একতলার মাথায় জ্বলছে নিভছে।

ওভারসিজ লিঙ্ক।

বিচিত্র নামটা!

নীচে লেখা গভর্মেণ্ট কনট্রাক্টার অ্যাণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার।

বাড়িটা তো দেখছি নতুন। কিরীটী পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বললে।

হাঁা, তবে একেবারে নতুন নয়, বছরখানেক হল বাড়িটা তৈরি হয়েছে।

ওভারসিজ লিঙ্ক কারবারটিও তাহলে নতুনই বল। [illegible] ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়েই দেখলাম সেই নতুন চারতলা বাড়িটাই লক্ষ্য করছে।

লক্ষ্য করতে করতেই আবার একসময় বললে, দোতলা তিনতলা আর চারতলা দেখছি ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাড়া দিয়েছে। কিন্তু—

কিন্তু কি?

ব্যবসার আড্ডা ছেড়ে এখানে এসে অমন জাঁকজমক করে অফিস খুলেছে—

সে অঞ্চলে হয়ত তেমন মনোমত বাড়ি পায়নি।

তা বটে। বলতে বলতে লক্ষ্য করি সেই অফিসের দিকেই এগুচ্ছে কিরীটী।

একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করি [illegible] চললি?

চল্ একবার অফিস [illegible]টু দিয়ে আসা যাক। খোলাই যখন আছে এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

তা যেন হল, কিন্তু হঠাৎ অর্ডার সাপ্লাই অফিসে তো

আমার যে এখন সেই অবস্থা। খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর। চল্—চল।

আমাকে আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন বা বাদ-প্রতিবাদের অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সহসা লম্বা লম্বা পা ফেলে সত্যি সত্যি দেখি, ও ওভারসিজ লিঙ্কের খোলা দ্বারপথের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

অগত্যা অনুসরণ করতেই হল ওকে।

দরজার গোড়াতেই চাপদাড়ি শিখ দারোয়ান রাইফেল হাতে একটা টুলের উপর বসে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল।

আমাদের দেখে সেলাম জানিয়ে কাচের স্প্রিংডোর ঠেলে রাস্তা করে দিল।

ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা একটা হাওয়ার ঝাপটা যেন সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিল।

এয়ার-কনডিশন করা ঘর বুঝলাম।

ঘর বলব না, বিরাট একটা হলঘরই বলা উচিত।

একধারে কাউন্টার, অন্যদিকে পর পর তিনটি কাচের পার্টিশন দেওয়া কিউবিক্‌ল্।

দেওয়ালে দেওয়ালে ফ্লুরেসেন্ট টিউবের সাদা ধবধবে আলো জ্বলছে।

ঝকঝকে তকতকে পালিশ করা সব চেয়ার টেবিল।

এক কোণে সুসজ্জিত সোফা ইত্যাদি—ভিজিটারদের বসবার স্থান।

মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিস্তৃত, কিন্তু সমস্ত কক্ষটিতে এখন নজরে পড়ল দুটি তিন লোক মাত্র কাউন্টারের অপর দিকে টেবিলের সামনে বসে কি সব কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছে।

একজন উর্দিপরা বেয়ারা এগিয়ে এল, কি চাই?

বড় সাহেব আছেন তোমাদের?

সাহেব তো নেই। সেক্রেটারী দিদিমণি আছেন।

সেক্রেটারী দিদিমণি?

আজ্ঞে।

বেশ, তাঁকেই বল গিয়ে একজন বাবু চাকরী কাজের জন্য দেখা করতে চান।

বসুন, খবর দিচ্ছি। বেয়ারা চলে গেল।

লক্ষ্য করলাম বেয়ারা অদূরবর্তী একটা কিউবিক্‌লের সুইংডোর ঠেলে ভিতরে

আমরা সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বসে বসে আমি ভাবছি কিরীটীর মতলবখানা কি!

দুম করে এই অফিসে এসে ঢুকল কেন ও, তবে কি ওর ধারণা এই অফিসটাই চোরাই সোনার কারবারের কেন্দ্রস্থল?

কিন্তু যদি ব্যাপারটা সত্যিই হয় তো স্বীকার করতেই হবে, অমন একটা চোরাই কারবার এমন প্রকাশ্য একটা স্থানে বসে জাঁকজমকসহ করার মধ্যে দুঃসাহসিকতা আছে সন্দেহ নেই।

এবং যারাই ঐ কারবার করুক না কেন তাদের সে দুঃসাহসটা রীতিমতই বুঝি আছে।

যাই হোক একটু পরেই কিন্তু বেয়ারা ফিরে এল।

বললে, চলুন—

বেয়ারার নির্দেশমত আমরা সেক্রেটারী দিদিমণির কিউবিক্‌লের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

এবং প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সুমিষ্ট নারীকণ্ঠে আহ্বান এল, বসুন—

কণ্ঠস্বর নয়, যেন সুরলহরী।

আর শুধু কি সুরলহরীই, ঐ সঙ্গে রূপ এবং সাজ-সজ্জায়ও যেন অসামান্যা। এক কথায় সত্যিই অতুলনীয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য পড়ল আর সম্মুখে উপবিষ্টা সেই অসামান্যা নারীর চক্ষুর প্রতি।

তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরির ফলার মত সে দুটি চক্ষুর দৃষ্টি।

সে দৃষ্টি কিরীটীর প্রতি স্থিরনিবদ্ধ।

মুহূর্তের স্তব্ধতা।

তারপরই প্রসন্ন একটুকরো হাসিতে তরুণীর মুখখানা যেন ভরে গেল।

সে বললে, বসুন।

॥ ছয় ॥

বসলাম পাশাপাশি দুজনে দুটি চেয়ারে।

আজও মনে আছে, রূপ অনেক এ পোড়া চোখে পড়েছে কিন্তু রূপের সঙ্গে বুদ্ধির ওরকম প্রাখর্য সত্যিই বুঝি আর চোখে পড়েনি।

কিরীটী ফেরার পথে আমার প্রশ্নের উত্তরে সেদিন বলেছিল, তিলোত্তমা।

সত্যিই তিলোত্তমা।

আপনাদের কি করতে পারি বলুন? পুনরায় তরুণী প্রশ্ন করল।

আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গেই আমার দরকার ছিল।

মিঃ মল্লিক তো এখন নেই, আপনি তা হলে কাল দুপুরের দিকে আসুন। তবে কোন অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যাপার হলে আমাকে বলতে পারেন।

অবশ্য অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যাপারই। তবে—

কি সাপ্লাই করতে হবে?

আমার নিজস্ব একটা ছোটখাটো কেমিকেলের কারখানা আছে। তাই কিছু অর্ডার আমি ফরেন থেকে পেয়েছি। আপনাদের থ্রু দিয়ে সেটা আমি সাপ্লাই করতে চাই—

ও! তা সেরকম কোন সাপ্লাই তো আমরা করি না।

অবশ্যই আপনাদের আমি একটা ওভার-রাইডিং কমিশন দেব।

আপনি বরং কাল এসে ম্যানেজার মিঃ মল্লিকের সঙ্গেই দেখা করবেন।

বেশ, তাই করব। আমাদের কথাটা ত'হলে তাঁকে বলে রাখবেন।

কি নাম বলব? তরুণী প্রশ্ন করে।

কিরীটী কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, বাইরে একটা পুরুষকণ্ঠে বচসা শোনা গেল।

আরে রেখে দে তোর সেক্রেটারী দিদিমণি! ঘরে লোক আছে দেখা করবে না! তার বাপ দেখা করবে, চোদ্দ পুরুষ করবে। গার্ভি আর্থার হ্যামিলটন থ্রায়-

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমাদের সামনে উপবিষ্টা তরুণীর মুখ থেকে অমায়িক ভাবটা যেন মুহূর্তে নির্বাপিত হয়ে গেল।

সমস্ত মুখখানা তো বটেই এবং দেহটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন কঠিন ঋজু হয়ে উঠল।

পাশ থেকে একটা প্যাড ও পেনসিল তুলে নিয়েছিল তরুণী ইতিমধ্যে, বোধ করি কিরীটীর নামটাই টুকে নেবার জন্যে, হাতের পেন্সিল হাতেই থেকে গেল।

পরমুহূর্তেই একটা দমকা হাওয়ার বেগে ঘরের সুইংডোর ঠেলে খুলে যে লোকটি ঠিক ভগ্নদূতের মতই ভিতরে এসে প্রবেশ করল সে দর্শনীয় নিঃসন্দেহে।

আমরা যে ঘরের মধ্যে বসে আছি তা যেন ভ্রুক্ষেপও করল না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট তরুণীকে সম্বোধন করে বললে, আমি জানতে চাই সীতা, তুমি আমার ওখানে ফিরে যাবে কি না? Say – yes or no?

আগন্তুককে দেখছিলাম আমি তখন।

ঢ্যাঙা লম্বা চেহারা।

একমুখ দাড়ি, ঝোড়ো কাকের মত একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তৈলহীন রুক্ষ।

ডান কপালে দীর্ঘ একটা ক্ষতচিহ্ন।

নাকটা তরোয়ালের মত যেন ধারাল, তীক্ষ্ন।

পরিধানে একটা জীর্ণ মলিন ক্রিজ্-ভাঙা কালো গরম কোট ও অনুরূপ সাদা ময়লা জিনের প্যান্ট। গলায় লাল বুটি-দেওয়া পুরাতন একটা টাই।

আরও চেয়ে দেখলাম তরুণীর মুখখানা অসহ্য ক্রোধে আর আক্রোশে যেন সিঁদুরবর্ণ ধারণ করেছে।

আগন্তুক আবার বললে, Say--yes or no!

বেয়ারাটাও ইতিমধ্যে আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গেই তার পিছনে ঘরে এসে ঢুকেছিল।

বেচারী মনে হল যেন আকস্মিক ঘটনায় একটু হতভম্ব হয়েই নির্বাক হয়ে গিয়েছে।

সহসা তরুণী সেই হতভম্ব নির্বাক বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললে, এই, হাঁ করে চেয়ে দেখছিস কি? দারোয়ানকে ডাক?

সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠল আগন্তুক যেন, কি, দরোয়ান দেখাচ্ছো, আর্থার হ্যামিলটনকে আজও চেনোনি সুন্দরী। সব ফাঁস করে দেব। সব একেবারে চিচিং ফাঁক করে দেব---

সহসা ঐ সময় পিছনের সুইংডোরটা আবার খুলে গেল এবং স্ল্যাক ও হাফশার্ট পরিহিত বিরাট দৈত্যাকৃতি একজন লোক এসে যেন অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকল ও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, আর্থার---

সঙ্গে সঙ্গে জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল।

হ্যামিলটন সাহেব সেই ডাকে ফিরে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এত হম্বিতম্বি ক্ষণপূর্বের যেন দপ্ করে নিভে গেল।

মুহূর্তে যাকে বলে একেবারে যেন চুপসে গেল মানুষটা।

ইয়ে---স স্যা-- র---

কথাটা বলতে গিয়ে তোতলায় হ্যামিলটন।

কাম অ্যালং। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

প্রভুভক্ত কুকুর যেমন প্রভুর ডাকে তাকে অনুসরণ করে, ঠিক তেমনি করেই যেন মাথা নীচু করে নিঃশব্দে সেই দৈত্যাকৃতি আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেল হ্যামিলটন।

দেখলাম সেক্রেটারী দিদিমণি যেন কেমন বিব্রত ও থতমত খেয়ে বসে আছে।

আকস্মিক যে এমনি একটা ব্যাপার ঘটে যাবে, বেচারীর যেন ক্ষণপূর্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, তাহলে আমরা আজকের মত আসি।

তরুণী যেন চমকে ওঠে। বলে, অ্যাঁ, যাবেন?

হ্যাঁ—আমরা চলি।

বেশ।

অতঃপর কিরীটীর নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কিরীটীর পিছনে পিছনে আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

কিউবিক্‌লের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকালাম, কিন্তু সেই হলঘরের মধ্যে কোথায়ও ক্ষণপূর্বের দৃষ্ট সেই বিচিত্র বেশভূষা পরিহিত আর্থার হ্যামিলটন বা দৈত্যাকৃতি সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম না।

শুধু তাই নয়, হলঘরে আগে যাদের কাজ করতে দেখেছিলাম তাদেরও কাউকে আর দেখতে পেলাম না ঐ সময়।

হলঘরটা তখন শূন্য।

দুজনে বাইরে বের হয়ে এলাম।

॥ সাত ॥

রাস্তায় পড়ে কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তখনও ভাবছি, ব্যাপারটা কি হল?

কিরীটীও স্তব্ধ হয়ে হেঁটে চলেছে।

কিন্তু কিরীটী খুব বেশী দূর অগ্রসর হল না।

পনের বিশ গজ হেঁটে গিয়ে ঐ ফুটপাতেই একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানী পানওয়ালাকে বললে, বেশ ভাল করে জর্দা কিমাম দিয়ে দুটো পান তৈরী করতে।

পানওয়ালা পান তৈরী করে দিল।

পান নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে, পান মুখে পুরে দিয়ে বেশ আরাম করে কিরীটী চিবুতে লাগল সেই দোকানের সামনেই ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে।

নড়বার নামগন্ধও নেই যেন।

বুঝতে পারি, ঐ সময় পান কেনা ও পান খাওয়া কিরীটীর একটা ছল মাত্র।

কিছু সময় হরণ করতে চায় সে ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই।

ইতিমধ্যে দেখি দিব্যি পানওয়ালার সঙ্গে এটা-ওটা আলাপ শুরু করে দিয়েছে কিরীটী।

চার প্যাকেট কি এক নতুন ব্র্যাণ্ডের উর্বশী মার্কা সিগারেটও কিনল, যে সিগারেট কস্মিনকালেও খায় না। এবং সর্বক্ষণ ওর মধ্যেই যে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিক-ওদিকে, বিশেষ করে অদূরবর্তী ওভারসিজ লিঙ্কের অফিসের দিকে নিবদ্ধ হচ্ছিল সেটা অবশ্য আমার নজর এড়ায় না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কিরীটী হাত ধরে আকর্ষণ করে নিম্নকণ্ঠে বললে, আয় সুব্রত—

কোথায়?

আয় না। বলে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল।

বাধ্য হয়েই যেন কিরীটীকে আমি অনুসরণ করি।

কোথায় যাচ্ছি, কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারি না।

রাস্তার ধারে ট্যাক্সি পার্কে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণে নজরে পড়ল কিরীটী সেই দিকেই হনহন করে হেঁটে চলেছে।

সোজা গিয়ে কিরীটী খালি ট্যাক্সিটায় উঠে বসল আমাকে নিয়ে।

তারপরেই ট্যাক্সি-চালককে চাপা কণ্ঠে বললে, সামনের ঐ ট্যাক্সিটাকে ফলো করে চল সর্দারজী।

নজর করে দেখলাম সামনেই অল্পদূরে তখন একটা বেবী ট্যাক্সি চৌরঙ্গীর দিকে ছুটে চলেছে।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত নটা বাজে প্রায়।

রাস্তায় তখন নানাবিধ যানবাহনের রীতিমত ভিড়। এবং থিয়েটার রোড পর্যন্ত বেশ সমগতিতে এসে ট্রাফিকের জন্য আগের গাড়ির গতি ও সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ির গতিও হ্রাস হয়।

কিরীটী ইতিমধ্যে ট্যাক্সির ব্যাকে বেশ আরাম করেই বসে ছিল যদিও তার তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি বরাবরই নিবদ্ধ ছিল সামনের চলন্ত ট্যাক্সিটার উপরেই।

গাড়ির গতি আরও হ্রাস হতে এতক্ষণে কিরীটী মুখ খুলল, সত্যি কথা বলতে কি সুব্রত, একান্ত ঝোঁকের মাথায়ই বাড়ি থেকে সন্ধ্যায় বেরোবার মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারিনি এমন একটা সরস রোমাঞ্চকর রাত্রি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বলা বাহুল্য কারণ ইতিমধ্যে কিরীটীর মনোগত ইচ্ছাটা আমার কাছে

পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

তা যা বলেছিস। যোগাযোগটা অপূর্ব বলতেই হবে।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি।

কিরীটী আমার জবাবে সোৎসাহে বলল, অপূর্ব কিনা জানি না এখনও, তবে অভূতপূর্ব নিশ্চয়ই!

তুই যে সত্যি-সত্যিই নির্মলশিববাবুর স্বর্ণমৃগয়ার অকুস্থলের সন্ধানেই আজ বেরিয়েছিস, সত্যিই কিন্তু আমি প্রথমটায় কল্পনাও করতে পারিনি কিরীটী।

তবে তুই কি ভেবেছিলি সত্যি-সত্যিই আমি হাওয়া খেতে বের হয়েছি?

না—তা নয়—

তবে?

আচ্ছা তোর কি মনে হয় কিরীটী, ঐ ওভারসিয়র লিঙ্কই সত্যি সত্যি নির্মলশিববাবুর স্বর্ণমৃগয়ার অকুস্থল?

ততখানি এত তাড়াতাড়ি ভেবে নেওয়াটা কি একটু কল্পনাধিক্যই মনে হচ্ছে না? না ব্রাদার—no so fast! বঙ্কিমী ভাষায় বলব, 'ধীরে রজনী, ধীরে'!

তা অবশ্যি ঠিক। তবে ঘটনাচক্রে অনেক সময় অনেক অভূতপূর্ব ব্যাপারও ঘটে তো।

তা যে ঘটে না তা আমি অবিশ্যি বলছি না, তবে—

তবে?

তবে সীতা মেয়েটি সত্যিই অনিন্দনীয়া। কি বলিস?

হুঁ।

হুঁ কি রে? ভাল লাগল না দেখে তোর মেয়েটিকে? আমার তো মনপ্রাণ এখনও একেবারে ভরে রয়েছে।

সত্যি নাকি?

হুঁ।

আর আর্থার হ্যামিলটন? তার সম্পর্কে তো কই কিছু বললি না?

লোকটা রসিক নিঃসন্দেহে, এইটুকুই বলতে পারি।

কি বললি, রসিক?

নয়? অমন একটি মেয়ের চিত্তহরণ যে একদা করে থাকতে পারে সে রসিকজন বৈকি! সত্যিই কবি যে বলে গিয়েছেন একদা 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' কথাটা খুব খাঁটি কিন্তু তুই যা বলিস।

তা তোর কিসে মনে হল যে ঐ আর্থার হ্যামিলটন একদা সীতার মনপ্রাণ সত্যি সত্যিই হরণ করেছিল ?

কেন, সোজাসুজি এসে একেবারে বললে শুনলি না, ফিরে যাবে কিনা বল ?

তার মানে বুঝি—

অতশত জানি না তবে আমার যেন মনে হল ক্ষণপূর্বে সেক্রেটারী সীতার ঘরে বৃত্ররূপী যে দৈত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই বৃত্রই ঐ শচীদেবীকে কোন এক-সময় বেচারী ইন্দ্ররূপী দুর্বল আর্থার হ্যামিলটনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

তুই বুঝি ঐ কাব্যই মনে মনে এতক্ষণ ধরে রচনা করছিলি কিরীটী?

হ্যাঁ, ভাবছিলাম—

কী ?

দধীচির মত নিজ অস্থি দিয়ে ঐ দুর্বল ইন্দ্রকে যদি গিয়ে বলি, লহ অস্থি, কর নির্মাণ বজ্র—সংহার ঐ দৈত্যাসুর বৃত্রকে—

হো হো করে হেসে উঠি আমি।

হাসছিস কিন্তু বেচারীর সে-সময়কার করুণ মুখখানার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে তোরও ঐ কথাই মনে হত।

ইতিমধ্যে মেট্রোর কাছ বরাবর আমরা এসে গিয়েছিলাম।

আগের ট্যাক্সিটা সোজা এগিয়ে গিয়ে ডাইনে বাঁক নিল। তারপর কিছু দূরে এগিয়ে বাঁ দিকে ঢুকে পড়ল।

আমাদের ট্যাক্সিচালক সর্দারজী ঠিক তাকে অনুসরণ করে যায়।

শেষ পর্যন্ত আগের ট্যাক্সিটা কুখ্যাত চীনা পাড়ার এক অখ্যাত চীনা হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবুজী, উও আগারি ট্যাক্সি তো রুখ গিয়া।

হিঁয়াই রোখো সর্দারজী।

লক্ষ্য করলাম, আগের ট্যাক্সি থেকে নেমে আর্থার হ্যামিলটন সাহেব ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হ্যামিলটন হোটেলের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

বলা বাহুল্য আমরাও একটু পরে সেই হোটেলেই গিয়ে প্রবেশ করলাম দুজনে।

॥ আট ॥

ভিতরে প্রবেশ করে যেন একটু বিস্মিতই হই।

এমন পাড়ায় অখ্যাতনামা একটি চীনা হোটেলে বেশ কসমোপলিটন ভিড়।

হোটেলটায় প্রবেশ করবার মুখে হোটেলের নামটা লক্ষ্য করেছিলাম। বিচিত্র নামটিও।

"চায়না টাউন"।

বেশী রাত নয়—মাত্র সাড়ে নয়টা তখন।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, কসমোপলিটান খরিদ্দারের ভিড়ে তখন যেন গমগম করছে হোটেলের হলঘরটি।

এক পাশে ড্রিঙ্কের কাউণ্টার।

তারই গা ঘেঁষে বাঁয়ে প্যানট্রির দরজা এবং ডাইনে ছোট একটি ডায়াস।

ইংরাজী অর্কেস্ট্রা সহযোগে একটি ক্ষীণাঙ্গী, মনে হল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েই হবে, নানাবিধ যৌনাত্মক অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাকিস্বরে কি একটা দুর্বোধ্য ইংরাজী গান গেয়ে চলেছে।

চারপাশে টেবিল চেয়ারে জোড়ায় জোড়ায় নানাবয়সী পুরুষ ও নারী, কেউ খেতে খেতে, কেউ কেউ আবার ড্রিঙ্ক করতে করতে সেই যৌনরসাশ্রিত সঙ্গীত উপভোগ করছে।

একটা বিশেষ ব্যাপার ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নজর করছিলাম—উজ্জ্বল আলো নয়—ঈষৎ নীলাভ ম্রিয়মাণ আলোয় সমস্ত হলঘরটি স্বল্পালোকিত বলা চলে।

রীতিমত যেন একটা রহস্যনিবিড় পরিবেশ হোটেলটির মধ্যে।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ কোণে একটা টেবিলে হলঘরের নিরিবিলিতে হ্যামিলটন সাহেব জায়গা করে বসে গিয়েছে লক্ষ্য করলাম।

তারই পাশে আর একটা খালি টেবিল তখনও ছিল, কিরীটী আমাকে নিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে আমরা টেবিলটার দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম মুখোমুখি।

হ্যামিলটনের অত কাছাকাছি গিয়ে বসতে আমার যেন ঠিক মন সরছিল না কি দেখলাম হ্যামিলটন আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

সে অন্য দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তখন চেয়ে আছে।

কিন্তু হ্যামিলটনের সঙ্গের সেই দৈত্যাকৃতি লোকটাকে আশেপাশে কোথাও নজরে পড়ল না।

ইতিমধ্যে একজন ওয়েটার দেখলাম একটা পুরো রামের বোতল, একটা গ্লাস ও একটা কাচের জাগভর্তি জল এনে হ্যামিলটন সাহেবের সামনের টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল।

বোয়—

কিরীটীর আহ্বানে সেই লোকটাই আমাদের সামনে এগিয়ে এল।

দুটো কোল্ড বিয়ার।

তাড়াতাড়ি বললাম, আমি তো বিয়ার খাই না।

কিরীটী নির্বিকার ভাবে জবাব দিল, না খাস গ্লাস নিয়ে বসে থাকবি।

কি আর করা যায়, চুপ করেই থাকতে হল অগত্যা।

ওয়েটার কিরীটীর নির্দেশমত দু'বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার ও দুটো গ্লাস এবং একটা প্লেটে কিছু কাজুবাদাম আমাদের টেবিলে রেখে গেল।

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম হ্যামিলটন সাহেব গ্লাসের আধাআধি রাম ঢেলে তাতে জল মিশিয়ে বার দুই চুমুক দিয়েই গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক করে এনেছে।

কিরীটী দু গ্লাস বিয়ার ঢালল।

নে—না খাস অন্তত মুখের কাছে তোল্।

কিরীটীর নির্দেশমত তাই করি।

সময় গড়িয়ে যেতে থাকে।

অর্কেস্ট্রা সহযোগে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সুন্দরী তখন দ্বিতীয় সংগীত শুরু করেছে।

হ্যামিলটন ড্রিঙ্ক করে চলেছে।

লোকটা যে সুরারসিক বুঝতে দেরি হয় না।

ঘড়ির দিকে তাকালাম এক সময়, রাত সাড়ে এগারটা।

হলঘরের ভিড়টা তখন অনেকটা পাতলা হয়ে গিয়েছে বটে তবু মধুলোভীদের ভিড় একেবারে কমেনি।

সকলের চোখেই নেশার আমেজ। ঘরের মধ্যে তখনও যারা উপস্থিত তাদের মনে যেন নেশা জমাট বেঁধে উঠেছে।

ইতিমধ্যে হ্যামিলটন সাহেব রামের বড় বোতলটি প্রায় নিঃশেষিত করে এনেছে। এবং সাহেবের যে রীতিমত নেশা ধরেছে সেটা তার দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

কিরীটী ফিসফিস্ করে আমাকে বললে, চল সাহেবের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি!

এতক্ষণ যে এত কষ্ট করে কিরীটী হোটেলে বসে আছে সেও ঐ কারণেই সেটা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলাম।

কিন্তু তবু ইতস্তত করি।

কি হল, ওঠ!

কিন্তু যদি চিনে ফেলে আমাদের!

নেশার ঘোরে আছে, চল।

চল।

কিরীটীর সঙ্গে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালা ম।

হ্যামিলটন সাহেবের টেবিলে আরও দুটি চেয়ার ছিল। তারই একটা টেনে নিয়ে আমি বসলাম এবং কিরীটী অন্যটায় বসতে বসতে বললে, গুড ইভনিং মিঃ হ্যামিলটন।

নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি খুলে তাকাল আমাদের দিকে হ্যামিলটন সাহেব।

কে?. জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করে হ্যামিলটন।

তুমি তো আমাকে চিনবে না হ্যামিলটন, আমার নাম রথীন বোস।

আঃ—বোস! বলে নিঃশেষিত গ্লাসটার পাশ থেকে বোতলটা তুলে উপুড় করে ধরল কিন্তু বোতলটায় তখন একবিন্দুও তরল পদার্থ অবশিষ্ট ছিল না।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, ওর মধ্যে তো একবিন্দুও নেই, ঢালছ কি?

নেই! বলে বোতলটা কম্পিত হাতে সামনে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, নেই—ইয়েস—সত্যিই নেই—অল ফিনিশড!

ডু ইউ লাইক টু হ্যাভ মোর, মিঃ হ্যামিলটন?

গড ব্লেস ইউ মাই বয়। আই হ্যাভ নট এ ফারদিং লেফট ইন মাই পকেট।

কিরীটী ততক্ষণে ওয়েটারকে ডেকে হ্যামিলটনের শূন্য গ্লাসটার জায়গায় অন্য একটা ভর্তি গ্লাস এনে দিতে বললে।

ওয়েটার এনে দিল নির্দেশমত একটা গ্লাস।

সানন্দে নতুন গ্লাসটা তুলে নিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে জড়িত স্বরে হ্যামিলটন বললে, গড উইল ব্লেস ইউ মাই বয়, গড উইল ব্লেস ইউ। দ্যাট ডার্টি স্নেক, দ্যা ফিলদি স্নেক গেভ মি ওনলি ফিফটিন রুপিজ। তাতে কি কিছু হয় মিঃ বোস তুমিই বল। একজন ভদ্রলোকের এক রাত্রের ড্রিঙ্কের খরচাও হয় না।

তা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি তো ইচ্ছা করলে স্ট্রীতার কাছ থেকে নিতে পার।

সীতা! ডোণ্ট টক অ্যাবাউট হার। ক্রুয়েল, হার্টলেস উয়োম্যান। জান সে চলে যাবার পর থেকেই তো আমার এই অবস্থা। শি হ্যাজ ফিনিশড মি, শি হ্যাজ ফিনিশড মি! আই অ্যাম গন—গন ফর এভার। কিন্তু তবু—তবু আমি তাকে ভালবাসি।

তুমি তাকে সত্যিই ভালবাস হ্যামিলটন?

সহসা হাত বাড়িয়ে কিরীটীর একটা হাত চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল হ্যামিলটন, হ্যাঁ হ্যাঁ—বাসি—বিশ্বাস কর বোস—দো শি হ্যাজ ডেজার্টেড মি—তবু, তবু তাকে আমি ভালবাসি। আই লাভ হার, আই লাভ হার, আই লাভ হার লাইক এনিথিং। শি ইজ মাই ম্যারেড ওয়াইফ—শি ইজ—কথাটা শেষ হল না হ্যামিলটনের!

অকস্মাৎ আমাদের পিছন থেকে সরু মিহি গলায় কে যেন ডাকল, হ্যামিলটন।

কে? ও চিরঞ্জীব—

আগন্তুক ততক্ষণে বগলের ক্রাচের সাহায্যে আমাদের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে।

বেঁটে খাটো মানুষটা, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুটের বেশী হবে না।

রোগা লিকলিকে চেহারা।

পরিধানে একটা ঝলঝলে কালো রঙের পুরাতন জীর্ণ স্ল্যাক ও গায়ে অনুরূপ একটা ওপন-ব্রেস্ট কোট।

ভিতরে ময়লা একটা ছিটের শার্ট, তাও গলার বোতামটা খোলা।

মাথায় নিগ্রোদের মত ছোট ছোট চুল—ঘন কুঞ্চিত।

ছড়ানো কপাল, চাপা নাক, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ।

ছোট ছোট কুতকুতে দুটি চক্ষু যেন সতর্ক শিকারী বিড়ালের মত।

ডান পা-টা বোধ হয় পঙ্গু—অসহায় ভাবে ঝুলছে।

এস চিরঞ্জীব, তোমাকে এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—মাই বেস্ট ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ওনলি অ্যাডমায়ারার চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল অ্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ডস বোস—

কিন্তু হ্যামিলটনের আগ্রহে এতটুকু সাড়াও যেন দিল না চিরঞ্জীব।

সে বললে, তুমি এখানে বসে আছো আর তোমার জন্য পকেটে টাকা নিয়ে আমি তোমাকে সারা দুনিয়ায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

টাকা! আর ইউ রিয়েলি সেয়িং মানি!

ইয়েস—

ও, গড ব্লেস ইউ মাই বয়। ইউ ডোণ্ট নো হাউ আই অ্যাম ব্যাডলি ইন নিড অফ মানি! দাও, দাও—হাত বাড়াল হ্যামিলটন।

সে কি, পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি নাকি! চল, আমার বাড়ি চল।

চল, চল—টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় হ্যামিলটন।

আর একটু হলেই পা বাড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল হ্যামিলটন, কিন্তু পলকে হাত বাড়িয়ে পতনোন্মুত হ্যামিলটনকে ধরে চিরঞ্জীব হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

কেমন বিহ্বল হয়েই যেন ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি।

হঠাৎ কিরীটীর মৃদু কণ্ঠস্বরে ওর দিকে মুখ ফেরালাম।

বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে! টিয়া পাখি উড়ে গেল—সুব্রতচন্দ্র এবারে গৃহে চল।

তারপরই হাতের ঘড়ির দিকে তাকিযে বললে, উঃ, রাত বারোটা বাজতে মাত্র চোদ্দ মিনিট। গৃহিণী নিরতিশয় ব্যাকুলা হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।

তা হবারই তো কথা, সান্ধ্যভ্রমণ যদি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত গড়ায়—মৃদু হেসে বললাম আমি, ব্যাকুলা তো হবেনই।

তাড়াতাড়ি বিল চুকিয়ে দিয়ে আমরা হোটেলের বাইরে চলে এলাম।

হোটেলের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম।

একটু আগে হ্যামিলটনকে নিয়ে এই পথেই চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল হোটেল থেকে বের হয়ে এসেছে।

কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

কিরীটী আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, নেই হে বন্ধু, সে টিয়া পাখি অনেক আগেই উড়ে গিয়েছে! এবারে একটু পা চালিয়েই চল, কারণ পাড়াটা বিশেষ করে এই মধ্যরাত্রে তেমন সুবিধার নয়।

ট্রামরাস্তায় এসেও অনেক অপেক্ষার পর ট্যাক্সি মিলেছিল সেরাত্রে এবং কিরীটীকে তার গৃহে নামিয়ে দিয়ে বাসায় পৌছতে রাত সোয়া একটা বেজে গিয়েছিল।

॥ নয় ॥

সেই রাত্রের পর পুরো দুটো দিন কিরীটী আর বাড়ি থেকে কোথায়ও এক পাও বেরুল না।

কেবল নিজের বসবার ঘরে বসে বসে দুটো দিন সর্বক্ষণ পেসেন্স খেলা নিয়েই মেতে রইল।

তৃতীয় দিনও দ্বিপ্রহরে গিয়ে দেখি বসবার ঘরে চারিদিকে লাল পর্দা টেনে এয়ারকনডিশন মেশিন চালিয়ে ঠাণ্ডায় বসে পেসেন্স খেলছে সে।

আজ কিন্তু সত্যিই আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়।

কারণ গত দুটো দিন আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ সেরাত্রের ঘটনাগুলি ও কতকগুলো নরনারীর মুখ ভেসে ভেসে উঠছিল।

মনে মনে একটা আঁচও করে নিয়েছিলাম যে, অতঃপর নিশ্চয়ই তোড়জোড় করে কিরীটী গিয়ে ওভারসিজ লিঙ্কে হানা দেবে।

কিন্তু কিরীটী যেন সে রাত্রের ব্যাপার সম্পর্কে একেবারে বোবা।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটতও হয়ত আর একটু পরেই, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেয়ে উৎকর্ণ হই।

জুতোর শব্দটা ঠাণ্ডা ঘরের দরজা বরাবর যখন প্রায় এসেছে, কিরীটী তাস সাজাতে সাজাতেই আমাকে বললে, দরজাটা খুলে দে সুব্রত, নির্মলশিব এলেন।

সত্যি দরজা খুলে দিতে নির্মলশিবই এসে ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরে পা দিয়েই নির্মলশিব বলে, আঃ, প্রাণটা বাঁচল! কি আশ্চর্য! কি ঠাণ্ডা!

কিরীটী তাস সাজাতে সাজাতেই বলল, মল্লিক সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল নির্মলশিববাবু!

কি আশ্চর্য! তা আর করিনি! খাসা লোক—তবে—

তবে আবার কি?

প্রচণ্ড সাহেব!

তা বাঙালীরা ধুতি ছেড়ে কোট পাতলুন পরিধান করলে একটু সাহেব হয়ে পড়েন বৈকি। কিন্তু যে জন্য আপনাকে সেখানে যেতে বলেছিলাম তার কোন সংবাদ পেলেন কিনা?

কি আশ্চর্য! তা পেয়েছি বৈকি।

পেয়েছেন তাহলে!

হ্যাঁ।

বিদেশে কোন্ মালটা বেশী রপ্তানি হয় ওদের, জানতে পারলেন কিছু?

হ্যাঁ। চা, চাটনি আর ছাতি।

ছাতি?

হ্যাঁ—আমব্রেলা। আমেরিকায় নাকি প্রচুর চা আর ছাতি চালান যাচ্ছে আর বোম্বাযে বোম্বাযে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আমের আচার।

আমের আচার আর ছাতার স্যাম্পল্ দিলে বুঝি আপনাকে ?

স্যাম্পল্ মানে ?

না, বলছিলাম, শুধু ছাতি আর আমের আচার, সিঙ্গাপুরী কলা নয় ?

বেচারী নির্মলশিব, কিরীটীর সূক্ষ্ম পরিহাস উপলব্ধি করবে কি করে ? আমি কিন্তু ততক্ষণে রুদ্ধ হাসির বেগটা আর না সামলাতে পেরে হো-হো করে হেসে উঠলাম।

কি আশ্চর্য ! সুব্রতবাবু, আপনিও হাসছেন ?

নির্মলশিববাবুর কথায় কিরীটীও এবারে হেসে ওঠে।

যাক, সীতা আর আর্থার হ্যামিলটনের খোঁজ নিয়েছিলেন নির্মলশিববাবু ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

কি আশ্চর্য ! নিয়েছিলাম বৈকি। হাজবেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ। তবে বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওদের সেপারেশন হয়ে গিয়েছে।

ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে ?

না, তা হয়নি বটে, তবে—

তবে কি ?

ওরা বছরখানেক হল আলাদা ভাবে বসবাস করছে।

হুঁ। আর চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল ? তার কোন সংবাদ পেলেন ?

আপনার অনুমানই ঠিক। চায়না টাউন হোটেলের মালিক লোকটা।

তাহলে লোকটার দু'পয়সা আছে বলুন ?

কি আশ্চর্য ! তা আর নেই ! হোটেলটা খুব ভালই চলে। লোকটিও সজ্জন সন্দেহ নেই। আর মুরগীর রোস্ট যা করে না, আশ্চর্য, একেবারে যাকে বলে ফার্স্ট ক্লাস, অতি উপাদেয়।

মুরগীর রোস্ট বুঝি খাইয়েছিল আপনাকে !

নিশ্চয়ই। দু-প্লেট ভর্তি।

আমি এবারে প্রশ্ন করলাম, দু-প্লেটই খেলেন ?

কি আশ্চর্য ! দিলে আর খাব না ? না মশাই, আমার অত প্রেজুডিস নেই।

তা তো সত্যিই, আগ্রহভরে যখন বিশেষ করে সে দিয়েছে। কিন্তু নির্মলশিববাবু, শত্রুশিবিরে গিয়ে ঐ ধরনের প্রেজুডিসটা বর্জন করাই ভাল জানবেন।

কিরীটী শান্ত মৃদু কণ্ঠে কথাগুলো বললে।

কথাটা বলেই কিরীটী আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এল, আচ্ছা নির্মলশিববাবু,

ওভারসিজ লিঙ্কের ম্যানেজার ভদ্রলোকটির চেহারাটা কেমন? মানে বলছিলাম কি, দেখতে শুনতে কেমন! খুব লম্বাচওড়া দৈত্যের মত কি?

কি আশ্চর্য! কই না তো!

তবে কি রকম দেখতে?

রোগা লিকলিকে, একটু আবার খোনা। নাকিসুরে কথা বলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, একটা চোখও আবার বিশ্রী রকম ট্যারা।

একটা পা খোঁড়া নয়?

খোঁড়া! কই না তো!

হুঁ। বলুন তো কিরকম চেহারাটা তার ঠিক ঠিক।

নির্মলশিব বর্ণনা করে গেল মল্লিক সাহেবের চেহারাটা।

ওভারসিজ লিঙ্কের ম্যানেজারের চেহারার বর্ণনাটা মনে হল নির্মলশিবের মুখে শুনে ঠিক যেন মনঃপূত হল না কিরীটীর।

ব্যাপারটা যেন কিছুটা তার প্রত্যাশার বাইরেই মনে হল।

বুঝতে পারি লোকটার চেহারার একটা বর্ণনা কিরীটীর মনের মধ্যে ছিল। সেই বর্ণনার সঙ্গে না মেলায় সে যেন একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ অতঃপর কিরীটীর মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না।

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিতই হয়ে থাকে।

তারপর এক সময় ভ্রূ দুটো সরল হয়ে আসে।

চাপা খুশির একটা ঢেউ যেন কিরীটীর মুখের উপর দিয়ে খেলে যায়।

মৃদু কণ্ঠে সে বলে, না, সত্যি, আমারই ভুল হয়েছিল, ঘটোৎকচের মাথায় বা সেই ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে তো অতখানি বুদ্ধি থাকতে পারে না।

কিরীটীর উচ্চারিত ঘটোৎকচ কথাটা নির্মলশিবের কানে গিয়েছিল, সে বলে, কি আশ্চর্য! ঘটোৎকচ আবার কে মিঃ রায়!

একটা দৈত্য! ওভারসিজ লিঙ্কে আমরা সেরাত্রে একটা দৈত্যাকৃতি লোক দেখেছিলাম, কিরীটী তার কথাই বলছে নির্মলশিববাবু।

জবাব দিলাম আমি।

কি আশ্চর্য! তাই বলুন। আপনারা মিঃ গড়াই, গজানন্দ গড়াইয়ের কথা বলছেন। তা সত্যি—আমি মশাই একটু লেটে বুঝি—বলেই প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে উঠল নির্মলশিব।

॥ দশ ॥

নির্মলশিবের কাছ থেকে আরও সংবাদ পাওয়া গেল ওভারসিজ লিঙ্ক সম্পর্কে।

ম্যানেজার লোকটা অফিসে বড় একটা থাকেই না।

ঐ গজানন্দ গড়াই-ই সব একপ্রকার দেখাশোনা করে বলতে গেলে।

আর অফিসে সর্বদা থাকে সেক্রেটারী দিদিমণি সীতা মৈত্র।

আর একটা প্রশ্ন করেছিল কিরীটী নির্মলশিবকে।

যে সমস্ত মাল ওরা এদেশ থেকে অন্যান্য দেশে পাঠায় সে সমস্ত মাল সাধারণত কিসে যায়?

বলাই বাহুল্য সে সংবাদটা দিতে পারেনি নির্মলশিব সাহেব কিরীটীকে।

অবশেষে নির্মলশিব গাত্রোত্থান করেছিল। এবং বিদায় নেবার পূর্বে যখ কিরীটীকে শুধাল, এবার আমাকে কি করতে হবে বলুন মিঃ রায়?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, একটা বা দুটো বিশেষ নম্বরের ট্যাক্সি কিং ভ্যান নিশ্চয়ই ওভারসিজ লিঙ্ক অফিসে ঘন ঘন যাতায়াত করে আমা ধারণাটা আমার সত্য কিনা, একটু লক্ষ্য রাখবেন তো নির্মলশিববাবু।

কি আশ্চর্য! এ আর এমন শক্ত কথা কি, আজই এখুনি গিয়ে ড্রেস্‌কে ওখানে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পোস্ট করে রাখছি।

হ্যাঁ, তাই করুন। আপাতত ওইটুকুই করুন।

নির্মলশিব বিদায় নেওয়ার পর আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কি তাহলে সত্যি ধারণা ঐ ওভারসিজ লিঙ্কটাই হচ্ছে স্বর্ণমৃগয়ার ঘাঁটি?

তাই আমার এখন মনে হচ্ছে সুব্রত।

কিন্তু কেন, সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। কারণ সেরাত্রে ওভারসিজ লিঙ্ককে কেন্দ্র করে পর পর যে ব্যাপারগুলো ঘটেছিল সেগুলোকে স্রেফ ঘটনাচক্র ছাড়া আর কি বলা যায়?

জানবি, ঘটনাচক্রই বহু ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর সত্যেরও ইঙ্গিত দেয়। আমি অবিশ্যি ব্যাপারটা নিছক একটা ঘটনাচক্রই বলি না, বলি সাম্‌ আনসিন্‌ ফোর্স, কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের সত্যপথে চালিত করে, যেটা বহু ক্ষেত্রেই আমরা জীবনে অনুভব করি। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল ঐ ঘটনাচক্র ও আনসিন্‌ ফোর্সেরই ইঙ্গিত ছিল না। দেয়্যার ওয়্যার সামথিং মোর।

কি ?

প্রথমত: স্বর্ণমৃগয়ার ব্যাপারটা যে সত্য সেটা পূর্বেই আমার মন বলেছিল একটি কারণে।

কি, শুনি ?

সংবাদপত্র লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতিস, গত বছর তিন সময়ের মধ্যে জাহাজঘাটায় এবং প্লেনের ঘাটিতে পাঁচ-পাঁচটা বিরাট গোল্ড বা সোনার স্মাগলিংয়ের ব্যাপার ধরা পড়েছে। এবং সেই সূত্রে এক বা ততোধিক লোক স্মাগলার হিসেবে ধরা পড়লেও আসলে তারা চুনোপুঁটি মাত্র। ওই ব্যাপারের আসল রুইকাতলার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারেনি পুলিস কোনদিন। তবে ঐ সঙ্গে আর একটা সংবাদে প্রকাশ, পাঁচ-বারের মধ্যে বারতিনেক বিরাটকায় দৈত্যাকৃতি একটা লোককে বিভিন্ন অকুস্থানের আশেপাশে নাকি দেখা গিয়েছে; অবশ্য ঐ ব্যাপারের সঙ্গে তাকে কোনরকম সন্দেহই পুলিস করতে পারে নি। মাস আষ্টেক পূর্বে আমাদের সাউথের ডি. সি-র সঙ্গে তাঁর জীপে চেপে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। পথের মাঝে ট্র্যাফিকের জন্য ডি. সি-র জীপটাও দাঁড়ায়। পাশেই এমন সময় একটা নতুন ঝকঝকে ডজ কিংসওয়ে গাড়ি এসে দাঁড়ায় ব্রেক কষে। সেই গাড়ির মধ্যেই একটা দৈত্যাকৃতি লোক অর্থাৎ আমাদের ঐ ঘটোৎকচ বা গজানন্দ গড়াইকে আমি চাক্ষুষ প্রথম দেখি এবং বলাই বাহুল্য মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হই।

তারপর ? শুধালাম আমি।

সেই সময়ই ডি. সি. লোকটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হঠাৎ বলেছিলেন, মিঃ রায়, ঐ যে গাড়িটার মধ্যে দৈত্যের মত একটা লোক দেখছেন, বিখ্যাত তিনটে গোল্ড স্মাগলিংয়ের কেস যখন ধরা পড়ে, দুবার এরোড্রোম ও একবার জাহাজঘাটায়, ঐ লোকটাকে নাকি আশেপাশে দেখা গিয়েছিল।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ওকে সন্দেহ করলেও আজ পর্যন্ত লোকটার একটি কেশও স্পর্শ করা যায়নি।

কিরীটী বলতে লাগল, যাই হোক, সেই যে ঘটোৎকচকে আমি গাড়ির মধ্যে দেখেছিলাম, ভদ্রমহোদয়কে কেন যেন আর ভুলিনি। এবং সেদিন নির্মলশিবের সমস্ত ব্যাপার মনোযোগ দিয়ে শুনে আমার মনে হল, স্বর্ণমৃগয়ার ব্যাপারটার দক্ষিণ কলকাতার মধ্যেই কোথাও ঘাঁটি আছে। অবিশ্যি সেখানেও আমি কিছুটা যোগ-বিয়োগ করে অনুমানকেই আমার প্রাধান্য দিয়েছি বরাবরের মত।

যথা ?

আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। তবে যা মনে হয়েছিল—

কি ?

যোগ-বিয়োগটা করেছিলাম আমি দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলেই সংঘটিত দুটি বীভৎস ও রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড থেকে। সে হত্যাকাণ্ড দুটো তোমাদের সকলেরই জানা।

কোন্ দুটি হত্যাকাণ্ড ?

যে হত্যাকাণ্ড দুটোর কথা সেদিন নির্মলশিবের কাছে আমি উল্লেখ করেছিলাম।

মানে সেই পুলিস অফিসার মোহিনীমোহন—

হ্যাঁ, এবং দ্বিতীয়তঃ যে নিহত ব্যক্তির পরিচয়ের কোন হদিস এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সে যাই হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রথমত, আবার কিরীটী বলতে লাগল, সেই দ্বিতীয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন অর্থাৎ তার টুকরো টুকরো দেহখণ্ডগুলো এই দক্ষিণ কলকাতাতেই পাওয়া গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাত্র সাত দিন পূর্বে এই এলাকারই অন্যতম পুলিস অফিসার মোহিনীমোহনের রহস্যময় নিরুদ্দেশের ব্যাপার ঘটে। যাই হোক আপাতত ঐ দুটি কারণই সেদিন যেন অলক্ষ্যে আমার মনকে দক্ষিণ কলকাতার প্রতিই আকৃষ্ট করে। একটা ব্যাপার কি জানিস সুব্রত, বহুবার আমার জীবনে আমি দেখেছি, ঐ ধরনের ইঙ্গিত মনকে আমার কখনও প্রতারিত করেনি।

শুধু কি সেই কারণেই সেদিন সন্ধ্যায় তুই অকস্মাৎ বের হয়েছিলি সান্ধ্যভ্রমণের নাম করে ?

না। আরও একটা কারণ ছিল অবিশ্যি সেদিনকার সান্ধ্যভ্রমণের পশ্চাতে।

কী ?

ঐ ভাবে সোনা স্মাগল করা যে এক-আধজনের কর্ম নয়, সুনিশ্চিত ভাবে তাদের যে একটা গ্যাং বা দল আছে এবং নির্দিষ্ট সুচিন্তিত একটি কর্মপদ্ধতিও আছে, কথাটা কেন যেন আমার মনে হয়েছিল এবং ঐ সঙ্গে এই মনে হয়েছিল ঐ সব কিছুর জন্য চাই একটি মিলনকেন্দ্র, যে মিলনকেন্দ্রটির বাইরে থেকে একটা সকলের চোখে ধুলো দেওয়ার মত শো থাকবে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ একটা অফিস।

অফিস ?

হ্যাঁ, অফিস। কিন্তু অফিস-সংক্রান্ত ব্যাপার সাধারণত ক্লাইভ স্ট্রীট বা ডালহাউসি অঞ্চলেই হয় অথচ সেখানে আবার পুলিসেরও আনাগোনা বেশী। সেক্ষেত্রে স্বর্ণমৃগয়া করছে যারা তাদের পক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় অফিস করাটাই হয়ত নিরাপদ হবে। বিশেষ করে সেই জন্যেই একবার যতটা সম্ভব আশপাশটা ঘুরেফিরে দেখবার জন্য বের হয়েছিলাম সেই সন্ধ্যায় যদি ঐ ধরনের কোন কর্মস্থল মানে অফিস ইত্যাদি চোখে পড়ে। কিন্তু ভাগ্যদেবী বরাবরই দেখেছি আমার প্রতি প্রসন্ন। সেদিনও তাই ঘটল। ঘুরতে ঘুরতে ওভারসিজ লিঙ্কের অফিসের কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ একটা ব্যাপারে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম।

কি ব্যাপার?

ঘটোৎকচ—

ঘটোৎকচ?

হ্যাঁ, তাকে দেখলাম একটা ট্যাক্সি থেকে নেমে ওভারসিজ লিঙ্কের অফিসবাড়িতে ঢুকতে। সঙ্গে সঙ্গেই ওভারসিজ লিঙ্ক আমার মনকে আকর্ষণ করে। তারপর যখন শুনলাম তোর মুখে বাড়িটা নতুন, বুঝলাম অফিসটাও নতুন, নামটাও দেখলাম বিচিত্র এবং সাইনবোর্ডে বোল্ড লেটার্সে তাদের বিজ্ঞাপিত কাজকারবারটার সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে মনকে আমার সন্দিগ্ধ করে তুলল যেন সঙ্গে সঙ্গেই। সর্বোপরি সেখানে ক্ষণপূর্বে ঘটোৎকচের যখন প্রবেশ ঘটেছে—যাকে ইতিপূর্বে সোনার স্মাগল কেসে অকুস্থলের আশেপাশে দেখা গিয়েছিল বার তিনেক। অতএব কালবিলম্ব না করে আমি অন্দরে পা বাড়ালাম। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে ঘটোৎকচকে প্রথমটায় না দেখে হতাশ হয়েছিলাম তবে হতাশা আর রইল না তিলোত্তমা সন্দর্শনের পর।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ দেহ ও মন পুলকিত ও চমৎকৃত হল। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

তাহলে তোর ধারণা কিরীটী, নির্মলশিবের রহস্যের মূলটা ঐ ওভারসিজ লিঙ্কের সঙ্গে জড়িত?

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। বিশেষ করে সেরাত্রে সেখানকার আবহাওয়া ও তিনটি প্রাণীকে দেখবার পর থেকে।

তিনটি প্রাণী?

হ্যাঁ। ঘটোৎকচ, তিলোত্তমা ও আর্থার হ্যামিলটন।

কিন্তু—

I have not yet finished! অমন একটা কাজের জায়গায় তিলোত্তমা কারাও

যেমন বেখাপ্পা তেমনি ঘটোৎকচ পর্বের জুলুম ও হ্যামিলটনের নিরুপায়তা সব কিছুই যেন কেমন একটা এলোমেলো—জট পাকানো। জট পাকানো মানেই গোলযোগ, অতএব যোগ-বিয়োগ করে নিতে আমার অসুবিধা হয়নি। তাই—

তাই কি ?

তাই সেদিন তার কেসের আলোচনা প্রসঙ্গে নির্মলশিবকে যে আশ্বাস দিয়েছিলাম সেটাও যে মিথ্যে নয় সেটাও সেরাত্রে ওখানে হানা দেবার পর সুস্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম।

মানে দলে ভাঙন ধরেছে ?

হ্যাঁ, এসব কারবারে সাধারণত যা হয়ে থাকে। মারাত্মক লোভেঃ ধ্বংস হয়ে যায়—মানে নিজেরাই শেষ পর্যন্ত নিজেদের ধ্বংসের বী কথাটা নির্মলশিবকেও বলেছিলাম। কিন্তু সে গা দিল না কথাটায় ত ডিটেলস্ আপনি থেকে তারা ধ্বংস না হলেও এটা বুঝতে পারছি যে তাদের দিন সা দেখে এসেছেন হয়ে এসেছে।

যেহেতু কিরীটী-শনির দৃষ্টি তাদের ভাগ্যের উপর পড়েছে।

হাসতে হাসতেই এবার আমি কথাটা বললাম।

॥ এগার ॥

তারপরও কিরীটী একটা সপ্তাহ বাড়ি থেকে বের হল না।

একান্ত উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় ভাবে সে তার সময় কাটাতে লাগল তাস নিয়ে পেসেন্স খেলে খেলেই।

কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম তাস নিয়ে সর্বক্ষণ উদাসীন থাকলেও কিছু একটার প্রত্যাশায় যেন তার দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

সমস্ত অনুভূতি তার যেন যাকে বলে সেতারের তারের মত চড়া সুরেই বাঁধা হয়ে আছে।

ঠিক এমনি সময় একদিন বেলা এগারটা নাগাদ রীতিমত যেন হন্তদন্ত হয়ে নির্মলশিব এসে ঘরে প্রবেশ করল কিরীটীর।

কি আশ্চর্য ! মিঃ রায়—

কিরীটী পূর্বের মতই তাস নিয়ে খেলছিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে হাতের তাসগুলো একান্ত অবহেলায় টেবিলের উপরে একপাশে ঠেলে দিয়ে, যেন আপাতত তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে নির্মলশিবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি, ইতিহাসের আবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, এই তো নির্মলশিববাবু?

কি আশ্চর্য! ইতিহাস—

হ্যাঁ—নির্বিকার ভাবেই পুনরাবৃত্তি করে কথাটার কিরীটী।

তাহ ঘি আশ্চর্য! সুব্রতবাবু, এক গ্লাস জল।

একটা ব্যাপারজার কাছে উঠে গিয়ে জংলীকে এক গ্লাস জল দিতে বললাম।

কি ব্যাপারআনার পর ঢোঁ ঢোঁ করে এক গ্লাস জল প্রায় এক টানেই নিঃশেষ

ঘটোৎকচ—'লে, আর এক গ্লাস।

ঘটোৎকচ? গ্লাসটা নিয়ে চলে গেল।

হ্যাঁ, তাকেণে এক গ্লাস জল পান করে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে নির্মলশিব।

ঢুকতে। লে, আবার খুন হয়েছে আমার এলাকায় মিঃ রায়—

শুনলামনতাম হবে। নির্বিকার ভাবেই কিরীটী কথাটা বলে।

বি জানতেন?

হ্যাঁ, এবং আপনার কাছে সংবাদটা পেয়ে দুটো ব্যাপার অন্তত প্রমাণিত হল।

দুটো ব্যাপার?

হ্যাঁ

মানে?

প্রথমত আপনার ঐ এলাকার সঙ্গেই যে স্বর্ণমৃগয়ার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে আমার সেই অনুমানটা, এবং দ্বিতীয়ত খুব শীঘ্রই পূর্বের সেই হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটবে সেটা। বিশেষ করে যে সংবাদটার জন্য এই কয়দিন সত্যিই আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু যাক সে কথা। নিহত ব্যক্তিটি কে? তার কোন পরিচয় পেলেন বা তাকে আইডেনটিফাই করতে পারা গিয়েছে?

না, তবে—

তবে কি?

লোকটার বাঁ হাতে হিন্দীতে উল্কি করে নাম লেখা আছে—

কি নাম লেখা আছে?

ভিখন—

কি, কি বললেন? কি নামটা বললেন? উত্তেজিত কণ্ঠে কিরীটী প্রশ্নটার

পুনরাবৃত্তি করল।

ভিখন।

ভিখন!

হ্যাঁ।

লোকটার গায়ের রঙ কালো? আবার প্রশ্ন করল কিরীটী।

হ্যাঁ।

কপালে ডানদিকে একটা কাটা দাগ আছে?

আছে—কি আশ্চর্য!

নাকের উপরে একটা আঁচুলি আছে?

আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এসব কথা, মৃতদেহ সম্পর্কে এত ডিটেলস্ আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি মর্গে গিয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহটা দেখে এসেছেন নাকি মিঃ রায়?

না, আপনিই তো দেখেছেন।

কি আশ্চর্য! তা তো দেখেছিই, কিন্তু আপনি এত সব জানলেন কি করে!

বাঃ, আপনিই তো বললেন সব। যাক সে কথা, কি ভাবে লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে

শ্বাসরুদ্ধ করেই অর্থাৎ স্ট্র্যাঙ্গল করেই অবিশ্যি তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কি বলব মিঃ রায়, কি আশ্চর্য, কোন রকম ভাবে কোন স্ট্র্যাঙ্গল করার কোন চিহ্নই গলায় নেই মৃতের।

পোস্টমর্টেমে বুঝি প্রমাণিত হয়েছে?

কি আশ্চর্য! পোস্টমর্টেম এখনো তো হয়ইনি। পুলিস সার্জেনের তাই মত।

অভিমত! ও, তা মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হল ঠিক কোথায়?

কালীঘাট ব্রিজের তলায়।

হত্যাকারীর তাহলে বলুন এখনও কিছুটা ধর্মভীতি রয়েছে!

কি আশ্চর্য! তার মানে?

এটা বুঝলেন না—সম্মুখেই পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা আর হাত বাড়ালেই সর্বপাপ-হারিণী সর্বমঙ্গলা মা কালী। হত্যার পাপ যদি হয়েই থাকে তাতেই স্খলন হয়ে গিয়েছে।

কথাগুলো বলে কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

॥ বারো ॥

আমি কিন্তু তখনও রীতিমত অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি।

মৃতের অনুরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষকে স্মৃতির সাহায্যে মনের মধ্যে তোলপাড় করে খুঁজছি।

কিরীটী এমন সময় আবার কথা বললে, আপনার অনুসন্ধানের কাজটা তো এবার অনেক সহজ হয়ে এল নির্মলশিববাবু—

কি আশ্চর্য। সত্যি বলছি, দয়া করে আপনার হেঁয়ালি ছেড়ে সহজ করে যা বলবার বলুন।

সহজ করেই বলছি। কিন্তু তার আগে আপনার উপরে যে কাজের ভার দিয়েছিলাম তার কি করলেন বলুন তো?

কোন্ কাজ?

বিশেষ কোন নম্বরের ট্যাক্সির বা ভ্যানের ওভারসিজ লিঙ্কে যাতায়াত আছে কিনা সংবাদটা পেলেন কিছু?

না। গত কদিন ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের অন্তত গোটা পঁচিশেক ট্যাক্সি ও ভ্যান ঐ অফিসে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে।

হুঁ। সোনার কারবারীরা খুবই সতর্ক আছে দেখছি। তবে টোপ যখন গিলেছে একবার, ফসকে যেতে নিশ্চয়ই পারবে না।

কি আশ্চর্য! টোপ গিলেছে?

হ্যাঁ! ভিখনের মৃত্যুটা সেই টোপ গেলবারই অকাট্য নিদর্শন।

নির্মলশিব তারপর আরও কিছুক্ষণ ধরে নানা ভাবে নানা প্রশ্ন করে কিরীটীর কাছ থেকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে জানবার যাকে বলে আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু কিরীটী সেদিক দিয়েই গেল না আর।

নির্মলশিব যেন একটু বিষণ্ণই হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে থাকে।

অবশেষে একসময় বলে, আমি কিন্তু একজনকে অ্যারেস্ট করব বলে একপ্রকার স্থিরই করে ফেলেছি ইতিমধ্যে মিঃ রায়।

অ্যারেস্ট করবেন? কাকে? এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল কিরীটী একটু যেন কৌতুকের সঙ্গেই।

আর্থার হ্যামিলটনকে। নির্মলশিব বললে।

সে কি! কেন?

আমার স্থির বিশ্বাস ওকে অ্যারেস্ট করলেই ঐ দলটার অনেক গোপন কথা পাওয়া যাবে।

সত্যিই পাওয়া যাবে মনে করেন?

নির্ঘাত পাওয়া যাবে।

এ ধারণা আপনার কেন হল বলুন তো?

কেন?

হুঁ।

ও একটি বাস্তুঘুঘু।

বাস্তুঘুঘু!

হ্যাঁ। ওকে চাপ দিলেই অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। নির্ঘাত ও অনেক কিছু জানে।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে এবারে হাসল।

কি আশ্চর্য! হাসছেন যে?

কারণ, তাতে করে আপনি যেটুকু এ কদিন এগিয়েছেন তার দশগুণ আপনাকে পিছিয়ে আসতে হবে।

কি আশ্চর্য! তাহলে আমি কি করব বলতে পারেন?

আজ নয়, তিনদিন বাদে আসুন এই সময়, বলব।

কি আশ্চর্য! কিন্তু—

কিন্তু নয়। জানেন না, সবুরে মেওয়া ফলে? শনৈঃ শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘন করতে হয়—শাস্ত্রের বচন।

অতঃপর কতকটা ক্ষুণ্ণ মনেই বেচারী নির্মলশিবকে সেদিনের মত বিদায় নিতে হল।

আরও আধ ঘণ্টা পরে।

সহসা কিরীটী গাত্রোত্থান করে বলল, চল সুব্রত, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা যাক।

বেলা তখন প্রায় বারোটা।

গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের তাপে বাইরেটা তখন যে ঝলসে যাচ্ছে অনায়াসেই সেটা বোঝা যায় ঘরের মধ্যে বসেও।

বললাম, এই অসময়ে ?

বেরুবার আবার সময় অসময় আছে নাকি ? চল্—ওঠ্—

অগত্যা উঠতেই হল।

এবং ঐ প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে বাইরে বের হয়ে পদব্রজেই কিরীটী নির্বিকারচিত্তে পথ অতিক্রম করে চলল এবং বলাই বাহুল্য আমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলতে হল।

হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করলাম কিরীটী ওভারসিজ লিঙ্কের অফিসের দিকেই চলেছে।

তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় চলেছিস ?

পান খাব। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে হাঁটতে হাঁটতে বলে।

কিন্তু চলেছিস কোথায় ?

বললাম তো পান খেতে।

পান !

হ্যাঁ, লোকটা—মানে সেই পানওয়ালাটা—চমৎকার পান সাজে রে, সেদিন চমৎকার লেগেছিল। বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী দাঁড়িয়ে যায়।

দাঁড়ালি কেন ?

না, কিছু না, চল্—চলতে শুরু করে আবার।

কয়েক পা চলে আবার কিন্তু দাঁড়ায়।

এবার মিনিট দুই-তিন দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে শুরু করে।

ব্যাপারটা কিন্তু এবার কিছুটা অনুমান করেই পিছনে তাকালাম।

হাত দশ-পনের দূরে দেখি একটা জীর্ণ বেশ পরিহিত পথের ভিক্ষুক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

মৃদুকণ্ঠে এবারে কিরীটী বলল, ঐ ভিখিরীটা বোধ হয় ভিক্ষে চায় না সুব্রত !

পুনরায় হাঁটতে শুরু করে এবং হাঁটতে হাঁটতেই কথাটা বলে কিরীটী।

তাই মনে হচ্ছে নাকি ?

হুঁ, সেই দোরগোড়া থেকেই একেবারে দেখছি অনুগত দেবর লক্ষ্মণের মতই আমাদের অনুগমন করে আসছে।

কথাটা কিরীটী বললে বটে তবে মনে হল কিরীটী অতঃপর যেন আর পিছনের ভিখারীটার দিকে কোন মনোযোগই দিল না।

কিরীটী ক্ষণকাল লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, চার আনার ভাল পান সেজে দাও তো।

মিঠা না সাদা পান বাবু ?

মিঠা নয়, সাদা। জর্দা কিমাম দিয়ে দাও।

লোকটি পান সাজতে লাগল।

আড়চোখে লক্ষ্য করে দেখলাম সেই ভিখারীটা অল্পদূরে একটা লাইটপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চাইছে।

॥ তেরো ॥

কিরীটী অদূরবর্তী সেই ভিখারীর কথা উল্লেখ করার পর থেকেই আমার নজরটা সেই ভিখারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

কিরীটী যখন পানওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে আমার নজর তখন ভিখারীর প্রতিই নিবদ্ধ।

একটু অন্যমনস্কও হয়ে ছিলাম।

হঠাৎ সেই সময় কিরীটীর চাপা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠি।

সুব্রত!

কি ?

ঐ ভিখারী সাহেবকে চিনতে পারছিস ?

অ্যাঁ! কি বললি ?

বলছি ঐ ভিখারী সাহেবটিকে চিনতে পারছিস ?

সত্যি কথা বলতে কি, তখনি লোকটা ভিখারীর ছদ্মবেশে যে আসলে কে বুঝে উঠতে পারিনি বলেই সেই দিকেই তখনও তাকিয়ে ছিলাম।

এবা[illegible] কিরীটীর কথায় অদূরে দণ্ডায়মান ভিখারীর দিকে ভাল করে তাকালাম আর এ[illegible]ার।

চে[illegible]রা দেখে লোকটার বয়স ঠিক ঠিক বোঝবার উপায় নেই।

[illegible]ব মোটামুটি মধ্যবয়সী বলেই লোকটিকে মনে হয় ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও। পরিধানে একটা জীর্ণ সেলাই-করা মলিন ঝলঝলে গরম প্যাণ্ট।

গায়ে অনুরূপ একটা টুইডের ওপন-ব্রেস্ট কোট।

মাথায় একটা বহু পুরাতন জীর্ণ ফেল্ট ক্যাপ।

মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

হাতে একটা মোটা লাঠি।

ভিক্ষার জন্য পথচারীদের কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেটা যে একটা ভেক মাত্র সেটা এবারে লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পরই বুঝতে পারলাম।

এবং ভিক্ষাটা যখন একটা ভেক মাত্র, লোকটার পোশাক ও বাইরের চেহারাটার মধ্যেও যে ছল রয়েছে, সেটাও তো সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু তবু যেন চিনতে পারলাম না লোকটাকে।

এমন সময় কিরীটীর মৃদু আকর্ষণে ওর মুখের দিকে তাকাতেই নিম্নকণ্ঠে সে বললে, চল্, গলাটা বড শুকিয়ে গিয়েছে, সামনে ঐ 'পান্থ পিয়াবাস' থেকে চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক—

আমি এবারে কিরীটীর প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি মাত্রও না করে রাস্তা অতিক্রম করে অপর দিককার ফুটপাতের সামনের দোকানটার মুখোমুখি প্রায় চায়ের রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে চললাম।

এবং ঠিক যেন ঐ সময়েই একটা চকচকে ভ্যান আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে পাশের দোকানটার সামনে রাস্তার উপরে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

ভ্যানটার গায়ে একটি নর্তকীর ছবি আঁকা ও তার মাথায় লেখা 'উর্বশী সিগারেট'।

ভ্যানটা প্রায় আর একটু হলেই আমাদের চাপা দিয়ে যাচ্ছিল আর কি, এমন ভাবে গা ঘেঁষে গিয়েছিল।

যাই হোক, দুজনে এসে অপর ফুটপাতে 'পান্থ পিয়াবাস' রেস্টুরেন্টের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ছোট রেস্টুরেন্ট, ঐ সময়টা প্রায় নির্জনই ছিল।

মাত্র একটি চা-পিয়াসী লোক বসে বসে চা পান করছিল।

ঘর বলা যায় না, একটা চিলতে-মত জায়গায় রেস্টুরেন্টটি।

সিলিং থেকে দুটি ঘূর্ণ্যমান পাখা এবং দুটি পাখাই যে কতকালের পুরানো তার ঠিক নেই। ঘড়ং ঘড়ং একটানা শব্দ তুলে যেভাবে ঘুরছে তার তুলনায় হাওয়া কিছুই দিচ্ছে না।

ছোট ঐ একচিলতে জায়গার মধ্যেই কাঠ ও চট সহযোগে একটা পার্টিশন দিয়ে চা ও অন্যান্য সব কিছু তৈরীর ব্যবস্থা।

অর্থাৎ রেস্টুরেন্টের রন্ধনশালা বা প্যান ।

আর বাকি অংশে মালিকের ছোট টেবিল ও টুলটি ছাড়া ছ'টি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের সঙ্গে চারটি করে চেয়ার পাতা।

হোটেলের মালিকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছিই হবে বলেই যেন মনে হল।

রীতিমত কৃষ্ণবর্ণ ও গোলালো মাংসল চেহারা লোকটার।

গায়ে বোধ হয় একটা মার্কিনের পাঞ্জাবি।

ঘরে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রিক পাখা থাকা সত্ত্বেও হাতে একটি তালপাতার পাখা সবেগে চালনা করছিল লোকটা থেকে থেকে, কারণ লোকটা ঘেমে একেবারে স্নান করে যাচ্ছিল।

আমাদের রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করতে দেখেই সবেধন নীলমণি ছোকরা চাকরটি এগিয়ে আসে।

কি দেব বাবু?

দু কাপ চা দে—কিরীটী বললে।

রাস্তার দিকে মুখ করে দরজা ঘেঁষে একেবারে দুজনে বসলাম দুটো চেয়ার টেনে।

কিরীটীর দিকে চেয়ে দেখি সে যেন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের দিকে।

এবং চেয়ে আছে যেন মনে হল রাস্তার অপর ফুটপাতের ধারে সামনের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটার দিকেই।

আর ঐসঙ্গে নজরে পড়ল খাকী বুশ-কোট ও প্যান্ট পরিহিত বোধকরি ঐ ভ্যানেরই ড্রাইভারটা পাশের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছে

ছোকরা চাকরটা এসে দু'কাপ চা আমাদের দুজনের সামনে টেবিলটার নামিয়ে দিয়ে গেল।

কিরীটীর কিন্তু যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।

থেকে থেকে ওষ্ঠধৃত সিগারটায় টান দিতে দিতে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাইরের দিকে দেখলাম তখনও।

বললাম, কি দেখছিস?

উর্বশী সিগারেট খেয়েছিস কখনও সুব্রত? পাল্টা প্রশ্ন করে আমার প্রশ্নের জবাবে কিরীটী।

না। বললাম।

খেয়ে দেখ,—এই নে, বলে পকেট থেকে সত্যি সত্যিই একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিল।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সেদিন যে ঐ দোকান থেকে দু-তিন প্যাকেট সিগারেট ও

কিনেছিল তারই একটা।

কি বলব ভাবছি।

এমন সময় কিরীটী আবার বললে, তা যা-ই বলিস, সিগারেটের ব্যবসা কিন্তু লাভজনক।

বললাম, জানি।

লেকের ধারে একটা বিরাট নতুন বাড়ি হয়েছে দেখেছিলাম।

নজর করিনি কোন্ বাড়িটার কথা বলছিস?

বিরাট চারতলা গেট ও লনওয়ালা বাড়িটার কথা বলছি। বাড়িটা শুনেছি এক বিড়ির ব্যবসায়ীর। 'হনুমানজী বিড়ি'। কিন্তু—

কি?

মোহিনী বিড়ি, মহালক্ষ্মী বিড়ি, হনুমানজী বিড়ি, হাউইজাহাজ বিড়ি, রেলমার্কা বিড়ি—নানা ধরনের বিড়ির বিজ্ঞাপন দেখেছি, কিন্তু সিগারেট বলতে তো সবেধন নীলমণি ন্যাশন্যাল টোবাকো কোম্পানী। হঠাৎ উর্বশী সিগারেট যে কোথা থেকে এলেন বুঝতে তো পারছি না। তা ছাড়া এর আগে ঐ নামটা চোখে পড়েছে বলেও তো মনে পড়ছে না।

তুই তো আর সিগারেট খাস না, খেলে হয়ত নজরে পড়ত।

তা বটে—অনেকগুলো প্যাকেট ভ্যান থেকে নামাচ্ছে দেখছি—

হুঁ! ব্যবসাটা বেশ জমে উঠেছে মনে হচ্ছে। তাই ভাবছি উর্বশীর আবির্ভাব ...কে হল এ শহরে?

...মি ব্যাপারটায় আদৌ মনোযোগ দিইনি গোড়া থেকেই। তাই একটু ...বেই কথাগুলো বলছিলাম।

...ন্তু কিরীটীর পরবর্তী কথায় হঠাৎ যেন এতক্ষণে মনে হল আমার, কিরীটীর ...কের দ্বিপ্রহরের অভিযানটা ঐ পানের দোকানটিকে কেন্দ্র করেই।

এবং এতক্ষণে বুঝতে পারলাম এই খর রৌদ্রতাপেও কিরীটীকে ঐ পানের দোকানটিই ঘরের বাইরে টেনে এনেছে।

কিন্তু নিশ্চয়ই তোর সীতা মৈত্র—আমাদের সেক্রেটারী দিদিমণি সিগারেট খায় না সুব্রত?

বলাই বাহুল্য, কিরীটীর ঐ ক... প্রতি আকৃষ্ট হয়।

দেখলাম, আশ্চর্য! সত্যিই সীতা মৈত্রই তো!

কাঁধে একটা র‍্যাশন ব্যাগের মত ব্যাগ ঝুলিয়ে পানের দোকানটার দিকে চলেছে ছাতা মাথায় দিয়ে।

সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

সীতা মৈত্র সোজা উর্বশী সিগারেট ভ্যানটার মধ্যে উঠে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যানটা ছেড়ে দিল।

ব্যাপারটা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি আকস্মিক।

অতঃপর কিংকর্তব্যম্। মনে মনে বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই তাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ ঐ সময় আবার কিরীটীর কথায় চমকে উঠলাম, তোর নাম কি রে?

চেয়ে দেখি কিরীটীর সামনে দাঁড়িয়ে তখন রেস্টুরেন্টের সবেধন নীলমণি ছোকরাটি।

এজ্ঞে—গদাই।

গদাই কি?

এজ্ঞে ঢোল।

কত মাইনে পাস এখানে? র বে

এজ্ঞে কিছুই না। সই

হঠাৎ সেই সময় হোটেলের মালিকের গর্জন শোনা গেল, এই গদা? আয়— থেকেশ্যা

গদাই তাড়াতাড়ি মনিবের ডাকে এগিয়ে গেল। সব

ওঠ, সুব্রত। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

কোথায় যাবি?

কোথায় আবার যাব? বাড়ি যেতে হবে না?

রেস্টুরেন্টের দাম মিটিয়ে দিয়ে দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

কয়েক পা অগ্রসর হতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

হাত-ইশারায় ট্যাক্সিটা থামিয়ে কিরীটী আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

পথে কিরীটী একেবারে চুপ করে বসে রইল চলন্ত ট্যাক্সির মধ্যে।

বুঝলাম গভীরভাবে কিছু একটা ও চিন্তা করছে।

এসময় কোন প্রশ্ন করলেও জবাব মিলবে না।

॥ চোদ্দ ॥

দিন দুই পরে একদিন দ্বিপ্রহরে।

কিরীটীর বাড়িতেই তার ঠাণ্ডা ঘরে বসে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

গত পরশু সকালে কিরীটী কৃষ্ণাকে বলে গিয়েছে বর্ধমানে সে যাচ্ছে একদিনের জন্য। কিন্তু দুদিন হতে চলল প্রায় তার এখনও দেখা নেই।

কৃষ্ণার সঙ্গে সেই আলোচনাই হচ্ছিল।

হঠাৎ তার বর্ধমানে কি দরকার পড়ল? শুধালাম আমি।

তা তো কিছু বলে যায়নি। কৃষ্ণা জবাব দেয়।

নির্মলশিববাবুর ব্যাপারেই গেল নাকি?

কে জানে!

নীলমাণ

এলেন বুঝতেই বেলা তিনটে নাগাদ কিরীটী ফিরে এল।

তো মনে পড়ল, হঠাৎ বর্ধমান গিয়েছিলি যে?

তুই তো ঘুরে এলাম। একটা সোফার উপরে বসতে বসতে কিরীটী জবাব দেয়।

তা বটে। তা জিজ্ঞাসা করছি, হঠাৎ সেখানে কি কাজ পড়ল?

হুঁ! এ তেমন কিছু নয়, শ্বশুরবাড়ির দেশটা দেখে এলাম।

কার? কার শ্বশুরবাড়ির দেশ?

তিলোত্তমার। কিন্তু সখি—এবারে কিরীটী কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললে, রন্ধনশালায় কিছু কি অবশিষ্ট আছে?

আছে।

তাহলে স্নানটা সেরে নিই।

কিরীটী উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

কিরীটী মুখ খুলল আহারাদির পর। আমি, কৃষ্ণা ও কিরীটী তিনজনে তখন ঠাণ্ডা ঘরে এসে বসেছি।

গভীর জলের মাছ এইটুকু বোঝা গেল আজ। হঠাৎ কিরীটী একসময় বললে।

কিরীটীর খাপছাড়া কথায় ওর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী ওষ্ঠধৃত পাইপটায় একটা টান দিয়ে, পাইপটা হাতে নিয়ে এবার বললে, বেচারী নির্মলশিব তাই কোন হদিস করতে পারেনি।

তুই তাহলে হদিস করতে পেরেছিস বল্? প্রশ্ন করলাম আমি।

পুরোপুরি হদিস করতে পারিনি বটে তবে মোটামুটি রাস্তাটা মনে হচ্ছে বোধ হয় খুঁজে পেয়েছি।

রাস্তা!

হ্যাঁ, চারটে ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি কিন্তু শেষ অর্থাৎ পঞ্চম ঘাঁটিটা কোথায় সেটা জানতে পারলেই কিভাবে কোথা দিয়ে চোরাই সোনার লেন-দেনটা হয় জানতে পারতাম।

চারটে ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছ? কৃষ্ণা প্রশ্ন করে এবার।

হ্যাঁ, এক নম্বর ঘাঁটি হচ্ছে ওভারসিজ লিঙ্ক, দু নম্বর চায়না টাউন, আর তৃতীয় ঘাঁটি পানের দোকানটি এবং অনুমান যদি আমার ভুল না হয় তো চতুর্থ ঘাঁটি হচ্ছে 'পান্থ পিয়াবাস'। অবিশ্যি স্বীকার করতেই হবে, খুব planned wayতে কারবারটা চলছে যাতে করে কোনক্রমেই কোন দিক থেকে তাদের উপরে সন্দেহ না জাগে কারও বিন্দুমাত্রও।

কিরীটীর কথার মধ্যে ঐ সময় ঘরের কোণে রক্ষিত ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

কিরীটীই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল, হ্যালো! কে, বাজারিয়া? হ্যাঁ—রায় কথা বলছি। পাওয়া গিয়েছে! Good—সুসংবাদ! আজ থেকেই তাহলে ফ্ল্যাটটা পাওয়া যাবে বলছে! তবে আজই যাব! হ্যাঁ - হ্যাঁ—আজই। সব ব্যবস্থা করে ফেল। ঠিক আছে।

কিরীটী ফোনটা নামিয়ে রেখে এসে পুনরায় সোফায় বসল।

কি ব্যাপার, কে ফোন করেছিল? কি ফ্ল্যাটের কথা বলছিলে ফোনে? কৃষ্ণা শুধায়।

ওভারসিজ লিঙ্কের উপরে একটা খালি ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে।

ওভারসিজ লিঙ্কের উপর খালি ফ্ল্যাট!

হ্যাঁ—

তা হঠাৎ ফ্ল্যাটের তোমার কি প্রয়োজন হল?

এক বাড়িতে বেশি দিন থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। তাই একটু বাসা বদল আর কি।

সেখানে সেখানে তুমি যাচ্ছ?

হ্যাঁ, একটা সুটকেসে কিছু জামা-কাপড় আর বেডিং তৈরী করে রাখ।

কি হেঁয়ালি শুরু করলে বল তো? বলে কৃষ্ণা।

বাঃ, ঐ দেখ। হেঁয়ালি এর মধ্যে কি দেখলে? দিন কতক গিয়ে ওই ফ্ল্যাটটায় থাকব একটু নিরিবিলিতে ভাবছি।

ফ্ল্যাটটায় থাকবে?

হ্যাঁ, অবিশ্যি একা নয়, সহ সুব্রত।

আমি! প্রশ্নটা করে আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কি আশ্চর্য! নিশ্চয়ই তুই। 'কি আশ্চর্য' নির্মলশিবকেও অবিশ্যি নেওয়া যেত কিন্তু ভিখারী সাহেবের চক্ষুকে কি ফাঁকি দিতে পারবে নির্মলশিবের ঐ বিশেষ প্যাটার্নের চেহারাটা?

কোন আর প্রতিবাদ করলাম না। কারণ বুঝতে পেরেছি তখন সবটাই কিরীটীর পূর্বপরিকল্পিত।

এবং এও বুঝতে পেরেছি ওর সঙ্গে গিয়ে আমাকে সেই ফ্ল্যাটে আপাতত কিছু ন থাকতে হবে। কেন যে তার মাথায় হঠাৎ ঐ পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে তারও ান উত্তর যে আপাততঃ ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না তাও জানি।

তাই বললাম, তাহলে আমি উঠি—

উঠবি? ব্যস্ত কেন, বোস্।

বাঃ, তোর সঙ্গে যে যেতে হবে বললি!

হ্যাঁ—সে তো রাত এগারটায়। এখন বোস, সন্ধ্যা নাগাদ বের হয়ে যাবি, তারপর রাত ঠিক এগারটায় গিয়ে হাজির হবি ৫নং ফ্ল্যাটে।

কিন্তু—

আমি থাকব। অতএব কিন্তুর কোন প্রয়োজন নেই।

তুই কখন যাবি?

যথাসময়ে।

বলাই বাহুল্য ওভারসিজ লিঙ্কের ফ্ল্যাটে গিয়ে না উঠলে ব্যাপারের গুরুত্বটা সত্যিই বোধ হয় অত শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারতাম না।

আর সেখানে না গেলে অত তাড়াতাড়ি সীতা মৈত্রের পরিচয়টাও পেতাম না।

অথচ সীতা মৈত্রের পরিচয়টা জানা যে আমাদের কতখানি প্রয়োজন ছিল সেটা ীয় বুঝতে পেরেছিলাম।

আর এও বুঝেছিলাম সেবারে কিরীটীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি কতদূর পর্যন্ত দেখতে পায়।

যাক, যা বলছিলাম।

রাত এগারটা বেজে ঠিক সাত মিনিটে গিয়ে ৫নং ফ্ল্যাটে পৌঁছাতেই দরজা খুলে গেল।

কিরীটী পূর্ব হতেই তার কথামত ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিল। সে আহ্বান জানাল, আয়।

ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় যথাসম্ভব বাড়িটার গঠনকৌশল ও প্ল্যান দেখে নিয়েছিলাম।

প্রায় সাত কাঠা জায়গার উপরে বাড়িটা।

ভিতরে একটা চতুষ্কোণ বাঁধানো আঙিনা।

সেই আঙিনার দক্ষিণ দিকে সোজা খাড়া প্রাচীর দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে।

সেই প্রাচীরের ওপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা টিনের শেড দেওয়া মোটর রিপেয়ারিংয়ের কারখানা।

তারপরেই তিনতলা দুটো বাড়ির পাশাপাশি।

ঐ দুটো বাড়ির মধ্য দিয়ে অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা কারখানায় প্রবেশের। সেই বাড়ি দুটো রাস্তার উপর।

রাস্তা থেকে বুঝবারও উপায় নেই যে বাড়িটার দক্ষিণ দিকে অতখানি জায়গা নিয়ে একটা অমন বিরাট গাড়ি মেরামতের কারখানা রয়েছে।

পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে পর পর সব ফ্ল্যাট।

এক-এক তলায় ছটি করে ফ্ল্যাট।

এক-একটি ফ্ল্যাটে তিনখানি করে ঘর, পরে জেনেছিলাম, বাথ ও কিচেন ছাড়া।

তিনদিকেই অর্থাৎ পূব, উত্তর ও পশ্চিমে বারান্দা এবং বারান্দার গায়ে গায়ে ফ্ল্যাটগুলো।

সিঁড়িটা বরাবর পূর্ব-উত্তর কোণ দিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে।

বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের বাঁধানো আঙিনাটা দেখা যায়।

আঙিনার অর্ধেকটায় মোটা ও ভারী ত্রিপল খাটানো। দোতলা ও তিনতলার মত আঙিনার তিন দিকে নীচেও বারান্দা আছে।

নীচের তলায় উত্তর ও পশ্চিম দিকে গোটা চারেক যে ঘর ছিল সে ঘরগুলোও ওভারসিজ লিঙ্কের ভাড়া নেওয়া।

পরে অবিশ্যি জেনেছিলাম সে কথাটা।

অর্থাৎ বাইরে রাস্তা থেকে যে 'ওভারসিজ লিঙ্ক'র অফিস দেখা যায় সেটাই সবটা নয়, ভিতরেও অনেকটা অংশ জুড়ে তাদের কারবার।

৫নং ফ্ল্যাটের ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, আকারে ঘরটা বেশ বড়ই।

একদিকে দুটো খাট পাতা, খাটের উপরে সজ্জা বিছানো।

একধারে একটি টেবিল ও দেওয়াল-আলমারি।

ঘরের মাঝখানে একটা ক্যামবিসের আরামচেয়ারে বসে, সামনে ছোট একটা চতুষ্কোণ টুলের উপরে তাস বিছিয়ে কিরীটী বোধ হয় পেসেন্স খেলছিল।

আমাকে দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় গিয়ে চেয়ারে বসে পেসেন্স খেলার দিকে মন দিল।

দরজা বন্ধ করে দে সুব্রত। মৃদু কণ্ঠে কিরীটী বললে।

দরজাটা খোলাই ছিল, এগিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিলাম।

ঘরের সামনে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেই সামনের বড় ট্রাম রাস্তাটা এদিক থেকে ওদিক বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

বারান্দাটা একবার ঘুরে অন্য ঘর দুটোও একবার দেখে নিলাম।

বাকী দুটো ঘর খালি।

ফিরে এলাম আবার কিরীটী যে ঘরে বসে তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিল সেই ঘরে।

॥ পনেরো ॥

আরও কিছুক্ষণ পরে ঐ রাত্রেই।

কিরীটী কিন্তু তখনও দেখি বসে বসে একমনে পেসেন্স খেলছে। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে এগারটা বাজে।

কি রে, তোর ব্যাপার কি বল্ তো? জিজ্ঞাসা করি কিরীটীকে।

কেন? মাথা না তুলেই জবাব দেয় কিরীটী।

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। এখানে এলি কি পেসেন্স খেলবার জন্যে?

তাস সাজাতে সাজাতে কিরীটী বললে, একেবারে মিথ্যে বলি কি করে, কতকটা তাই বটে।

মানে?

বেশ নিরিবিলি, বসে বসে রাত কাবার করে দিলেও কারও আপত্তির কিছু থাকবে না। তুই যদি দেখতিস ইদানীং কৃষ্ণা কি রকম খিটখিট করে তাস হাতে দেখলেই —সে যাক গে। তোর আপত্তি থাকলে ঘণ্টাখানেক তুই ঘুমিয়ে নিতে পারিস।

ঘুমিয়ে নেব মানে ?

ঘুমোবি! ঘুমের ঘুম ছাড়া অন্য কোন মানে আছে নাকি! যা, শুয়ে পড়্—

আর তুই বুঝি বসে বসে পেসেন্স খেলবি ?

কি করি বল্! পেসেন্স খেললে তবু জেগে থাকতে পারব।

বুঝলাম কিরীটী আপাতত জেগে থাকতেই চায়। তা সে যে কারণেই হোক না কেন।

আমি আর কোন কথা না বলে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তাও নির্জন হয়ে আসছে।

রাস্তায় পথিকের চলাচল কমে এসেছে।

গ্রীষ্মের রাত, নচেৎ এতক্ষণে রাস্তা হয়ত একেবারে নির্জন হয়ে যেত।

হঠাৎ ঐ সময় নজরে পড়ল রাস্তার ওদিকে 'পান্থ পিয়াবাস' রেস্টুরেণ্টটা তখনও খোলা আছে।

ভিতরে এখনও আলো জ্বলছে এবং দরজা এখনও খোলা।

এত রাত্রেও 'পান্থ পিয়াবাসে'র অর্গল খোলা। এখনও কি খরিদ্দারের আশা করে নাকি!

পানের দোকানটা এই ফুটপাতে হওয়ায় বোঝা যায় না এখান থেকে যে ওটা খোলা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মধ্যে মধ্যে ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে, তবে সংখ্যায় অনেক কম।

রিক্সারও টুং-টুং শব্দ শোনা যায়।

রাস্তার দু ধারের সমস্ত দোকানই বন্ধ।

গ্রীষ্মের রাত, রাস্তায় খাটিয়া পেতে সব শোবার ব্যবস্থা করছে।

ঝিরঝির করে বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল।

তাছাড়া দিনের বেলায় ও রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত মানুষের চলাচলে, যানবাহনের ভিড়ে, নানাবিধ শব্দে গমগম-করা সেই রাস্তা যখন নির্জন হয়ে যায় তার দিকে তাকিয়ে থাকতে কেমন যেন একটা নেশা ধরে।

তাই বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এক সময় খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকলাম, কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

টেবিলটার তাস সাজানো রয়েছে কিন্তু কিরীটী ঘরে নেই।

কোথায় গেল কিরীটী ?

পাশের ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘরটা অন্ধকার।

সদর দরজার দিকে তাকালাম, সেটা কিন্তু বন্ধ।

বাথরুমেই হয়ত গিয়েছে মনে করে শয্যায় এসে বসলাম।

কিন্তু পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে আধ ঘণ্টা কেটে গেল, কিরীটীর দেখা নেই।

এতক্ষণ কারও বাথরুমে লাগে নাকি।

শয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় পাশের অন্ধকার ঘরটা থেকে কিরীটী বের হয়ে এল।

কোথায় ছিলি রে ?

ছাতে গিয়েছিলাম।

ছাতে !

হ্যাঁ, দেখছিলাম বাথরুমে যাতায়াত করবার জন্য সুইপারদের যে ঘোরানো লোহার সিঁড়িটা আছে সেই সিঁড়িটা দিয়ে সোজা ছাতে চলে যাওয়া যায়। রাত নটার সময় এসে ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতেই অবশ্য সব জানা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এত রাত্রে ছাতে গিয়েছিলি হঠাৎ ?

উর্বশীর খোঁজে।

উর্বশী !

হ্যাঁ রে—সেদিনকার সেই সিগারেট উর্বশীর খোঁজে।

ছাতে উর্বশীর খোঁজে গিয়েছিলি মানে ?

বোস্, তোকে তাহলে সব বলি।

সাগ্রহে শয্যাটার উপর আবার বসলাম।

কিরীটী বলতে লাগল, ছাতে গেলেই তোর চোখে পড়বে এই বাড়ির পিছনে একটা গ্যারাজ ও মোটর রিপেয়ারিংয়ের কারখানা আছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওটার নাম হচ্ছে লাটুবাবুর গ্যারাজ ও মোটর রিপেয়ারিং শপ। অবিশ্যি খোঁজটা দিয়েছিল নির্মলশিবের লোকই।

নির্মলশিবের লোক ? মানে তুই তাহলে তাকে খোঁজ নিতে বলেছিলি ?

অবশ্যই, যাক্ শোন, কিছু দূরপাল্লার মালবাহী লরির গ্যারাজও ঐ লাটুবাবুর গ্যারাজটা। কলকাতা টু পুরুলিয়া, কলকাতা টু হাজারীবাগ ইত্যাদি প্লাই করে। নির্মলশিবের সেই নিযুক্ত লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। চোখ খুলেই সে সব দেখেছিল। এবং সে-ই আমাকে খবর দেয় উর্বশী সিগারেটের একটা ভ্যানও নাকি ঐ গ্যারাজেই থাকে।

উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটার কথা তাহলে তুই আগে থাকতেই জানতিস।

না।

তবে।

তুই আসার ঘণ্টাখানেক আগে এখানে এসে সে আমাকে ঐ খবরটা দিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় আরও একটা খবর সে দিয়ে গিয়েছে।

কি ?

ঐ ভ্যানটি ছাড়া উর্বশী সিগাটের অন্য কোন ভ্যানের নাকি অস্তিত্বই নেই। যাই হোক, তাই দেখতে গিয়েছিলাম ছাত থেকে উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটা গ্যারাজে ফিরে এসেছে কিনা।

দেখতে পেলি ?

পেয়েছি। কিন্তু আজ রাত অনেক হল, আর না। এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।

সে রাত্রের মত আবার কিরীটী মুখ বন্ধ করল।

॥ ষোল ॥

তারপরের দিন ও রাত কিরীটী ঐ ঘরের মধ্যে স্রেফ চেয়ারে বসে পেসেন্স খেলেই কাটিয়ে দিল।

নির্বিকার নিশ্চিন্ত।

ভাবটা যেন—বিশেষ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল তাই বিশ্রাম নিচ্ছে।

সঙ্গে গোটা কয়েক নভেল এনেছিলাম, আমারও সেগুলো পড়ে সময় কাটতে লাগল।

তার পরের দিনটাও ঐ ভাবেই অতিবাহিত হল।

ক্রমে রাত্রি হল।

কোথায় কিরীটী খাবারের ব্যবস্থা করেছিল জানি না—একটা লোক নিয়মিত চা

ও আহার্য সরবরাহ করে যাচ্ছিল।

সে রাতটাও ঐ ভাবেই কাটাতে হবে তখনও তাই মনে করেই শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।

এবং বোধ করি ঘুমিয়েও পড়েছিলাম এক সময়।

হঠাৎ কিরীটীর হাতের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল।

কি রে? ধড়ফড় করে উঠে বসি।

আয় আমার সঙ্গে--চাপা সতর্ক কণ্ঠে কিরীটী বলে।

কোথায়?

ওদিককার ঘরে।

কৌতূহলে কিরীটীর সঙ্গে গিয়ে সবশেষ ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলাম। ঘরটা অন্ধকার।

দেওয়ালে, দক্ষিণের দেওয়ালে, কান পেতে শোন তো কিছু শুনতে পাস কিনা?

কান পাততেই স্পষ্ট নারীকণ্ঠ কানে এল দেওয়ালের ও-পাশের ঘর থেকে।

পারব না, পারব না--আমি কিছুতেই পারব না।

পুরুষকণ্ঠে জবাব এল, পারতে হবেই তোমাকে।

না।

পারতে হবেই।

না, না— কি তোমার সে করেছে যে তাকে এইভাবে শেষ করতে চাও তুমি?

শেষ আমি করব না সীতা—

চমকে উঠলাম সীতা নামটা শুনে।

পুরুষকণ্ঠ তখনও বলছে, কিন্তু ঐ ইডিয়টটা যখন সব জেনে ফেলেছে একবার তখন ওকে সরে যেতেই হবে। পরশু এই সময় সে আসবে, তুমি তাকে শুধু গাড়িতে তুলে দেবে। তারপর যা করবার আমিই করব।

সত্যিই তাহলে তাকে তুমি প্রাণেই মারা স্থির করেছো?

একটু আগেই তো যা বলবার আমি বলেছি।

কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টই হবে না।

কিন্তু তোমারই বা তার জন্য এত মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথা! না, না—

তাই তো দেখছি। না, পুরনো প্রেমের ঘা-টা বুক থেকে তোমার এখনও শুকোয় নি!

পুরোনো প্রেম ?

তাই তো মনে হচ্ছে, সম্পর্কচ্ছেদ করেও যেন তাকে ভুলতে পারনি আজও !

নারীকণ্ঠের কোনরূপ প্রতিবাদ আর শোনা গেল না।

যাক, আমি চললাম। যা বলে গেলাম ঠিক সেইভাবে যেন পরশু রাত্রে তুমি প্রস্তুত থাক।

একটু পরেই বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল।

ঘরের বাইরে ঠিক সামনের বারান্দা দিয়ে কে যেন চলে গেল।

আমরা দুজনে তখনও অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

নারীকণ্ঠস্বরটি চিনতে না পারলেও নাম শুনেছি— সে সীতা মৈত্র। ওভারসিজ লিঙ্কের সেক্রেটারী দিদিমণি। কিন্তু পুরুষটি কে! কণ্ঠস্বরে চিনতে পারলাম না তাকে।

দুজনে আমাদের পূর্বের ঘরে আবার ফিরে এলাম।

ঘরে ফিরে এসে কিরীটী কিছুক্ষণ পায়চারিই করতে লাগল।

বুঝলাম পায়চারি করতে শুরু করেছে যখন—এখন ঘুমোবে না।

আমারও ঘুম চোখ থেকে পালিয়েছিল ইতিমধ্যে।

কিরীটী পায়চারি করতে লাগল আর আমি চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

এক সময় সহসা পায়চারি থামিয়ে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকাল, সু

কি ?

বর্ধমান গিয়েছিলাম কেন জানিস ?

কেন ?

একসময় মানে চাকরির শেষ দিকে বছর দুই আগে আর্থার হ্যামিলটন বর্ধমান স্টেশনের এ. এস্. এম্. ছিল।

তাই নাকি !

হ্যাঁ। ওর অতীত সম্পর্ক খোঁজ করতে বলেছিলাম পুলিসকে। তারাই আমাকে সংবাদটা দিয়েছিল। দু বছর আগে ওর সার্ভিস রেকর্ড থেকে জানা যায় হ্যামিলটন কাজে ইস্তফা দেয়।

কেন ?

কারণটা অবিশ্যি জানা যায়নি। কিন্তু সীতার সঙ্গে তখন ওর রীতিমত নাকি সখ্যতাই ছিল।

তবে হঠাৎ গোলমালটা বাধল কেন ?

সম্ভবত অতি লোভে।

অতি লোভে!

হ্যাঁ। তাঁতী নষ্ট হয়েছে অতি লোভেই। কিন্তু থাক সে কথা, আপাতত কাল সকালে তোকে একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

লাটুবাবুর গ্যারেজে তোকে একবার যেতে হবে।

লাটুবাবুর গ্যারেজে?

হ্যাঁ।

কেন?

একটা সংবাদ তোকে যেমন করেই হোক যোগাড় করে আনতে হবে। লাটুবাবুর কারখানা ও গ্যারেজের বর্তমান মালিক কে?

বেশ। কিন্তু একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম কিরীটী।

কী?

পার! অবশ্য বুঝতে পেরেছি যে সীতা মৈত্র আমাদের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে।

পুরু। জন্যই কি—

না?

পা এখানে এসে উঠেছিস?

না, এবং সেই সংবাদটা পেয়েই বাজোরিয়াকে যখন সেদিন ফোনে বলেছিলাম বাড়িতে আমাকে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করে দিতে তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি ঘটনাচক্রে ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তার পাশের এই ফ্ল্যাটটাই খালি হয়ে যাবে। অনেক সময় পৃথিবীতে অনেক বিচিত্র যোগাযোগ ঘটে, এ ব্যাপারও ঠিক তাই হয়েছে।

তোর কি ধারণা সোনার চোরাকারবারীদের সঙ্গে ঐ সীতা মৈত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত?

জড়িত কিনা এখনও সঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে—

কি?

সীতা মৈত্রের যৌবন ও রূপ কোনটাই তো অস্বীকার করবার নয়!

অর্থাৎ—

অর্থাৎ এমনও হতে পারে, সীতা মৈত্রের রূপ ও যৌবন দুটোই শাণিত দুটি তরবারির মত মোক্ষম অস্ত্র হয়েছে ওদের হাতে।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল কদিন থেকে। তবে একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না—

কি? কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আর্থার হ্যামিলটনের সঙ্গে সীতা মৈত্রের বর্তমান সম্পর্কটা কি?

কি আবার, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একদা স্ত্রী ও স্বামী ছিল। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

কারণটা কি আমাদের ঘটোৎকচ?

কিরীটী হেসে ওঠে।

বললাম, হাসলি যে?

কারণ তোর অনুমান যদি সত্যিই হয় তো বলব সীতা মৈত্রের রুচি নেই। কিন্তু মা ভৈষী! তা নয় বন্ধু, তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। কিন্তু রাত অনেক হল, একবার একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করলে মন্দ হত না।

কথাটা বলে সত্যি সত্যিই দেখলাম কিরীটী শয়নের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

কিরীটী!

কি?

পাশের ঘরে একটু আগে যারা কথা বলছিল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলাম—সীতা মৈত্র। কিন্তু পুরুষের কণ্ঠস্বরটা কার বুঝতে পারলাম না তো?

কিরীটী ততক্ষণে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে।

একটা হাই তুলতে তুলতে বললে, পিয়ারীলাল।

পিয়ারীলাল। সে আবার কে?

লাহিড়ীবাবুর গ্যারেজের একজন মোটর মেকানিক। কিন্তু তোর ব্যাপার কি বল তো! তোর চোখে কি ঘুম নেই? আমার কিন্তু ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী পাশ ফিরে শুল।

কিন্তু আমার চোখে সত্যিই তখন ঘুম ছিল না।

কয়েকটা মুখ আমার মনের পাতায় পর পর ভেসে উঠতে লাগল একের পর এক। ঘটোৎকচ, সীতা মৈত্র, চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল, ভিখারী সাহেব এবং আর্থার হ্যামিলটন। ঐ মুখগুলোর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতে যেন আর একখানি মুখ ভাববার চেষ্টা করতে লাগলাম, যাকে ইতিপূর্বে আমি না দেখলেও কিরীটী নিশ্চয়ই দেখেছে, নচেৎ ও জানল কি করে যে, নাম তার পিয়ারীলাল?

লাটুবাবুর কারখানার একজন মোটর মেকানিক—পিয়ারীলাল !

তা হোক, কিন্তু তার সঙ্গে সীতা মৈত্রের কি সম্পর্ক ?

আর ঘনিষ্ঠ ভাই বা লোকটার সঙ্গে তার কোন সূত্রে ?

এবং কে-ই বা সেই নিরীহ ইডিয়ট প্রকৃতির লোকটা যার প্রতি এখনও সীতা মৈত্রের পুরনো প্রেম বুকের মধ্যে জমানো রয়েছে, যে প্রেমের জন্য মোটর মেকানিক পিয়ারীলালের বুকে ঈর্ষাটা টনটনিয়ে উঠে রক্তনখর বিস্তার করেছে !

অন্ধকার ঘরে শুয়ে পিয়ারীলাল আর সীতা মৈত্রের কথাই ভাবছিলাম।

পিয়ারীলালের কণ্ঠস্বরে সেই ঈর্ষার সুরটুকু আমার কানকে এড়িয়ে যায়নি।

কেবলমাত্র ইডিয়ট ও সব জেনে ফেলেছে বলেই নয়, সীতা মৈত্রের বুকের মধ্যে আজও তার জন্য ভালবাসা রয়েছে বলেই এ দুনিয়া থেকে সরে যেতে হবে আজ তাকে, পিয়ারীলাল তাই চায়।

আর যেতে তো হবেই। এই যে চিরাচরিত নীতি।

এক আয়েষার ভাগ্যা পাশে তো দুটি চন্দ্র থাকতে পারে না—ওসমান ও বীরেন্দ্রসিংহ !

ইডিয়ট ও মোটর মেকানিক পিয়ারীলাল।

কিন্তু কে ঐ ইডিয়ট ?

আর সত্যিই যদি সে ইডিয়ট হত সীতা মৈত্রের মত মেয়ের সেই ইডিয়টটার উপর দুর্বলতা থাকে কি করে ?

পিয়ারীলাল এক কথার মানুষ, সে তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা গিয়েছে।

ইডিয়টটার আজ প্রাণসংশয় হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে। তাকে আজ এ দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবেই।

শুধু স্বর্ণসন্ধানীদের রহস্য কিছুটা জেনে ফেলেছে বলেই নয়, পিয়ারীলালের প্রতিদ্বন্দ্বী আজ সে।

হায় রে বিচিত্র মানুষের মন, ভালবেসেও মুক্তি নেই, ভালবাসা পেয়েও মুক্তি নেই।

পঞ্চশরের দু'মুখো শর।

কিন্তু ইডিয়ট—ইডিয়টটা কে ? তবে কি—

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতই যেন নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাও মনের পাতায় ভেসে উঠল : আর্থার হ্যামিলটন।

আর্থার হ্যামিলটনকে সীতা মৈত্র তাহলে আজও ভুলতে পারেনি।

॥ সতের ॥

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ কিরীটীর পূবরাত্রের নির্দেশমত ঘর থেকে বের হলাম লাটুবাবুর গ্যারাজ ও ওয়ার্কশপের বর্তমান মালিকের অনুসন্ধানে।

আর মনের পাতায় যে অদেখা মানুষটার মুখটাকে তখনও কোন একটা পরিচিতের আকার দেবার চেষ্টা করছিলাম, সেই মোটর-মেকানিক পিয়ারীলালের যদি সন্ধান পাই, দেখা পাই—সেই কথাট ভাবতে ভাবতেই গেলাম।

তিনতলা ও চারতলা দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়েই বলতে গেলে প্রায় গ্যারাজ ও ওয়ার্কশপে প্রবেশের কাঁচা অপ্রশস্ত রাস্তাটা।

বড় লরি বা বাস সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে বটে তবে একটু অসাবধান হলেই দেওয়ালে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা।

ঢোকার মুখেই একটা হিন্দুস্থানীদের মিঠাইয়ের দোকান—'লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'।

একটা ভুষো কালির মত কালো কুচ্‌কুচে রঙ বিরাট ভুঁড়িওয়ালা লোক খালি গায়ে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে বিরাট উনুনের ধারে বসে বিরাট একটা কড়াই গরম জিলাপি ভাজছে।

সদ্যভাজা জিলাপির গন্ধটা কিন্তু বেশ লাগে। মধ্যে

এগিয়ে চললাম ভিতরের দিকে।

অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট টিনের শেডের তলায় গ্যারাজ ও ও

সবটা জায়গাই অবিশ্যি টিনের শেড দেওয়া নয়, উন্মুক্ত জায়গাও অনেকটা র

বিশেষ কোন লোকজন সামনাসামনি চোখে পড়ল না।

কেবল দেখলাম একটা রোগা ডিগডিগে লম্বা শিখ দাঁতনের একটা কাঠি দাঁতন করছে আর অদূরের কলতলায় কে একটা লোক সাবান দিয়ে মাথা ঘষছে।

এদিক ওদিক আট-দশটা ট্রাক, বাস ও ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে উন্মুক্ত জায়গাটায়।

টিনের শেডটার মধ্যেও উঁকি দিলাম।

সেখানেও বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার অনেকগুলোই আছে।

বাতাসে একটা মোবিল ও পেট্রোলের গন্ধ।

এ গেঁড়াইয়া, গাল শুন!

কে যেন কাকে সম্বোধন করল।

কে কাকে সম্বোধন করল জানবার জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছি হঠাৎ গ্যারাজের

মধ্যে একটা পার্টিশনের ভিতর থেকে বের হয়ে এল ঘটোৎকচ, পরিধানে স্ট্রাইপ-দেওয়া ময়লা পায়জামা, গায়ে একটা গেঞ্জি, সদ্য সদ্য বোধ হয় ঘুম ভেঙে।

একেই প্রথম দিন ওভারসিজ লিঙ্কের সেক্রেটারী দিদিমণির অফিস-ঘরে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম।

ঘটোৎকচও পার্টিশান থেকে বের হয়েই আমাকে সামনে দেখে বুঝি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়।

রোমশ জোড়া ভ্রূ-দুটো যেন একটু কুঞ্চিত হয়েই পরক্ষণে আবার সরল হয়ে আসে।

কাকে চান?

ঘটোৎকচ প্রশ্ন করে আমাকে।

মুহূর্ত না ভেবেই জবাব দিলাম, মিঃ পিয়ারীলালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভ্রূ-যুগল আবার মুহূর্তের জন্য কুঞ্চিত হল, এবং আবার সরল হল।

ধূর্ত শিয়ালের মত চোখের দৃষ্টিটা এক লহমার জন্য বোধ হয় আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল একবার।

কেন, পিয়ারীলালকে দিয়ে কি হবে?

দরকার ছিল আমার একটু—

আমিই পিয়ারীলাল।

আপনি পিয়ারীলাল? নমস্কার। আপনিই মোটর-মেকানিক পিয়ারীলাল?

না।

ঐ সময়ে টিনের শেডের মধ্যে পূব কোণে নজর পড়ল, উর্বশী সিগারেটের দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাঁদিকে যেন নজরই পড়েনি এমনিভাবে ঘটোৎকচের মুখের দিকে আবার বললাম, আপনিই কি এই গ্যারাজ-ওয়ার্কশপের মালিক?

ঐ সময় একটা ছোকরা এসে পিয়ারীলালের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, চা দেব?

হুঁ, ধরে দে।

ছোকরাটা চলে গেল।

অ্যাঁ, কি বলছিলেন, মালিক! তা বলতে পারেন বৈকি, আমি—আমি ছাড়া আর মালিক কে? কিন্তু কি দরকার আপনার এই গ্যারাজের মালিক কে জেনে?

কথাটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি মিঃ পিয়ারীলাল। আমার একটা বড় করে বেশ গ্যারাজ ও মোটর রিপেয়ারিং শপ খুলবার ইচ্ছা আছে। উল্টাডাঙার ওদিকে একটা জায়গাও লিজ নিয়েছি।

কথাটা বলায় দেখলাম কাজ হল।

পিয়ারীলালের ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে আবার সরল হল।

আবার একবার যেন নতুন করে পিয়ারীলাল আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

আবার বললাম, তাই বড় বড় মোটর রিপেয়ারিং শপগুলো আমি ঘুরে ঘুরে যথাসম্ভব দশ দিক জানবার চেষ্টা করছি। আপনারা তো অভিজ্ঞ লোক, আপনাদের পরামর্শ মূল্যবান।

তা কি রকম ক্যাপিটাল নিয়ে নামছেন?

খুব বেশী নয়, হাজার পঞ্চাশ ষাট। রিপেয়ারিং তো হবেই আমার কারখানায়, সঙ্গে বডি বিলডিং, ছোটখাটো একটা লেদ মেশিন আর স্প্রে পেনটিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। আপনি কি বলেন, সেটাই বিবেচনার কাজ হবে না কি? তবে যাই করি, ভাল এক-আধজন মেকানিক না হলে তো আর কারখানা চালানো যাবে না। আচ্ছা সে রকম ভাল কোন মেকানিক আপনার খোঁজে আছে মিঃ পিয়ারীলাল?

না।

হঠাৎ পিয়ারীলালের কণ্ঠস্বরে যেন আমার কেমন খটকা লাগল।

নিজের অজ্ঞাতেই চমকে ওর মুখের দিকে তাকাই।

এখানে কোন সুবিধা হবে না। আপনি রাস্তা দেখুন—

কথাটা বলে পিয়ারীলাল আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, সটান পার্টিশনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

॥ আঠার ॥

বলাই বাহুল্য আমিও আর অতঃপর সেখানে দাঁড়াই না।

অবিলম্বে স্থানত্যাগ করাই সমীচীন মনে হওয়ায় আমিও গ্যারাজ থেকে সোজা বের হয়ে এলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটে গেলাম না।

বড় রাস্তা পার হয়ে সোজা দক্ষিণমুখে হাঁটতে শুরু করলাম।

কিন্তু কিছুদূর হাঁটবার পরই মনটা কেমন সন্দিগ্ধ হওয়ায় পিছন ফিরে তাকালাম, কেউ অনুসরণ করছে না তো!

পশ্চাতে যারা ছিল তাদের মধ্যে তেলকালি-মাখা একটা নীল রঙের হাফ প্যান্ট

ও হাওয়াই শার্ট পরিধানে রোগা লোককে দেখতে পেলাম।

সেই লোকটার সঙ্গে আমার ব্যবধান মাত্র হাত দশেক।

কেন যেন মনে হল, লোকটা আমারই পিছু পিছু আসছে।

যাই হোক, আবার সামনের দিকেই চলতে শুরু করলাম।

কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ জেগেছে, আবার কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকালাম।

ঠিক সেই ব্যবধানেই পূর্বের লোকটিকে পশ্চাতে দেখতে পেলাম।

অতঃপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলাম।

লক্ষ্য করলাম, লোকটিও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আবার চলা শুরু করতেই সেও দেখি চলতে শুরু করেছে।

আর কোন সন্দেহ রইল না।

বুঝলাম লোকটা সত্যিই আমাকে অনুসরণ করছে।

মনে মনে হেসে একটা ট্যাক্সির সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

অতঃপর প্রায় ঘণ্টা দুই এদিক ওদিক ঘুরে পূর্বোক্ত ফ্ল্যাটে যখন ফিরে এলাম বেলা তখন প্রায় সোয়া এগারটা।

এসে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ।

সঙ্গে ডুপলিকেট ইয়েল লকের চাবি ছিল, চাবি দিয়ে ঘর খুলে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

কিরীটী তখন ঘরে নেই, কোথাও বের হয়েছে নিশ্চয়ই।

ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে চেয়ারটার উপর গা ঢেলে দিলাম।

এবং এতক্ষণে যেন নিরিবিলিতে একাকী সকাল বেলাকার ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত মনে মনে ভাববার অবকাশ পেলাম।

কিরীটী কেন আমাকে পাঠিয়েছিল লাটুবাবুর গ্যারেজের আসল মালিকের অনুসন্ধান করতে।

আসল মালিকের নামটার কি সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল কিরীটীর।

তবে কি কিরীটীর সেই শেষ ও আসল ঘাঁটিটিই ঐ লাটুবাবুর গ্যারেজটা!

কিন্তু কথাটা যেন মন কিছুতেই মেনে নেয় না।

তাছাড়া ঐ ঘটোৎকচ।

সেরাত্রে সীতা মৈত্রের ঘরে যে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম সে ঘটোৎকচের গলা নয়।

অথচ ঘটোৎকচ বললে তারই নাম পিয়ারীলাল।

মিথ্যা বলেছে বলে মনে হয় না।

লোকটাকে আর একটু বাজিয়ে দেখতে পারলে হত।

আরও একটা কথা।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘটোৎকচের গলার স্বর যখন বদলে গেল তখন বোঝাই যাচ্চে আমাকে সে সন্দেহ করেছে বা সন্দেহের চোখে দেখেছে।

কিন্তু হঠাৎ আমার প্রতি তার মনে সন্দেহই বা জাগল কেন? আর কি করেই বা জাগল?

একদিন মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ওভারসিজ লিঙ্কের সেক্রেটারী দিদিমণি সীতা মৈত্রের ঘরে সে আমাকে দেখেছে।

তাও ঐ সময় সে আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, আমার দিকে নিশ্চয়ই ভাল করে নজর দেবারও তার অবকাশ হয়নি।

ঐটুকু সময়ের জন্য দেখেই সে আমাকে চিনে রেখেছে, নিশ্চয়ই তা সম্ভব নয়।

আর চিনেই যদি থাকে তো প্রথম থেকেই বা সেটা প্রকাশ করেনি কেন তার কথায়বার্তায় ও ব্যবহারে!

কিরীটীর ধারণা গতরাত্রে সীতা মৈত্রের ঘরে ঐ ঘটোৎকচ বা পিয়ারীলালই এসেছিল।

সীতা মৈত্রের সঙ্গে ঘটোৎকচের একটা সম্পর্ক আছে।

কিন্তু সে সম্পর্কটা কতখানি?

ঘটোৎকচের সঙ্গে সীতা মৈত্রের সম্পর্কের কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে কখন যে সীতা মৈত্রই মনটা জুড়ে বসেছে, বুঝতে পারিনি।

কিরীটী মিথ্যা বলেনি, সত্যিই মেয়েটির অদ্ভুত যেন একটা আকর্ষণ আছে।

এমন এক-একখানি মুখ আছে যা একবার চোখে পড়লে মনের মধ্যে এমন ভাবে একটা দাগ কেটে বসে যা কখনও বুঝি মুছে যায় না।

সীতা মৈত্রের মুখখানি তেমনি করেই যেন মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল।

বার বার কেবলই একটা কথা ঘুরেফিরে মনে হচ্ছিল, সীতা মৈত্র যেন ওদের দলের নয়।

ওদের দলে সীতা মৈত্র একান্তভাবেই বেমানান যেন।

সত্যি দুর্ভাগ্য আর্থার হ্যামিলটনের, সীতা মৈত্রের মত স্ত্রী পেয়েও আজ সে ছন্নছাড়া, এক পাপচক্রের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে!

সীতা মৈত্রের মত স্ত্রী পেয়েও আজ তার ঘর নেই কেন ?

জীবনে কেন শান্তি নেই ?

কেন তাকে মদ খেয়ে নিজেকে ভোলবার চেষ্টা করতে হয় ?

আর কেনই বা তাকে সেই নেশার খরচ যোগাবার জন্য আজ অন্যের কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পাততে হয় ?

রাজার ঐশ্বর্য পেয়েও আজ কেন সে ভিক্ষুকেরও অধম ?

যে ভালবাসা দিয়ে একদিন সে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করতে পারত আজ সেই ভালবাসা কেন তাকে পেয়েও অমন করে হারাতে হল ?

আর কেনই বা সে অমন ভাল চাকরিটা ছেড়ে দিল ?

সীতা মৈত্রের কথা ভাবতে ভাবতে কখন একসময় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিরীটীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

কি রে সুব্রত, ঘুমে যে একেবারে কুম্ভকর্ণকেও হার মানালি !

কখন এলি ?

এই তো ফিরছি। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো ? কাল রাত্রে ঘুম হয়নি নাকি ?

সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কোথায় গিয়েছিলি ?

বিশেষ কোথাও না। তারপর, পিয়ারীলালের সঙ্গে আলাপ হল ?

হল আর কই—

কেন ?

তাড়িয়ে দিল যে আলাপটা ঠিক জমে ওঠবার মুখেই।

কি রকম ?

সংক্ষেপে সকালবেলার ঘটনাটা খুলে বললাম।

সব শুনে কিরীটী শুধু বললে, হুঁ।

কিন্তু আমাকে সন্দেহ করল কি করে তাই ভাবছি !

কিরীটী কিন্তু আমার কথার ধার দিয়েও গেল না।

সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে।

বললে, একটা জরুরী কাজ একদম ভুলে এসেছি সুব্রত। সে কাজটা এখুনি একবার বের হয়ে গিয়ে তোকে সেরে আসতে হবে।

কি কাজ ?

রমেশ মিত্র রোডে আমার বন্ধু সন্তোষ রায় থাকে, সেখানে গিয়ে ফোন করে কৃষ্ণাকে একটা কথা বলবি—

বল্‌।

কাল রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে হীরা সিং যেন আমার পাশের বাড়িতেই যে অ্যাডভোকেট সুহাস চৌধুরী থাকেন তাঁর গাড়িটা নিয়ে যোধপুর ক্লাবের মাঠের কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। কৃষ্ণা গিয়ে যেন সুহাসবাবুকে আমার কথা বলে গাড়িটা তাঁর চেয়ে নেয়। যা, আর দেরি করিস না। আজ শনিবার, হাইকোর্ট বন্ধ বটে, তবে বেলা একটার মধ্যেই সুহাসবাবু মাছ ধরতে একবার বের হয়ে গেলে আর তাঁর গাড়িটা পাওয়া যাবে না। গাড়িটা ভাল, rough রাস্তায় dependable।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়লাম।

॥ উনিশ ॥

ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখি চেয়ারটার উপরে নিশ্চিন্ত আরামে গা ঢেলে দিয়ে কিরীটী ঘুমোচ্ছে।

ইতিমধ্যে ভৃত্য টিফিন-ক্যারিয়ার করে টেবিলের উপরে আহার্য রেখে গিয়েছিল।

হাতঘড়িতে দেখলাম বেলা তখন সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে। ক্ষুধায় পেটে যেন পাক দিচ্ছিল।

বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে কিরীটীকে ডেকে তুললাম।

খাবি না?

কিরীটী উঠে বসে আলস্যের একটা হাই তুলতে তুলতে বললে, আচ্ছা সুব্রত, বেদব্যাস-রচিত মহাভারত তো পড়েছিস তুই নিশ্চয়ই?

প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে বললাম, একদা বাল্যকালে।

সে যুগের অর্জুনের মত এ যুগের সুভদ্রাটিকে নিয়ে পালা না কেন তুই?

বলতে বলতে উঠে এসে খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে বসল কিরীটী।

হাসতে হাসতে বললাম, তা মন্দ বলিসনি, কিন্তু মুশকিল আছে যে একটা।

একটা মাছের ফ্রাই প্লেট থেকে তুলে নিয়ে বড় রকমের একটা কামড় দিয়ে আয়েস করে চিবুতে চিবুতে কিরীটী ভ্রূ কুঁচকে নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, কেন?

বললাম, সে যুগের হলধারী বলরাম যে এ যুগে রেঞ্চ হাতে ঘটোৎকচ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

দুর, দুর—ওটা একটা একের নম্বরের গবেট। ওকে তো কাবু করতে দুমিনিট সময়ও লাগে না। ওসব নিয়ে মন খারাপ করিস না, বুঝলি? বলে আর একটা ফ্রাই তুলে নিয়ে আরাম করে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বললে, বুঝলি, বাবা বিশ্বনাথ বলে ঝুলে পড়।

ঝুলে পড়ব?

হুঁ। দিবারাত্রি ঐ শ্রীমুখপঙ্কজখানি চিন্তা করার চাইতে ঝুলে পড়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

দরজার গায়ে ঐ সময় মৃদু তিনটি নক পড়ল।

দরজাটা খুলে দে, আমাদের 'কি আশ্চর্য' নির্মলশিব এলেন।

সত্যি। নির্মলশিববাবুই।

কি আশ্চর্য! আপনার কথা শেষ পর্যন্ত একেবারে সেণ্ট পারসেণ্ট মিলে গেল মিঃ রায়।

একটা মাঝারি সাইজের প্যাকেট হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নির্মলশিব বললে।

আসুন নির্মলশিববাবু, বেশ গরম গরম ফ্রাই আছে, খাবেন নাকি? কিরীটী ফ্রাই-সমেত টিফিন-ক্যারিয়ারের বাটিটা নির্মলশিবের দিকে এগিয়ে দিল।

হঠাৎ তার অত্যধিক উৎসাহ ও উত্তেজনার মুখে কিরীটীর ঐ রকম নিরাসক্ত ভাবে ফ্রাইয়ের বাটি এগিয়ে দেওয়ায় ভদ্রলোক যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে যায়।

হাতের প্যাকেটটা হাতেই থাকে, কেমন যেন বোকার মতই প্রশ্ন করে! বলে ফ্রাই!

হাঁ, অতি উপাদেয় ভেটকি মাছের ফ্রাই। খেয়েই দেখুন না।

বলতে বলতে কিরীটী নিজেই আর একটা ফ্রাই বাটি থেকে তুলে নিল।

কিন্তু মিঃ রায়—

কি বলুন? বামাল তো পেয়েছেন আর কেমন করে পাচার হয় তারও হদিস পেয়েছেন।

তা—তা—পেয়েছি বটে, তবে—

কারবারীদের সন্ধান পাননি এই তো? মা ভৈষী—যজ্ঞের যখন সন্ধান পেয়েছেন হোতার সন্ধান পাবেন বৈকি!

কিন্তু বামালেরই বা সন্ধান পেলাম কোথায়?

পাননি!

কই, সবই তো উর্বশী সিগারেটের প্যাকেট। বলতে বলতে হাতের প্যাকেটটা

সামনের টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে নির্মলশিব হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল সত্যি সত্যিই, দেখুন না উর্বশী সিগারেট।

প্যাকেটটা সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় টেবিল থেকে তুলে নিয়েছিলাম।

সত্যিই উর্বশী সিগারেটের লেবেল আঁটা একটা মাঝারি আকারের সাধারণ প্যাকিং পেপারে প্যাক-করা প্যাকেট।

আমি প্যাকেটটা খুলতে শুরু করেছি ততক্ষণে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, আপনি মশাই অত্যন্ত অবিশ্বাসী। বিশ্বাস না থাকলে কি কৃষ্ণ মেলে! ঐ দেখুন সুব্রতকে, জহুরী ঠিক জহর চিনেছে, ইতিমধ্যেই প্যাকেটটা খুলতে শুরু করেছে—

উপর থেকে সাধারণ সিগারেটের প্যাকেট মনে হলেও—যত্ন নিয়ে প্যাকেটটা বাঁধা হয়েছে।

এবং প্যাকেটটা খুলতেই চোখের সামনে বের হল আমাদের পর পর সাজানো যত্ন করে সব ছোট ছোট সিগারেটের প্যাকেট।

আমি প্যাকেটগুলো সব এক এক করে টেবিলের উপরে নামালাম সবই। সিগারেটের প্যাকেট, মধ্যে তার অন্য কিছু নেই।

সিগারেটের প্যাকেটগুলো দেখে নির্মলশিবের মুখে তো হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছিলই, আমারও মুখে বোধ হয় কিছুটা প্রকাশ পেয়েছিল।

কিরীটী কিন্তু নির্বিকার।

মৃদু হেসে বললে, কি পরশপাথর মিলল না ?

এবং কথাটা বলতে বলতেই সহসা হাত বাড়িয়ে একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে সেটা খুলে ফেলল।

খোলা প্যাকেটের সমস্ত সিগারেট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিরীটী পরমুহূর্তেই আর একটা প্যাকেট তুলে নিল। সেটা খুলতেও সিগারেট দেখা গেল সবই।

তবু কিন্তু নিরতিশয় উৎসাহের সঙ্গে একটার পর একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে কিরীটী খুলে যেতে লাগল।

কিন্তু সিগারেট—শুধু সিগারেট।

ততক্ষণে কিরীটীরও মুখের হাসি বুঝি মুছে গিয়েছিল।

সে যেন পাগলের মতই সিগারেটের প্যাকেটগুলো একটার পর একটা খুলতে থাকে।

সিগারেটগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আমি আর নির্মলশিব নির্বাক।

কিরীটীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে একটা চাপা উত্তেজনায়।

কঠিন ঋজু চাপা কণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বললে, না, ভুল হতে পারে না। কিছুতেই না—বলতে বলতে হাতে যে প্যাকেটটা তখন তার ছিল সেটা খুলতেই চকচকে একটা লম্বা চাবির মত কি বের হয়ে পড়ল। সাইজে সেটা দু ইঞ্চি প্রায় লম্বা হবে।

পেয়েছি, এই যে পেয়েছি! ভুল হতে পারে? ভুল হয়নি আমার—এই যে দেখুন—

উত্তেজনায় ততক্ষণে আমি ও নির্মলশিববাবু কিরীটীর হাতের দিকে ঝুঁকে পড়েছি।

কি আশ্চর্য! এ যে সত্যি সত্যিই—

নির্মলশিবের অর্ধসমাপ্ত কথাটা কিরীটীই শেষ করল, হ্যাঁ, সোনার চাবি। ওজনে অন্তত তিন থেকে চার ভরি তো হবেই।

কি আশ্চর্য! দেখি, দেখি, মিঃ রায়, দেখি—সোনার চাবিটা সাগ্রহে কৌতূহলে হাতে তুলে নিল নির্মলশিববাবু।

কিরীটী কথা বললে আবার, আজকের প্লেনে কতগুলো বাক্স যাচ্ছিল নির্মলশিববাবু?

দশটা বাক্স।

দশটা বাক্স! এক-একটা বাক্সে কতগুলো করে প্যাকেট রয়েছে নিশ্চয়ই গুনে দেখেছেন?

দেখেছি বইকি, কুড়িটা করে প্যাকেট।

কুড়িটা! তাহলে কুড়ি ইনটু দশ, দুশো প্যাকেট, অর্থাৎ তাহলে হল দুশো ইনটু চার অর্থাৎ আটশো ভরি সোনা আজ পাচার হচ্ছিল এ দেশ থেকে।

কি আশ্চর্য! বলেন কি! তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে মানে! বাক্সগুলো ছেড়ে দিয়েছেন নাকি? কিরীটী শুধাল।

তা—তা দিয়েছি—কেমন করে জানব বলুন মশাই যে সিগারেট চালান যাচ্ছে, তার মধ্যে সত্যি সত্যিই সোনা রয়েছে?

কিন্তু আমি তো আপনাকে সেই জন্যই—অর্থাৎ মালগুলো আটক করবার জন্যেই পাঠিয়েছিলাম।

কি আশ্চর্য! তা তো পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু—

ঠিক আছে। আপনি এখুনি গিয়ে কাবুল কাস্টমসে একটা ওয়ারলেস মেসেজ পাঠিয়ে দিন মালগুলো সেখানে আটক করবার জন্যে।

কি আশ্চর্য ! তা আর বলতে ! এখুনি আমি যাচ্ছি—

এক প্রকার যেন ছুটেই নির্মলশিব ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী আর একটা ফ্রাই বাটি থেকে তুলে কামড় দিতে দিতে বললে, নাঃ, ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে !

॥ কুড়ি ॥

ঘণ্টা দেড়েক বাদেই আবার নির্মলশিব হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল আমাদের ফ্ল্যাটে।

কি হল, দিয়েছেন মেসেজ পাঠিয়ে ?

হ্যাঁ, প্লেন এতক্ষণে বোধ হয় পৌছল কাবুল পোর্টে। কিন্তু কি আশ্চর্য ! সত্যি সত্যিই সুব্রতবাবু, যাকে বলে তাজ্জব বনে গিয়েছি ! অ্যাঁ—সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে সোনা ! এ যে রূপকথাকেও হার মানাল !

সত্যি, রূপকথার চাইতেও যে সময় সময় বিস্ময়কর কিছু ঘটে নির্মলশিববাবু।

কিন্তু তা যেন হল, এই উর্বশী সিগারেটের ব্যাপারটা আপনাকে সন্ধান দিল কে মিঃ রায় ?

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, কে আবার দেবে। ভগবান যে দু'জোড়া চক্ষু ক' আঙ্গ ওপরে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন সেই চক্ষুজোড়াই সন্ধান দিয়েছে। তা —আপনাকে আর একটা যে কাজের ভার দিয়ে দিয়েছিলাম সেটার কতদূর করলেন?

কিসের ? সেই হরগোবিন্দবাবুর কুকুর দুটোর কথা তো ?

হ্যাঁ।

বললেন, তিনি কুকুর নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন ঠিক সময়ে কথা দিয়েছেন।

ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে ঠিক যে জায়গায় থাকতে বলেছি সেইখানে সশস্ত্র একেবারে হাজির থাকবেন কাল রাত্রে যথাসময়ে।

কি আশ্চর্য ! থাকব বৈকি।

তাহলে এবারে আসতে আজ্ঞা হোক।

কি আশ্চর্য ! উঠতে বলছেন তাহলে ?

হ্যাঁ।

বেশ, বেশ ! কি আশ্চর্য ! তাহলে আমি চলি, কি বলেন ?

হ্যাঁ।

নির্মলশিববাবু বিদায় নেবার পর কিরীটী বললে, সুব্রত, ঘরটা একটু পরিষ্কার করে রাখ্।

কেন, কি ব্যাপার ?

বলা তো যায় না হঠাৎ ধর্ তোরই খোঁজে কোন ভদ্রমহিলার যদি এ ঘরে এই সময়ে আবির্ভাব ঘটে তিনি কি ভাববেন বল্ তো ? ভাববেন হয়ত আমরা বুঝি কেবল দক্ষিণ হস্তের একটি ব্যাপারের সঙ্গেই পরিচিত। সেটা কি খুব শোভন হবে ?

তা যেন বুঝলাম, কিন্তু আসছেন কে ?

কে বলতে পারে—হয়ত চিত্রাঙ্গদা, নয়ত রাজনটী বসন্তসেনা, কিংবা স্বয়ং উর্বশীই এই ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে আবির্ভূতা হতে পারেন।

হেঁয়ালি রাখ্। কথাটা খুলে বল্।

আমিই কি সঠিক জানি নাকি যে হেঁয়ালী ছেড়ে সঠিক বলব ? সবটাই তো আমার অনুমান।

কিন্তু কিরীটীর অনুমান সে রাত্রে মিথ্যেই হল।

অথচ সে রাত্রে প্রতিটি মুহূর্ত যে কার অপেক্ষাতে কিরীটী অসীম আগ্রহে কাটিয়েছে একমাত্র তা আমিই জানি।

এবং শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হল কিরীটী শয্যায় গেল না।

সেই কাটিয়ে দিল রাতটা।

দেখের দিনও সারাটা দিন কিরীটী ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল।

কোথাও বের হল না।

কেবল চেয়ারটার উপরে চোখ বুজে বসে রইল।

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম তার কান দুটো খাড়া হয়ে আছে।

এবং সে কারও আসারই প্রতীক্ষা করছে।

অবশেষে একসময় ক্রমশ বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা এল।

এবং ক্রমশ যতই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে চলল কিরীটী একটা চাপা উত্তেজনায় যেন অস্থির হয়ে উঠতে লাগল।

এবং ব্যাপারটা যে আদৌ হেঁয়ালী নয় সেটাই যেন ক্রমশ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

কিরীটী সত্যি সত্যিই কারও আগমন প্রতীক্ষায় ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্থির, অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে গতকালের মতই।

কিন্তু কে ?

কার আগমন প্রতীক্ষা করছে কিরীটী ?

কার আগমন প্রতীক্ষায় কিরীটী এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে ?

এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ?

ইতিমধ্যে কিরীটী চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি শুরু করেছিল।

আমি নির্বাক চেয়ারে বসে আর কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে।

পায়চারি করছে দেখছি সে সমানে সেই বেলা তিনটে থেকে।

মধ্যে মধ্যে অস্থির ভাবে নিজের মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ একটানা কয়েক ঘণ্টার প্রতীক্ষার বুঝি অবসান হল রাত্রি সাড়ে নটায়।

ঘরের বন্ধ দরজায় অত্যন্ত মৃদু নক্ পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কিরীটী গিয়ে দরজা খুলে দিল।

আসুন—আপনার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম আপনি আসবেন। ও কি! বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরের ভিতরে আসুন—

ঘরে এসে ঢুকল সীতা মৈত্র।

আমিও দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

কিরীটী দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বসুন।

সীতা মৈত্র কিন্তু বসল না।

হাতের হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, আপনিই তাহলে এই চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন?

চিঠির নীচে তো আমার নামস্বাক্ষরই তার প্রমাণ দিচ্ছে সীতা দেবী।

কিন্তু আমি আপনার চিঠির কোন অর্থই তো বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়।

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, পেরেছেন বৈকি।

পেরেছি?

হ্যাঁ। পেরেছেন। নচেৎ আমার কাছে চিঠি পড়েই ছুটে আসতেন না।

কিন্তু—

বসুন ঐ চেয়ারটায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।

বিশ্বাস করুন আপনি, আপনার এই চিঠির অর্থটা জানবার জন্যেই আমি এসেছি।

সত্যিই কি এখনও আপনি বলতে চান সীতা দেবী, চিঠির অর্থ আপনি বোঝেননি? সত্যিই কি আপনি বলতে চান আপনার নিজের বর্তমান অবস্থার

গুরুত্বটা আপনি এখনও বুঝতে পারেননি ?

আমার বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব।

হ্যাঁ, মৃত্যু আপনার সামনে আজ এসে ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছে।

মৃত্যু কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চমকে তাকায় সীতা কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী নির্মম কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনি জানেন না এখনও কিন্তু আমি জানি সীতা দেবী, যে দলের সঙ্গে আজ আপনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক ভিড়েছেন তাদের আসল ব্যাপারটা কি! ওভারসিজ লিঙ্কের আসল ও সত্যিকার ব্যবসাটা কি জানেন কি ?

জানি বৈকি, কেমিক্যালস, চা, সিগারেট।

জোর গলাতেই কথাগুলো সীতা মৈত্র বলবার চেষ্টা করলেও যেন মনে হল গলাটা তার শুকিয়ে উঠেছে।

দু চোখে শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি।

কিন্তু ওগুলো তো বাহ্য। আসলে যে মৃগয়া ওদের চলেছে সেটা কি জানেন ?

কী ?

কাটোরাই সোনা চালান দেওয়া।

সোনা ?

ছোট একটা ঢোঁক গিলে যেন প্রশ্নটা করল সীতা।

হ্যাঁ, চোরাই সোনা। যে সোনা এদেশ থেকে নানা ভাবে চুরি করে, গালিয়ে, ছোট ছোট চাবির আকারে উর্বশী সিগারেটের প্যাকেটে ভরে বিদেশে চালান দিচ্ছে আপনাদের ওভাসিজ লিঙ্কের কর্তারা।

না, না---কি বলছেন আপনি ?

ঠিকই বলছি।

কিরীটীবাবু, আমি—সত্যিই একেবারে কিছুই জানি না।

এতক্ষণে সত্যি সত্যিই সীতা মৈত্র যেন ভেঙে পড়ল।

॥ একুশ ॥

আপনি জানেন না যে তা আমি জানি, কিরীটী বলে, কিন্তু আর্থার হ্যামিলটন জানে।

আর্থার ? না না—সে অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী লোক। তাকে আপনারা জানেন না, কিন্তু আমি জানি। সে এসবের মধ্যে সত্যিই নেই, বিশ্বাস করুন।

আপনার সঙ্গে তো তার গত দেড় বছর ধরে কোন সম্পর্ক নেই। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তো সেপারেশন হয়ে গিয়েছে।

হয়েছে, তবু তাকে আমি জানি। সে এসবের কিছু জানে না। He is so innocent! এত নিরীহ—বলতে বলতে সীতা মৈত্রের দু চোখের কোল ছলছল করে ওঠে।

টপটপ করে তার দু চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সীতা দেবী, পিয়ারীলাল তো সে কথা বিশ্বাস করে না। কিরীটী এবারে বলল।

পিয়ারীলাল! চমকে তাকায় সীতা মৈত্র কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, পরশু রাত্রে সে কথা কি সে আপনাকে এসে বলে যায়নি?

ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে সীতার সমস্ত মুখখানা যেন একেবারে মড়ার মতই ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আর্থার হ্যামিলটনকে সে শেষ করে দিতে চায় সেই কথাই কি গতরাত্রে পিয়ারীলাল এসে আপনাকে জানিয়ে যায়নি?

সীতা একেবারে বোবা হয়ে যায় যেন।

কয়েক মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন শব্দই বের হয় না।

কি, চুপ করে রইলেন কেন? কোথায় গাড়িতে করে যাবার কথা আছে আজ রাত্রে আপনাদের? বলুন, এখনও আর্থারকে যদি বাঁচাতে চান তো বলুন।

সীতা নির্বাক। পাথর!

আর্থারকে তো আজও আপনি ভালবাসেন। কেন তবে চুপ করে থেকে তার সর্বনাশ ডেকে আনবেন মিস্ মৈত্র?

জানি না, আমি কিছু জানি না—

দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল সীতা মৈত্র।

কোন ভয় নেই আপনার সীতা দেবী, নির্ভয়ে আপনি বলুন, আমি কথা দিচ্ছি আপনার নিরাপত্তার জন্য দায়ী আমি থাকব। বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

কোথায় তাকে নিয়ে যাবে আমি জানি না, তবে—

তবে?

আজ অফিসে পিয়ারীলালকে বলতে শুনেছিলাম আমাদের উর্বশী সিগারেটের ভ্যানটা নাকি বারুইপুরে যাবে।

বারুইপুরে?

হ্যাঁ—সিগারেটের কারখানাটা শুনেছিলাম একসময়—বারুইপুরে না কি কোথায়।

হুঁ! তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়!

কিরীটী যেন অতঃপর চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করল।

তারপর এক সময় পায়চারি থামিয়ে বললে, ঠিক আছে, আপনি আপনার ঘরে যান—

এখন তো আমি ঘরে যাব না—

তবে?

চায়না টাউন হোটেলে একবার যেতে হবে।

কেন? সেখানে কি?

সেখানেই আর্থার থাকে—সেখান থেকে তাকে নাকি ওরা গাড়িতে তুলে নেবে সেই রকম কথা হয়েছে।

আপনার সঙ্গে কি সেই রকম কথা ছিল?

না। আমার এখানেই থাকবার কথা। কিন্তু—

ঠিক আছে, আপনি যান চায়না হোটেলে, আপনার কোন ভয় নেই।

যাবো?

হ্যাঁ, যান।

সীতা মৈত্র ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ বাইশ ॥

সেই রাত্রেই।

ভবানীপুর থানায় আমি, কিরীটী ও নির্মলশিববাবু অপেক্ষা করছিলাম এমন সময় ফোনে সংবাদ এল, সীতা মৈত্র তখনো নাকি চায়না টাউনে যায়নি।

একটু অবাকই হলাম আমরা সংবাদটা পেয়ে।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমাদের ফ্ল্যাট থেকে সীতা মৈত্র বের হয়ে গিয়েছে।

এখন রাত সাড়ে এগারটা। এখনো চায়না টাউনে সে পৌঁছায়নি মানে কি!

সংবাদটা পেয়ে কিরীটী যেন একটু চিন্তিতই হয়ে ওঠে।

বলে, তবে কি সে সেখানে আদৌ পৌঁছাতেই পারল না?

কিরীটী মুহূর্তকাল যেন কি চিন্তা করে।

তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকে।

সুব্রত!

কি?

ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না। এদিকে হরিপদও তো এখনো পর্যন্ত কোন ফোন করল না। উর্বশী সিগারেটের ভ্যানের সংবাদটা তার দেওয়ার কথা ছিল—

কিরীটীর কথা শেষ হল না।

ফোন বেজে উঠল।

নির্মলশিবই ফোন ধরেছিল।

কি আশ্চর্য! কে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি ও. সি. কথা বলছি। সন্ধ্যার সময় সে সেই ভ্যান গ্যারাজ থেকে বের হয়ে গেছে আর ফেরেনি!

ফোন রেখে দিয়ে নির্মলশিব কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, কি আশ্চর্য! শুনলেন তো মিঃ রায়, ভ্যান এখনও ফেরেনি।

হুঁ, শুনলাম আর দেরি নয়—চলুন—

সকলে আমরা এসে জীপে উঠে বসলাম।

কিরীটী নিজেই ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে স্টীয়ারিং ধরল।

রাত পৌনে বারোটা প্রায়।

কলকাতা শহর প্রায় নিশুতি হয়ে এসেছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখা গেল এক ভদ্রলোক বিরাটাকার দুই অ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে তাঁর গাড়ির মধ্যে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

কিরীটী শুধালে, হরগোবিন্দ এসেছ কতক্ষণ?

তা বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হবে।

ঠিক আছে, আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে তুমি তোমার গাড়িটা নিয়ে এস—

আগে আমাদের জীপ, পিছনে হরগোবিন্দর গাড়ি।

বারুইপুরে এসে আমরা পৌঁছলাম রাত একটা নাগাদ।

পথের ধারে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করানো হল।

নির্মলশিববাবু প্রশ্ন করে, এবারে?

কিরীটী এবার তার পকেট থেকে একটা ব্যবহৃত, ঘামের গন্ধঅলা পুরানো গেঞ্জি কাগজের মোড়ক থেকে বের করে হরগোবিন্দকে বললে, তোমার জ্যাকি আর জুনোকে নিয়ে এস তো গাড়ি থেকে নামিয়ে।

হরগোবিন্দ নিয়ে এল গলায় চেন বাঁধা কুকুর দুটো গাড়ি থেকে নামিয়ে।

সেই গেঞ্জিটা কুকুর দুটোকে শুঁকতে দেওয়া হল কিছুক্ষণ।

কুকুরদুটো আকাশের দিকে অন্ধকারে মুখ তুলে বার দুই ঘেউ ঘেউ শব্দ করে এগুতে শুরু করল। আগে আগে কুকুর দুটো, আমরা তাদের পিছু পিছু চলতে লাগলাম। কখনও রাস্তা, কখনও মাঠ, কখনও পুকুরের ধার দিয়ে কুকুর দুটো যেতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে নির্জন একটা পড়ো বাড়ির কাছাকাছি আসতেই আমাদের নজরে পড়ল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্বশী সিগারেটের সেই কালো রঙের চকচকে ভ্যানটা।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী হরগোবিন্দকে চাপা কণ্ঠে যেন একেবারে ফিস্ ফিস্ শব্দে নির্দেশ করে, থামো।

হরগোবিন্দ কিরীটীর নির্দেশমত কুকুর দুটার গলায় বাঁধা চেনে টান দিতেই শিক্ষিত কুকুর দু'টো থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এক পাও তারা আর নড়ল না।

পূর্ববৎ চাপা কণ্ঠে কিরীটী ডাকে, সুব্রত!

কি?

দেখেছিস?

হুঁ।

নির্মলশিববাবু?

বলুন।

পিস্তল আছে তো সঙ্গে?

হ্যাঁ।

লোডেড্?

হ্যাঁ!

O. K.

বাড়িটার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে বিশেষ কোন বেগ পেতে হল না।

পরে জেনেছিলাম সেটা এককালে নাকি নীলকুঠী ছিল।

বিরাট বিরাট ঘর, বিরাট আঙিনা—কিন্তু সব যেন অন্ধকারে খাঁ খাঁ করছে।

পাখি কি তবে পালাল? নিজেকেই নিজে যেন মনে মনে প্রশ্নটা করি।

এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল অন্ধকারে একটা ক্ষীণ আলোর আভাস। আলোর আভাসটা আসছিল সামনে একটা ঘরের ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে।

সর্বাগ্রে ছিল কিরীটী। তার পশ্চাতে আমি ও আমার পাশে নির্মলশিববাবু।

কিরীটী দরজার কাছ বরাবর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

এবং পূর্ববৎ ফিস্ ফিস করে আমাকে বলে, শুনছিস্ !

হুঁ।

অত্যন্ত ক্ষীণ একটা গ্রো'নিংয়ের শব্দ যেন কানে আসছিল সামনের ঘরের ভিতর থেকে।

নির্মলশিববাবু, গেট রেডি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী যেন একপ্রকার ছুটে গিয়েই দড়াম করে ঘরের দরজাটা খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই।

ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের দেওয়ালে একটা দেওয়ালগিরি টিমটিম করে জ্বলছে।

আর একটা শয্যার ওপরে অসহায়ের মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে কে একজন।

আচমকা ঐ সময় দরজার ওপাশ থেকে একটা ছায়ামূর্তি যেন ঝাঁপিয়ে এসে কিরীটীর উপর পড়ল।

কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুহাতে জাপটে ধরে এবং চোখের পলকে যুযুৎসুর এক মোক্ষম প্যাঁচে কায়দা করে ধরাশায়ী করে ফেলে।

আমি ততক্ষণে ছুটে শয্যার উপর শায়িত মানুষটার দিকে এগিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি।

একি ! এ যে সীতা।

কিরীটী ঐ সময় আমাকে ডেকে বলে, সুব্রত, শয়তানটাকে কায়দা করেছি, তুই আগে দেখ সীতা দেবীকে—

সীতাকে তখন আর দেখব কি।

প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ।

নিশ্চল রক্তাক্ত দেহটা শয্যার উপর পড়ে রয়েছে।

সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র রক্তে একেবারে লাল।

ডান দিককার বুকেই রক্তাক্ত ক্ষতস্থানটা নজরে পড়ল। শয্যার এক পাশেই নজরে পড়ল পড়ে আছে রক্তমাখা একখানা ছোরা।

বুঝলাম ঐ ছোরাটাই সীতার বুকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় নির্মলশিববাবু প্রথমটায় বোধ হয় একটু হতভম্বই হয়ে গিয়েছিল। কারণ সে তখনও এক পাশে বোকার মত দাঁড়িয়েছিল।

আমি ঝুঁকে পড়লাম নিঃসাড় সীতার মুখের কাছে, প্রাণ আছে কিনা দেখবার জন্য।

কিরীটী ইতিমধ্যে তার আক্রমণকারীকে যুযুৎসুর প্যাঁচে ধরাশায়ী করে বুকের উপর চেপে বসেছিল।

নির্মলশিববাবুকে লক্ষ্য করে সে এবারে বলে, নির্মলশিববাবু, আমার পকেটে সিল্ককর্ড আছে একটা বের করুন তো, এটাকে বেঁধে ফেলা যাক।

নির্মলশিব তাড়াতাড়ি এবার এগিয়ে গেল কিরীটীর কাছে। এবং তার পকেট থেকে সিল্ককর্ডটা টেনে বের করল। এবং ক্ষিপ্র হস্তে কিছুটা কিরীটীর সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত নির্মলশিব আততায়ীকে বেঁধে ফেললে।

এতক্ষণ আততায়ীকে কিরীটী মাটিতে উবুড় করে রেখেছিল। পিছন দিক থেকে তাকে শক্ত করে সিল্ককর্ডের সাহায্যে বাঁধবার পর চিৎ করতেই আমার লোকটার মুখের প্রতি প্রথম নজর পড়ল।

আমি চমকে উঠি লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে।

এক শেষ পর্যন্ত আততায়ী আর্থার হ্যামিলটন। সত্যিই বিস্ময়ের যেন আমার অবধি পূর্ববৎ চাপা

কি ? আততায়ী আর্থার হ্যামিলটন।

দেখেছিস ?

হুঁ। ধ্যে আততায়ী হ্যামিলটনকে বন্দী করে কিরীটী আমার পাশে এসে নির্মলশিবছিল। এবং কোন কথা না বলে প্রথমেই সীতার নাকের কাছে মুখ নিয়ে বপরীক্ষা করল, তারপর তার হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ির গতি পরীক্ষা করল।

এখনও প্রাণ আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে বাঁচবে না। তার পরেই পার্শ্বে দণ্ডায়মান নির্মলশিবের দিকে তাকিয়ে বললে, নির্মলশিববাবু, একে এখুনি হাসপাতালে রিমুভ করা দরকার।

আমার জীপে করেই তাহ'লে নিয়ে যাই।

হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই ভাল হবে। চলুন—আর দেরি নয়।

বলতে বলতে কিরীটী নিজেই নীচু হয়ে রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীনা সীতার দেহটা দুহাতে বুকের উপরে তুলে নিল।

নির্মলশিব বন্দী আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়ে অগ্রসর হল।

আর্থার হ্যামিলটন যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বিনা প্রতিবাদে সে চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু জীপে তোলা গেল না সীতার দেহটা।

কাজেই হরগোবিন্দর গাড়িতেই দেহটা তোলা হল।

সেই গাড়িতেই আমি ও কিরীটী উঠলাম।

কিরীটীর নির্দেশে বন্দী আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়ে জীপে উঠে বসল নির্মলশিববাবু।

স্থির হল হাসপাতালে সীতাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা থানায় যাব।

॥ তেইশ ॥

পরদিন বেলা সাতটা নাগাদ কিছুক্ষণের জন্য সীতার জ্ঞান হল।

কিরীটী ও আমি এবং নির্মলশিববাবু তিনজনেই সীতার বেডের সামনে ছিলাম। কিন্তু বিশেষ কিছুই বলবার ক্ষমতা তখন আর ছিল না সীতার।

নিদারুণ ভাবেই সে আহত হয়েছিল, মারাত্মক ছুরির আঘাত। তার উপরে অতিরিক্ত রক্তস্রাব।

সীতাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই কিরীটী তার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে

কিছু বলবেন সীতা দেবী।

ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে সীতা কিরীটীর মুখের দিকে।

কোন কথাই যেন বলতে পারে না।

ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে কেবল।

বলুন কিছু যদি বলতে চান!

কিরীটী আবার বলে।

আর্থার—

হ্যাঁ, বলুন আর্থার কি?—

তাকে। তাকে—বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলাম না মিঃ রায়।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হি ইজ সেভড্।

বেঁচেছে! সে—সে—

হ্যাঁ। সে অক্ষতই আছে।

অক্ষত আছে। হি ইজ সেভড্। থ্যাঙ্ক গড্—

শেষের কথাগুলো যেন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে গেল।

দু'চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

আমারও চোখে জল এসে যায়।

ঐদিনই।

থানায় বসে কিরীটী বলছিল, বেচারী সীতার ঐ করুণ পরিণতির ব্যাপারে কোন দিনই বোধ হয় নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

নির্মলশিববাবু প্রশ্ন করে, কেন ও কথা বলছেন মিঃ রায় ?

কারণ সীতার ঐ পরিণতির জন্য আমিই বোধ হয় দায়ী।

আপনি ?

নিশ্চয়ই। সীতার ব্যাপারে অত বড় মারাত্মক ভুলটা যদি না করতাম—

ভুল।

ভুল বৈকি। সীতাকে যদি আমি কাল রাত্রে একাকী না ছেড়ে দিতাম তবে তো তাকে ঐ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হত না। হ্যামিলটনকে বাঁচাতে পারবে ভেবেই সীতাকে আমি যেতে দিয়েছিলাম এবং সেটা যে আমার কত বড় ভুল—

কিন্তু একটা কথা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি নি মিঃ রায় ?

কি ?

পর্যন্ত স্কাউণ্ড্রেলটাকে বাঁচানোর জন্য আপনারই বা মাথাব্যথা হয়েছিল ন ?

ঐখানেই তো আপনি ভুল করছেন নির্মলশিববাবু।

ভুল করেছি মানে ?

নিশ্চয়ই, কারণ সত্যি সত্যিই লোকটা স্কাউণ্ড্রেল নয়। বরং বলতে পারেন হতভাগ্য।

হতভাগ্য !

হ্যাঁ। অমন স্ত্রী আর তার ভালবাসা পেয়েও নচেৎ লোকটাব আজ এই পরিণতি হয়। তাকে দুর্ভাগা ছাড়া আর কি বলব বলুন ?

লোকটার প্রতি দেখছি এখনও আপনার মমতার অন্ত নেই। একটা ডায়বলিক্যাল মার্ডারার।

মার্ডারার !

নিশ্চয়ই, খুনী—

কে খুনী ! হ্যামিলটন ! কিন্তু সে তো খুনী নয়।

খুনী নয় মানে ?

অতি প্রাঞ্জল। সে হত্যা করেনি সীতাকে।

কথাটায় এবারে আমিও চম্‌কে উঠি।

কি বলছিস কিরীটী?

কিরীটী শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলে, ঠিকই বলছি—সে খুন করে নি।

কিন্তু—

লোকটা হ্যামিলটনের মত দেখতে, তাই তো? বলতে বলতে মৃদু হাসে কিরীটী।

অতঃপর প্রশ্নটা না করে পারি না।

শুধাই, কে? কে তবে ঠিক হ্যামিলটনের মতই অবিকল দেখতে লোকটা?

হ্যামিলটনের ছদ্মবেশে আসল খুনী।

ছদ্মবেশে!

হ্যাঁ, হাজত ঘরে গেলেই তোমাদের ভুল আমি ভেঙ্গে দিতে পারব!

কিরীটীর কথায় সঙ্গে সঙ্গে নির্মলশিব উঠে দাঁড়ায়। এবং বলে, চলুন, চলুন। আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ রায়।

বেশ। চলুন।

সকলে আমরা হাজত ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

থানার লকআপেই লোকটা তখনও ছিল এবং লকআপে থাকলে পূর্ব নির্দেশমত তার হাতে হাতকড়া দেওয়া ছিল।

আমরা সকলে এসে থানার সেই লকআপের মধ্যে তালা খুলে ঢুকলাম। বেলাতেও ঘরটার মধ্যে আলো না জ্বাললে ভাল করে সব কিছু দৃষ্টিতে আসে না।

মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে বসেছিল লোকটা।

আমাদের পদশব্দে সে ফিরে তাকাল।

লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেন যেন বুকটার মধ্যে শির শির করে ওঠে। পিঞ্জরাবদ্ধ রুদ্ধ আক্রোশে বাঘের মতই যেন চোখ দুটো তার জ্বলছিল তখন।

কিন্তু কিরীটী একটু আগে কি বলল! এ তো আর্থার হ্যামিলটনই।

কিরীটী!

আমার ডাকে কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এখনও মনে হচ্ছে আর্থার হ্যামিলটনই। তাই না।

আমি এবং নির্মলশিব দু'জনাই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু ভাল করে ওর চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবি সে নয়। তোদের কেন, সকলেরই ঐ ভুল হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। তবে হ্যামিলটনের অপূর্ব ছদ্মবেশ নেওয়া সত্ত্বেও আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েই গতকাল বুঝতে পেরেছিলাম—চিনতে পেরেছিলাম

ও আসলে কে! ওর ঐ দুটো চোখই আমাকে ওর সত্যকারের পরিচয় দিয়েছিল ওর ছদ্মবেশ নেওয়া সত্ত্বেও, হ্যাঁ, তোমাদের সকলকে ফাঁকি দিতে পারলেও ও আমাকে ফাঁকি দিতে পারে নি। Now you see—

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি ধরে একটা হেঁচকা টান দিতেই স্পিরিট-গামের সাহায্যে লাগানো ফলস্ মেক আপের দাড়ি গোঁফ কিরীটীর হাতের মুঠোর মধ্যে চলে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পেরে।

আর্থার হ্যামিলটন নয়।

কাঞ্জিলাল!

অস্ফুট কণ্ঠ দিয়ে আমাদের বের হয়ে এল।

একি! কাঞ্জিলাল!

হ্যাঁ, কাঞ্জিলাল। চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল।

॥ চব্বিশ ॥

ঞ্জীব কাঞ্জিলাল।

কিরীটী মৃদু হেসে অদূরে দণ্ডায়মান চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আপাততঃ তাই মনে হলেও ঐ নামটিও কিন্তু ওর আসল আদি ও অকৃত্রিম নাম বা পরিচয় নয়। ছদ্মবেশের মত ওটিও আর একটি ছদ্মনাম।

ছদ্মনাম!

হ্যাঁ, মহৎ ব্যক্তি ও গুণীজন কিনা তাই ভদ্রলোক অনেক নামেই পরিচিত।

আরও নাম ওর আছে? শুধাল এবারে নির্মলশিববাবুই।

আছে। আমি অবিশ্যি আর দুটি নাম জানি।

আরও দুটি নাম ওর জানেন!

জানি। বোম্বাই শহরে বৎসর চারেক পূর্বে উনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, মিঃ রাঘন নামে। এবং তার পূর্বে বছর সাতেক আগে ছিলেন মাদ্রাজে। সেখানে নাম নিয়েছিলেন মিঃ অবিনাশলিঙ্গম।

তাই নাকি।

হ্যাঁ। তিন-চারটি ভাষা ওঁর আয়ত্তে।

তবে ওর আসল নামটা কি? নির্মলশিব প্রশ্ন করে।

আসল নামটি যে কি একমাত্র বলতে পারেন উনিই। বলেই চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করল, বলুন না মিঃ কাঞ্জিলাল, আপনার আসল, আদি ও অকৃত্রিম নামটা কি ?

বলাই বাহুল্য কাঞ্জিলাল নিরুত্তর রইল।

কেবল ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে আমাদের দিকে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, বোবার শত্রু নেই নির্মলশিববাবু। অতএব উনি বোবা, মৌন। যাক্‌গে—এখানে আর নয়, চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

আমরা পুনরায় নির্মলশিবের অফিসঘরে ফিরে এলাম।

একটা চেয়ারে বসে একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগে মনোনিবেশ করে কিরীটী।

আমিই এবারে শুধোই, ওকে তাহলে তুই পূর্ব হতেই সন্দেহ করেছিলি ?

হ্যাঁ, চায়না টাউন হোটেলে ওকে যেদিন প্রথম দেখি বলা বাহুল্য আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিলাম কারণ ওর ঐ দুটি চোখ মনের পাতায় আমার অনেক দিন থেকেই গাঁথা ছিল।

ওকে তুই পূর্বে দেখেছিলি ?

চাক্ষুষ নয় ফটোতে।

ফটোতে।

হ্যাঁ। ক্রিমিন্যাল রেকর্ড সেক্‌শনের দপ্তরে ওদের মত বহু চিহ্নিত গুণীজনদের যে সব নানাবিধ পরিচিতি সংরক্ষিত থাকে সেই রকমই একটা ফটোর অ্যালবামে ওর চেহারার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। ফটোতে সেই সময় ওরই চোখ দুটি সেদিনই আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল। এবং সেই দিনই ডি সি-কে বলেছিলাম, চোখের ঐ দৃষ্টি একজন সাধারণ কালপ্রিটের নয়। রক্তের মধ্যে ক্রাইমের বিষাক্ত বীজ থাকে ও চোখের দৃষ্টি তাদেরই।

আমরা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত কিরীটীর বিশ্লেষণ শুনতে থাকি।

কিরীটী বলতে থাকে : সেই সময় ডি. সি-র কাছে লোকটার কিছু পরিচয় পাই। কারণ লোকটা সম্পর্কে জানতে আমার সত্যিই আগ্রহ হয়েছিল কিন্তু ডি. আমাকে বিশেষ কোন ইনফরমেশন লোকটার সম্পর্কে দিতে পারলেন না। বোম্বে এবং মাদ্রাজের ব্যাপারটুকুই কেবল আমাকে সে সময় তিনি বললেন। মামলাটা ছিল সোনার চোরাই কারবার ও নোট জালের ব্যাপার। কিন্তু সে সময় লোকটিকে ধরেও স্থানীয় পুলিসের কর্তারা জোরালো প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ওকে।

তারপর ? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে নির্মলশিববাবু।

তার পর বেশ কিছুদিন লোকটার আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না এবং শ্রীমান যে ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে এসে চিরঞ্জীব কাঞ্জিলাল নাম নিয়ে তার কর্মের জাল বিছিয়েছে পুলিসের কর্তৃপক্ষ এতদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

তারপর ?

তারপর সেদিন যখন ওকে আমি হ্যামিলটনকে অনুসরণ করতে করতে গিয়ে 'চায়না টাউন' হোটেলে প্রথম দেখলাম, আমি আর কালবিলম্ব করিনি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের দৃষ্টি ওর উপরে আমি আকর্ষণ করাই। এবং অনুসন্ধানের ফলে বিচিত্র এক ইতিহাস আমরা জানতে পারি।

ইতিহাস ?

হ্যাঁ সেই ইতিহাসই এবার বলব। প্রথমে মাদ্রাজ এবং পরে বোম্বাই থেকে পুলিসের তাড়ায় কারবার গুটিয়ে সম্ভবত চিরঞ্জীব—ঐ নামেই বলব, কলকাতায় চলে আসে সোজা। কলকাতায় এসে তার পরিচয় হয় ঘটোৎকচ অর্থাৎ আমাদের পিয়ারী-লালের সঙ্গে। পিয়ারীলাল লোকটা দুর্ধর্ষ ও শয়তান কিন্তু চিরঞ্জীবের মত তার কুটবুদ্ধি ছিল না। পিয়ারীলাল তখন 'চায়না টাউন' হোটেলটি একজনের কাছ থেকে ষড়যন্ত্র করে বাগিয়ে নিয়ে সবে হোটেলটির মালিক হয়েছে। পিয়ারীলালের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে চিরঞ্জীব ঐ চায়না টাউন হোটেলেই আস্তানা নিল। তারপর পিয়ারী-লালের মাথায় হাত বুলোতে কাঞ্জিলালের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। অতি সহজেই সে হোটেলটি গ্রাস করে নিল। এবং তার একটা পাকাপাকি নিশ্চিন্ত আস্তানাও ল। আস্তানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরঞ্জীব আবার পুরাতন কারবার অর্থাৎ নোট ও সোনার চোরাকারবারে মন দিল। একে একে সোনার লোভে লোভে বের দলে লোক এসে জুটতে লাগলো।

আর্থার হ্যামিলটন ও তার স্ত্রী সীতা—

সেই কথাই এবারে বলব। ঘটোৎকচের পিয়ারীলালও আসল নাম নয়—

তবে ?

মিঃ ওর আসল নাম হচ্ছে ফ্রান্সিস মুর। নেটিভ ক্রিশ্চান। ফ্রান্সিস্ আর আর্থার ছিল দীর্ঘদিনের বন্ধু।

বন্ধু।

হ্যাঁ। কিন্তু বন্ধুত্বটা যে কি ভাবে এত গাঢ় হয়েছিল সেটাই বিচিত্র। কারণ আর্থার তার বন্ধুর মত শয়তান ছিল না। তবে মনের মধ্যে লোভ ছিল অর্থের এবং

আমার মনে হয় ঐ লোভই হয়েছিল তাদের পরস্পরের বন্ধুত্বের বাঁধন। যাই হোক যা বলছিলাম তাই বলি। চিরঞ্জীব কলকাতায় স্থিতি হবার পর তার 'ওভারসিজ লিংক' কোম্পানী গড়ে তুলল। এবং বরাবর যেমন সে করে এসেছে এবারেও তেমনি ওভারসিজ লিংকই নয়—সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এবং তার আসল কারবারকে পুলিসের শ্যেন দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য আরও কয়েকটি উপঘাঁটি গড়ে তুলল। অবশ্যই প্রত্যেকটি উপঘাঁটিই কাছাকাছি গড়ে তুলল কেবল বিশেষ ২টি ঘাঁটি ছাড়া—প্রথম তার নিজের বাসস্থানটি ও দ্বিতীয় নোট জালের কারখানাটি দূরে দূরে রইল।

হস্তধৃত সিগারটা ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে নিভে গিয়েছিল।

সেটায় পুনরায় অগ্নিসংযোগ করে গোটা দুই টান দিয়ে কিরীটী তার অর্ধসমাপ্ত কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে ফিরে এল।

কিরীটী বলতে লাগল: 'চায়না টাউন' হোটেল ও বারুইপুরের ঘাঁটি বাদে অন্যান্য ঘাঁটি হল তার, ওভারসিজ লিংক, পান্থপিয়াবাস রেঁস্তোরা ও লাটুবাবুর গ্যারাজ। এবং নিজেকে ও সেই সঙ্গে নোট জালের কারখানাটি আড়াল করে রাখবার জন্য আমদানি হল 'উর্বশী সিগারেট'।

॥ পঁচিশ ॥

কিরীটী বলতে লাগল, চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সর্বপ্রথম ফ্রানসিস —আমাদের ঘটোৎকচ বা পিয়ারীলাল। তারপর এল, পানওয়ালা ভিখন ও 'পান্থ পিয়াবাসের মালিক কালীকিঙ্কর সাউ। এবং সর্বশেষ আমাদের হ্যামিলটন সুন্দরী স্ত্রী সীতা হ্যামিলটন।

আর্থার হ্যামিলটনের মনের মধ্যে অর্থের প্রতি লোভ থাকলেও দুর্বুদ্ধি। এই আগেই বলেছি। এবং স্ত্রীর সঙ্গে তার নেশার ব্যাপারে প্রায়শঃই খিটমিটি থাকলেও কেউ তারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে সেপারেশনের কথাও বো ভাবতে পারে নি।

এমন সময় চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের আগমন ঘটল অকস্মাৎ একদিন ঘটোৎকচের সঙ্গে বর্ধমানে হ্যামিলটনের রেলওয়ে কোয়ার্টারে কোন এক নিদারুণ অশুভক্ষণে। এবং এবারের ইতিহাস যা আমাকে কিছু কিছু বলেছিল আর্থার হ্যামিলটন এবং বাকীটা আমার অনুমানের উপরে নির্ভর করে আমি গড়ে তুলেছি।

এতক্ষণে যেন কিরীটীর কথায় অকস্মাৎ আমাদের সকলেরই আর্থার হ্যামিলটনের কথাটা মনে পড়ল।

বর্তমান নাটকে বিশিষ্ট একটি স্থান নিয়েও আর্থার হ্যামিলটনকে যেন আমরা সীতার করুণ ট্রাজেডির সঙ্গে জড়িত হয়ে ও চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের প্রসঙ্গে এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিলাম।

তাই হ্যামিলটনের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিই বললাম, আর্থার এখন কোথায় তুই জানিস কিরীটী ?

জানি।

কোথায় ?

বর্তমানে সে আসানসোলে তার এক আত্মীয়ের বাসায় পুলিসের সতর্ক প্রহরায় রয়েছে।

আসানসোলে ?

হ্যাঁ।

কবে সেখানে গেল ?

কাল রাত্রের ট্রেনে। আমিই অবিশ্যি ডি. সি-কে বলে ব্যবস্থা করেছি।

সীতার ব্যাপারটা আর্থার জানে না বোধ হয় ?

না।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না কিরীটী—

কি ?

আর্থারের ব্যবস্থা যখন তুই করেছিলিই সে-রাত্রে সীতাকে 'চায়না টাউনে' ...লি ...কন ?

...নকে আজ তো হাতেনাতে ধরতে পারতাম কিন্তু তাকে যেতে দিয়ে আমি ভুল করি নি—ভুল করেছি তাকে একা যেতে ... কারণ আমার ধারণা ছিল—

কী ?

কাঞ্জিলাল হয়তো শেষ পর্যন্ত সীতাকে হত্যা করবে না।

হঠাৎ অমন বিদঘুটে ধারণাটা কেন হল আপনার মিঃ রায় ? প্রশ্নটা করলে নির্মলশিববাবু।

কারণ আমি জানতাম সীতাকে সত্যি ভালবাসে কাঞ্জিলাল।

কিসে বুঝলেন সেটা ?

শেষ মুহূর্তে যে কাঞ্জিলাল সীতাকে চরম আঘাত হেনেছিল সেই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই। যাকে ভালবেসেছি বলে আগাগোড়া জেনে এসেছি এবং সেও আমাকেই ভালবাসে বলে জেনে এসেছি হঠাৎ যখন কোন এক মুহূর্তে সেই জানাটা মিথ্যা হয়ে যায় অর্থাৎ জানতে পারি আমার জানাটা ভুল—সেই মুহূর্তে যে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তা বড় ভয়ঙ্কর। কাঞ্জিলালেরও হয়েছিল ঠিক তাই। কাঞ্জিলাল যে মুহূর্তে জানতে পারলে সীতা আজও আর্থার হ্যামিলটনকে ভুলতে পারে নি, যতই দূরে যাক সে আজও তার সমস্ত বুকটা জুড়ে রয়েছে তার ভূতপূর্ব স্বামী হ্যামিলটনই, খুব সম্ভবত চিরঞ্জীবের বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছিল হিংসার ভয়ংকর আগুন, যে আগুনে সীতাকে তো সে ধ্বংস করলই নিজেরও চরম সর্বনাশকে ডেকে আনল। যে পুলিস গত এই কয় বছর ধরে তার বহুবিধ দুষ্কৃতির সন্ধান পেয়েও তাকে ধরতে বা ছুঁতে পারে নি সেই পুলিসের হাতেই ধরা পড়ল আজ সে।

চিরঞ্জীব যে সীতাকে ভালবাসে জানলেন কি করে মিঃ রায়? নির্মলশিব প্রশ্ন করে।

কেন, আপনার লোকরা 'চায়না টাউনে'র প্রোপাইটার চিরঞ্জীবের ঘর সার্চ করে যে সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল সেদিন তার মধ্যে আপনি কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু না পেলেও—তার ঘরে যে বাঁধানো বাইবেলটি আপনার লোকরা এনেছিল তার মধ্যে একটি ফটো আমি পেয়েছিলাম—বলতে বলতে কিরীটী ছোট একটা ফটো বের করে আমাদের সামনে তুলে ধরল।

ফটোটা চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালের।

নির্মলশিব ফটোটার দিকে তাকিয়ে বললে, এ তো চিরঞ্জীবের ফটো দেখছি, মিঃ রায়। হ্যাঁ—তারই—তবে—

তবে আবার কি?

এর পিছনের লেখাটা পড়লেই আপনার ঐ 'তবে'র উত্তর পাবেন। এই দেখুন—কিরীটী ফটোটা উল্টে ধরল।

দেখলাম তার পিছনে ইংরাজীতে লেখা আছে কালি দিয়ে—

To my darling Sita

Chiranjib.

এবং তার নীচে যে তারিখটা রয়েছে সেটা এক বৎসর পূর্বের।

কিরীটী বলতে লাগল, ফটো এবং এই লেখাটুকুই চিরঞ্জীব-সীতা রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

কিন্তু এ ফটো চিরঞ্জীবের ঘরে বাইবেলের মধ্যে এল কি করে? প্রশ্ন করল নির্মলশিববাবু।

খুব সম্ভবত—আমার অনুমান পরে দুজনার মধ্যে আর্থার হ্যামিলটনকে নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় হয় সীতাই চিরঞ্জীবকে ফটোটা ফিরত দিয়েছিল না হয় চিরঞ্জীবই চেয়ে নিয়েছিল সীতার কাছ থেকে। সে যাক্, হ্যামিলটন পর্বটা এবারে শেষ করি। হ্যামিলটনকে দলে সম্ভবত চিরঞ্জীব টেনে নিয়েছিল সীতার আকর্ষণে। যদিচ চিরঞ্জীবের জীবনে সেইটাই সর্বাপেক্ষা বড় ভুল হয়েছিল।

কেন? নির্মলশিব আবার প্রশ্ন করে।

কারণ চিরঞ্জীব যে মারাত্মক খেলায় মেতেছিল অর্থাৎ নোট জাল ও সোনার চোরাকারবার তার মধ্যে দুর্বল প্রকৃতির নারীর স্থান নেই। এবং সীতা যদি তার জীবনের সঙ্গে ঐভাবে জড়িয়ে না পড়ত চিরঞ্জীবের আজকের এই পরাজয় ঘটত কিনা সন্দেহ।

॥ ছাব্বিশ ॥

কিরীটী বলতে লাগল, যাই হোক হ্যামিলটনকে দলে নিলেও চিরঞ্জীব কোনদিন তার উপরে সম্ভবত পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে নি। তাই দলের মধ্যে তাকে সক্রিয় হতে দেয় নি।

তবে?

কিন্তু সীতার জন্য তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার প্রয়োজন ছিল তাই হাতে রেখেছিল তাকে নেশার খোরাক যুগিয়ে।

নেশা!

হ্যাঁ, নেশা! মদের নেশা। এবং বোকা সরল প্রকৃতির আর্থার হ্যামিলটনকে সেই ভাবে নেশাগ্রস্ত করে হাতের মুঠোর মধ্যে নিতে কাঞ্জিলালকে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। যাই হোক ঐভাবে চলছিল, এমন সময় দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল করল কাঞ্জিলাল।

কি?

হ্যামিলটনকে নেগলেক্ট করে। সীতাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়ার পর চিরঞ্জীব হ্যামিলটনের আগের মত নেশার খোরাক যোগানোর ব্যাপারে যখন হাত গুটিয়ে নিল তখনই শুরু হল গোলমাল। তা ছাড়া আরও একটা গোলমাল ইতিমধ্যে শুরু হয়েছিল।

কি ?

লাভের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল। যার ফলে দলের কেউ হয়তো আক্রোশের বশেই পুলিসকে উড়ো চিঠি দেয়। এবং যার ফলে একজনকে ইহজগৎ থেকে সরতে তো হলই সেই সঙ্গে মোহিনীমোহনকেও চিরঞ্জীবের ব্যাপারে মাথা গলানোর জন্য সরতে হল। এবং শেষ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে যা হয় দলপতির সন্দেহটা তখন ক্রমশঃ এত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে যে, তাদের দু'চারজনকে সেই সন্দেহের আগুনে পুড়ে মরতে হয়—ভিখনকে সেই কারণেই প্রাণ দিতে হয়েছে।

একটা কথা মিঃ রায়। নির্মলশিব প্রশ্ন করে ঐ সময়।

কি বলুন ?

সীতা কি চিরঞ্জীবের সব ব্যাপার জানত ?

সীতা ভিতরের ব্যাপারটা পুরোপুরি প্রথম দিকে না জানতে পারলেও শেষটায় বোধ হয় সন্দেহ করেছিল।

আর হ্যামিলটন ?

হ্যামিলটন বোধ হয় তা জানতে পেরেছিল। তবে জানতে পারলেও বেচারীর তখন আর মুখ খুলবার শক্তি নেই, কারণ রেসের ময়দান ও মদের বোতল তখন তাকে গ্রাস করেছে। ঐ দুটি মারাত্মক নেশায় কাঞ্জিলালই হ্যামিলটনকে মজিয়েছিল ক্রমে-ক্রমে এবং সেই নেশার সুযোগেই তাকে একদিন সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল সে কথা তো আগেই বলেছি।

তারপর ?

তার পরের ব্যাপারটাই শেষোক্ত ট্রাজেডির মূল।

কি রকম ?

নেশায় ও অর্থের দৈন্যে এবং সীতাকে হারিয়ে পর্যুদস্ত ও নিষ্পিষ্ট আর্থার হ্যামিলটন এসব ক্ষেত্রে যা হয় শেষ পর্যন্ত তাই করেছিল।

কি ?

সেও শেষ পর্যন্ত মাত্র দশদিন পূর্বে মরণ কামড় দিল।

কি রকম ?

পুলিসের কর্তাকে বেনামী চিঠি দিল। কিন্তু ধূর্ত কাঞ্জিলাল ব্যাপারটা জেনে ফেলল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হ্যামিলটনকে একেবারে দুনিয়া থেকে সরাবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু হ্যামিলটনকে সরানো কি কাঞ্জিলালের মত লোকের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য

ছিল ? প্রশ্ন করলাম আমি।

ছিল না নিশ্চয়ই, তবে সে পারে নি দুটো কারণে।

দুটো কারণে ?

হ্যাঁ, প্রথমতঃ কাঞ্জিলাল খুব ভালভাবেই জানত আর্থার হ্যামিলটনের সঙ্গে সীতার সেপারেশন হয়ে গেলেও সীতা আজও তাকে ভুলতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ হ্যামিলটনকে সরালে সীতাকে হারাতে হবে তার। সীতাকে কাঞ্জিলাল সত্যিই ভালবেসেছিল সে তো আগেই বলেছি। মদনের ফুলশর নয়, এখানে রতির বঙ্কিম কটাক্ষই শেষ পর্যন্ত অঘটন ঘটাল। তবে একটা কথা এখানে স্বীকার না করলে অন্যায়ই হবে।

কি ? প্রশ্ন করে নির্মলশিববাবু।

সারা দক্ষিণ কলকাতার রাস্তা জুড়ে যদি মোহিনীমোহনের লাসটা অতিরিক্ত দম্ভে কাঞ্জিলাল টুক্‌রো টুক্‌রো করে না ছড়িয়ে দিত তো বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার উপরেই দৃষ্টি আমার আকর্ষিত হত না। এবং সেদিনও রাত্রে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওভারসিজ লিংকের উপরে আর নজর পড়ত না। এবং ওভারসিজ লিংকে নেহাৎ কৌতূহলের বশে প্রবেশ করার পর সেখানে ঘটোৎকচ ও সীতা দেবীর দর্শন না পেলে ও সেদিনকার সেই ঘটনাটা না ঘটলে হ্যামিলটনকে ঘিরে ওভারসিজ লিংকের উপরে সন্দেহটাও আমার ঘনীভূত হত না।

কিন্তু এসব কথা তুই জানলি কি করে ?

কিছুটা অনুমান, কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি, কিছুটা অনুসন্ধান ও বাদবাকী আর্থার হ্যামিলটনের মুখে।

আর্থার হ্যামিলটনের মুখে।

হ্যাঁ।

কি আশ্চর্য! তাহলে চিরঞ্জীব কাঞ্জিলালই সব রহস্যের মেঘনাদ ? শুধালেন নির্মলশিববাবু।

হ্যাঁ, তবে আর একটা মাস দেরি হলে চিরঞ্জীব ঠিক নাগালের বাইরে চলে যেত কারণ যে সোনা সে চুরি করে হস্তগত করেছিল তার বোধ হয় সবটাই সে মোটা মুনাফা রেখে বিদেশে পাচার করে দিতে পেরেছিল। ওভারসিজ লিংকের কারবার সে হয়তো এভাবে শীঘ্রই গুটিয়ে নিত। কিন্তু কথায় বলে—ধর্মের কল। ঠিক সময়েই ঘটনাচক্রে যোগাযোগটা এমন হয়ে গেল যে চিরঞ্জীবের আর পালানো হল না।

পালাত মানে। পালালেই হল নাকি ? নির্মলশিব সদম্ভে বলে ওঠে।

পালাত ? আর একবার জাল গুটিয়ে নিলে স্বয়ং কিরীটী রায়েরও সাধ্য ছিল না

চিরঞ্জীবের চুলের ডগাটি স্পর্শ করে।

সত্যি বলছেন মিঃ রায় ?

এতটুকুও অত্যুক্তি নয়। ও যে কত বড় শয়তান আপনারা জানেন না এখনও, কিন্তু আমি তার সম্যক পরিচয় পেয়েছি। তবে দুঃখ রয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত সীতাকে বাঁচাতে পারলাম না।

কি আশ্চর্য! তার জন্য আর দুঃখ কি? গিয়েছে ভালই হয়েছে—যেমন ও পথে পা দিয়েছিল।

হ্যাঁ, সবই সত্যি, তবু কখনও বোধ হয় ভুলতে পারব না শেষ পর্যন্ত যে আমার শেষ মুহূর্তে ঐ ভুলটা না হলে বুঝি তাকে অমন করে কাঞ্জিলালের হাতে প্রাণ দিতে হত না।

নির্মলশিব শেষবারের মত বললে, কি আশ্চর্য !

অদৃশ্য শত্রু

॥ এক ॥

আজকের দিনের আগরপাড়া স্টেশন নয় কিন্তু, ভুল করবেন তা হলে। বাইশ বছর আগেকার সেই ছোট আগরপাড়া স্টেশন। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন চলেছে—সারাটা পৃথিবী জুড়ে।

পৌষের হাড়-কাঁপানো শীতের এক সকাল। সকালের আলো ফুটেছে বটে তবে কুয়াশার ঘন আবছায়ায় সব ঝাপসা-ঝাপসা।

স্টেশনের অল্প দূরেই স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার।

খান দুই ঘর। পাকা মেঝে। পাকা দেওয়াল, উপরের কিছুটা অংশ পাকা—কিছুটা অংশ রাণীগঞ্জের টালি ছাওয়া। সামনে ছোট একটু বাগানের মত—অজস্র বড় বড় গাঁদা ফুল, যেন হলুদের একটা বন্যা।

পিছনেও সামান্য একটু খোলা জায়গা পাচিল ঘেরা। তারই মধ্যে রান্নাঘর—স্নানঘর ইত্যাদি।

স্টেশন মাস্টার রসময় ঘোষাল ব্যাচিলর মানুষ—একাই কোয়ার্টারে থাকেন। অনেক দিনের পুরানো চাকর নিতাই—সে-ই সব কাজকর্ম করে দেয় রসময়বাবুর। এক কথায় রান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সব কিছু—অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।

রসময় মানুষটা শান্তশিষ্ট ও একটু আয়েসী। বদখেয়াল বা নেশা বলতে সত্যিকারের কিছুই নেই—তবে ভদ্রলোকের একটা নেশা আছে।

যত রাজ্যের গোয়েন্দা কাহিনী সংগ্রহ করে পড়া।

রসময় যে কেবল গোয়েন্দা কাহিনী পড়েই আনন্দ পান তাই নয়—তার একটা বিচিত্র বিলাস আছে—ঐ সব গোয়েন্দা কাহিনী গোগ্রাসে গেলেন আর নিজেকে ঐ সব গোয়েন্দার চরিত্রে খাড়া করে মনে মনে সব জটিল পরিস্থিতি কল্পনা করেন এবং সেই সব পরিস্থিতির জট মনে মনেই খোলেন। মনে মনে বিচিত্র সব রহস্য গড়ে তুলে সেই সব রহস্য একটু একটু করে ভেদ করেন।

মধ্যে মধ্যে নিতাইকে বলেন, বুঝলি নিতাই 'এই মাস্টারী করা আমার কর্ম নয়।

নিতাই বেচারা সরল মানুষ। প্রশ্ন করে, কেন কর্তা?

দাদাবাবু কিরে- তুই কি মনে করিস এই স্টেশনমাস্টারী করে সারাটা জীবন কাটাব!

লগোল বেন না!

না—আমি তলে তলে চেষ্টা করছি।

কি চেষ্টা করছেন কত্তা?

পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি যদি একটা পেয়ে যাই বুঝলি না—ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের চাকরি। পেয়ে যেতাম চাকরি একটা বুঝলি। কিন্তু ঐ বয়সটাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে—

বয়েসটা আবার বাধা কি কত্তা—

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে যে—এ বয়েসে কি আর চাকরি জোটে!

রসময় ঘোষাল মানুষটি যেমন সাদাসিধে—চেহারাটাও তেমনি সাদাসিধে। গোলগাল নাদুস-নুদুস গড়ন—গোবর গণেশ প্যাটার্নের। মাথার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে গিয়ে টাক দেখা দিয়েছে! গোলালো মুখ।

ভোঁতা নাক। ছোট ছোট চোখ—সরল চাউনি।

একটা নতুন গোয়েন্দা কাহিনী হাতে পড়েছিল গত সন্ধ্যায়।

বইটা স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রামধনিয়া এনে দিয়েছিল। ওয়েটিং রুমে টেবিলের উপর পড়েছিল। সে পেয়েছে। বোধ হয় কোন যাত্রী পড়তে পড়তে কখন ফেলে চলে গিয়েছে।

বইটার নামটি ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল বইটা হাতে পেয়েই রসময়ের।

বিষের কাঁটা। বেশ মোটা বইটা।

বইটা হাতে পেয়ে রসময়ের গতরাত্রে আর ঘুম হয়নি। আহারাদি কোনমতে শেষ করে বইটা হাতে লেপের তলায় গিয়ে ঢুকেছিল—একেবারে শেষ করে তবে নিশ্চিন্ত।

শেষ যখন হল রাতের অন্ধকার তখন ফিকে হয়ে গিয়েছে।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ে নিতাইকে চা করতে আদেশ দেয় রসময়।

মুখ ধুয়ে চা পান করে সোজা চলে আসে স্টেশনে।

ভোর হয়েছে বটে তবে শীতের কুয়াশায় চারিদিক তখনও ঝাপসা-ঝাপসা।

স্টেশনে ঘরে ঢুকতেই রসময়ের নজরে পড়ে। ছোটবাবু অর্থাৎ জীবন সমাদ্দার গতদিনের টিকিটগুলো বাণ্ডিল করে বাঁধছে।

রসময়কে ঘরে ঢুকতে দেখে জীবনবাবু বলে, গুড মর্ণিং স্যার—

গুড মর্ণিং।

ঢাকা মেল আজ লেট স্যার।

কত?

তা ঘণ্টাখানেক তো হবেই।

টেলিগ্রাফের টক টক একঘেয়ে শব্দ শোনা যায়।

ফার্স্ট নৈহাটি লোকাল পাস করেনি ?

হ্যাঁ—এই গেল ছেড়ে, মিনিট দশেক হবে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল।

জীবনবাবু ফোনটা তুলে নিল।

আগরপাড়া স্টেশন—ঢাকা মেল ছেড়েছে—ঠিক আছে।

ফোনের রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে জীবনবাবু চেঁচায়—ওরে ও শুকলাল—সিগন্যাল দে বাবা—ঢাকা মেল—

জীবনবাবু ঢাকা মেল পাস করবার জন্য বের হয়ে গেল।

আবার টেলিফোন—

রসময় ফোনটা ধরে, হ্যালো—এস এম আগরপাড়া—কি বললেন, দমদমের আগে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে—ঢাকা মেন লাইন ক্লিয়ার পাবে না…হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক আছে এখানেই দাঁড় করাচ্ছি।

রসময় ঘর থেকে বের হয়ে হাঁক দেয়, রামধনিয়া—ওরে রামধনিয়া, শুকলালকে সিগন্যাল দিতে বারণ কর—

বিরাট লৌহদানব স্টেশনের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল।

মেলের গার্ড নেমে এলেন।

কি ব্যাপার সিগন্যাল দিলেন না কেন—একে তো এক ঘণ্টা প্রায় লেট—

দমদমের আগে একটা ছোট অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, রসময় বললে। ...য়েছে।

যত সব ঝামেলা—

গার্ড অদূরবর্তী টি স্টলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রসময় ঘরে ঢুকতে যাবে—মেলের পরিচিত ড্রাইভার আব্দুল এসে সামনে

আব্দুল মিঞা যে কি খবর—

আব্দুল সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, করতা—ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কা... কি উগ্‌গা পড়ি আছে দেইলাম—

কি আবার পড়ে আছে ? রসময় শুধায়।

মানুষ মত লরে—একবার চাই আস্তক—

কাটা পড়েছে নাকি ?

আব্দুল বলে, সেই রকমই মনে হয় তার—কেউ কাটাই পড়েছে—একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ ঐ সময় আবার ঘরের মধ্যে টেলিফোন বেজে ওঠে। রসময় তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ফোন ধরে।

সিগন্যাল দেওয়ার নির্দেশ এসেছে। রসময় ফোনটা রেখে সিগন্যাল দেবার জন্য আদেশ দিয়ে দিল।

সিগন্যাল পেয়ে ট্রেন ছাড়ল। এখন আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ট্রেন নেই। ট্রেন আসবে—রাণাঘাট লোকাল সেই সাতটায়।

কিন্তু আব্দুল কি বলে গেল—কাল রাত্রে নিশ্চয়ই হয়ত কেউ কাটা পড়েছে—অ্যাক্সিডেণ্ট—একবার দেখা দরকার।

রসময় ঘর থেকে বের হয়ে প্ল্যাটফরম ধরে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের দিকে এগিয়ে চলল।

কুয়াশা কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। সূর্যের আলোয় চারিদিক পরিষ্কার।

লাইনের দু'পাশে বুনো ঘাস ও ছোট ছোট আগাছাগুলোর উপরে শিশিরবিন্দুগুলো প্রথম সূর্যের আলোয় যেন মুক্তোর মত মনে হয়। টল টল করছে।

ঠিক ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে নয়—তার থেকেও প্রায় একশ গজ দূরে যেখানে রূপশ্রী কটন মিলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটা গুডস্ ট্রেনের লাইন চলে গিয়েছে সেই লাইন ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেলে ডাইনে যে ছোট কালভার্টটা—তারই ধারে কি যেন একটা পড়ে আছে রসময়ের নজরে পড়ে।

কালো মত কি যেন একটা মনে হয়।

... সেই দিকে এগিয়ে যায় অতঃপর এবং বস্তুটার কাছাকাছি এসে থমকে
করে [illegible] দিক দিয়ে হাত দশেক ব্যবধানে যেন লাইন চলে গিয়েছে।
শেষ ... মিথ্যা বলেনি—সে ঠিকই দেখেছে।
আব ... া মানুষের দেহই বটে—তবে তখন আর চিনবার উপায় নেই। মুখটা ...। ক্ষত-বিক্ষত হাত দুটো ভেঙে দুমড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

গায়ে একটা কালো গরমের গ্রেট কোট ছিল বোধ হয়—সেটা এখানে-ওখানে ছিঁড়ে গিয়েছে। সব কিছু জড়িয়ে একটা মাংসপিণ্ড বলেই মনে হয়। পায়ের জুতো দুটো বেশ দামী বলেই মনে হয়—পায়ে মোজাও আছে।

লোকটা যে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের নয় তা বোঝা যায়। কোন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীরই লোক। প্রথমেই যেটা মনে হয় রসময়ের ঐ মুহূর্তে, লোকটা সুইসাইড করে নি তো।

কিন্তু সাইড লাইনে এসে সুইসাইড করবে?

ঐ লাইনে তো যখন-তখন ট্রেন চলে না।

মিলের মাল নিয়ে মধ্যে মধ্যে গুডস ট্রেন যাতায়াত করে।

কিন্তু সুইসাইড হোক বা অন্য কিছু যাই হোক এলাকাটা তারই স্টেশনের অন্তর্গত—অতএব অবিলম্বে তাকে একটা পুলিসে খবর দিতে হবে।

রসময়ের মনের মধ্যে তখন নানা চিন্তা মাকড়শার জাল যেন বুনে চলেছে। রসময় অন্যমনস্ক ভাবে নানা কথা ভাবতে ভাবতে স্টেশনে ফিরে এল।

সাড়ে ছয়টা বাজে প্রায়।

থানা খুব বেশী দূর নয়। একটা নোট লিখে তাড়াতাড়ি রসময় স্টেশনের একজন পয়েণ্টসম্যানের হাতে থানার দারোগা জলধরবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিল।

জলধরবাবু রসময়ের পরিচিত। অফ-ডিউটি থাকলে মধ্যে মধ্যে রসময় জলধরের ওখানে গিয়ে আড্ডা জমায়। চুরি, রাহাজানি, খুন-খারাপির গল্প বসে শোনে।

তবে আগরপাড়ার মত ছোট একটা জায়গায় কি-ই বা এমন চমকপ্রদ ঘটনা যখন-তখন ঘটতে পারে?

॥ দুই ॥

রাণাঘাট লোকালটা পাস করবার পর জলধরবাবু এসে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকলেন।

কি ব্যাপার ঘোষাল—কোথায় অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটল?

থানার ও-সি জলধর চাটুয্যের বয়স হয়েছে—পঞ্চাশের উর্ধ্বে। ডিসপেপসিয়ার ক্রনিক রোগী—রোগাটে পাকানো চেহারা। মাথার চুল প্রায় পেকে গিয়েছে। ওষ্ঠের উপরে এক জোড়া কাঁচাপাকা ভারি গোঁফ।

জলধরের সঙ্গে একজন কনস্টেবলও ছিল, গিরিধারী—

এই যে চাটুয্যে সাহেব আসুন—আমার তো মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেণ্ট নয়।

তবে কি?

সুইসাইড—

আত্মহত্যা!

হুঁ—কিম্বা এ কেস মার্ডারও হতে পারে—রসময় আস্তে বলে।

সে কি মশাই—রেল লাইনের ধারে মার্ডার—

কেন তা কি কখনও হয়নি!

না, না—তা নয়—লোকটা ভদ্রলোক বলে মনে হল নাকি?

ভদ্রলোক তো বটেই, সম্রান্ত ঘরের বলে মনে হয়।

কোথায় ?

চলুন না—কালভার্টটার কাছে—

দুজনে এগিয়ে যায়।

রসময় যেন রীতিমত একটা রোমাঞ্চ বোধ করে। তাঁর মনে হয় সে যেন আর স্টেশন মাস্টার রসময় ঘোষাল নয়—সি. আই-ডি'র কোন একজন নাম-করা অফিসার। একটা হত্যারই ইন্‌ভেস্টিগেশন চলেছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে রসময় আঙুল তুলে দেখাল, ঐ দেখুন—

মনে হল জলধর চাটুয্যেও যেন থমকে দাঁড়ালেন সামনের দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, তারপর সামনে এগিয়ে গেলেন এক পা এক পা করে।

মৃতদেহটা লাইনের এক পাশে পড়ে আছে। একটা বীভৎস লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। লাইনের পাশে পাশে একটা মানুষের সরু পায়ে-চলার পথ। লাইনের উপরে বা পাশে ঠিক নয়। সেই সরু পায়ে-চলার পথের উপর পড়ে আছে দেহটা।

গিরিধারী ওদের পশ্চাতেই ছিল।

সে বলে ওঠে, হায় রাম—

কি চাটুয্যে সাহেব—কি মনে হয় ? ব্যাপারটা রীতিমত সাসপেন্স কিনা!

উঁ—

বলছিলাম মৃত্যুটা স্বাভাবিক, মানে একটা আচমকা অ্যাক্সিডেন্ট বলে মনে হয় কি ?

উহুঁ—মনে হচ্ছে না তা—মৃদু কণ্ঠে বলেন জলধর চাটুয্যে।

সুইসাইডও হতে পারে। কিম্বা—

কি! জলধর তাকালেন রসময়ের মুখের দিকে।

মার্ডারও তো হতে পারে।

জলধর রসময়ের কোন কথার জবাব দিলেন না। আরও একটু এগিয়ে চললেন মৃতদেহটার কাছে।

গায়ের গরম গ্রেট কোটটা দামী ছিল বলে মনে হয়। কোটটা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছে যেন। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহটা।

মাথাটা ও মুখটা একেবারে থেঁতলে গেছে। মানুষটাকে চিনবার উপায় নেই। তবে দামী জামা ও পায়ের দামী জুতো দেখে মনে হয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই হবে। বাঁ হাতে একটা দামী রিস্টওয়াচও দেখা গেল। কাঁচটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

মৃতদেহটাকে চিৎ করে ফেললেন জলধর চাটুয্যে।

জামার পকেটগুলো খুঁজে দেখতে গিয়ে ভিতরের বুক পকেটে একটা দামী পার্স পাওয়া গেল।

পার্সের গায়ে সোনার জলে ইংরাজীতে এমবস্ করা এম. এন. রায়। ভিতরে প্রায় হাজারখানেক টাকার নোট—একশ টাকা ও দশ টাকার নোট আছে দেখা গেল।

আর একটা কার্ডও পাওয়া গেল পার্সের মধ্যে। কার্ডে লেখা : এম. এন. রায় —রায় এণ্ড কোং, ৯৩, ক্লাইভ রো, থার্ড ফ্লোর।

জলধর চাটুয্যের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

যাক তাহলে মৃত ব্যক্তির কিছুটা পরিচয় বা হদিস পাওয়া গেল কি বলেন।

হুঁ—মৃদুকণ্ঠে জলধর চাটুজ্যে বলেন।

এবং শুধু তাই নয়—মৃত ব্যক্তি যে ধনী, অবস্থাপন্ন তাও জানা গেল তার পার্স থেকে। রসময় বলে।

গিরিধারীকে মৃতদেহের প্রহরায় রেখে জলধর চাটুয্যে ফিরে এলেন।

রসময়ও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলল।

কি মনে হচ্ছে চাটুয্যে সাহেব? রসময় প্রশ্ন করে পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে, সুইসাইড, না মার্ডার!

বলা শক্ত।

তা ঠিক।

স্টেশনে পৌঁছে রসময়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জলধর থানার দিকে হাঁটতে শুরু করেন।

দেখে-শুনে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে সুইসাইড কেসই একটা। এবং লোকটা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের নয়। পায়ের জুতো, মোজা ও পরিহিত সুটটা দেখে মনে হয় অবস্থাপন্ন ঘরেরই মানুষ।

অতএব অবিলম্বে লালবাজারে একটা সংবাদ দিতে হবে। মৃতদেহেরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তার মানেই নানা ঝামেলা।

থানায় ফিরে লালবাজারে ফোন করতেই স্বয়ং ডেপুটি কমিশনারই ফোন ধরলেন।

অবিনাশ চক্রবর্তী। চক্রবর্তী সব শুনে বললেন, আমি ইন্সপেক্টার মৃণাল সেনকে পাঠাচ্ছি।

অবিনাশ ফোন রেখে তখুনি মৃণাল সেনকে ডেকে পাঠালেন।

একটু পরে মৃণাল এসে ঘরে ঢুকল। অল্প বয়েস। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা

পরিশ্রমী ও উৎসাহী।

আমাকে ডেকেছেন স্যার—

হ্যাঁ—তোমাকে এখুনি একবার আগরপাড়া যেতে হবে—সেখানকার থানার ও-সি জলধর চাটুয্যে একটু আগে ফোন করেছিল, একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। জলধরবাবুর ধারণা, ব্যাপারটার পিছনে কোন ফাউল প্লে আছে।

আমি এখুনি যাচ্ছি স্যার—

মৃণাল সেন স্যালুট দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মৃণাল সেন আগরপাড়ায় যখন এসে পৌঁছাল বেলা তখন প্রায় সোয়া নয়টা!

জলধরবাবুর মুখ থেকে মৃণাল সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সর্বপ্রথম জেনে নিল। তারপর সে জলধরবাবুকে নিয়ে অকুস্থানে গেল।

ইতিমধ্যে সংবাদটা আশেপাশে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

অনেকেই এসে ভিড় করেছিল আশেপাশে। কিন্তু গিরিধারীর জন্য কিছুটা দূরত্ব রেখে তারা জটলা পাকাচ্ছিল।

জলধরবাবু সকলকে তাড়া দিলেন।

তাড়া খেয়ে সবাই পিছিয়ে গেল বটে কিন্তু স্থানত্যাগ করল না।

মৃণাল সেন মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখল।

মৃতদেহ ও তার পরিধেয় বস্ত্র দেখে মনে হয় মৃত ব্যক্তি হয়ত চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে লাইনের উপরেই এসে পড়ে, তার পর ইঞ্জিনের সামনে লোহার জালে আটকা পড়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। এবং শেষটায় হয়ত ধাক্কা খেয়ে পাশে ছিটকে পড়েছে।

কিম্বা হয়ত রেল লাইনের উপরেই সে শুয়েছিল আত্মহত্যা করবার জন্য—শেষটায় ঐ অবস্থা হয়েছে।

আত্মহত্যা করে থাকলে, কোন প্রশ্ন নেই। এবং অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে থাকলেও লোকটা হয়ত চিৎকার করেছিল, সে চিৎকার হয়ত কেউ শুনতে পায়নি, এমন কি ইঞ্জিন-ড্রাইভারও শুনতে পায় নি। তা ছাড়া এ লাইন দিয়ে তো সাধারণত ট্রেন চলাচলও বড় একটা করে না।

কিম্বা হয়ত আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা কোনটাই নয়—কারণ ঠিক ঐখানে ঐভাবে এসে আত্মহত্যা করা বা দুর্ঘটনা ঘটা কোনটাই সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে না।

হয়ত ব্যাপারটা একটা মার্ডার কেস।

চলুন ফেরা যাক মিঃ চ্যাটার্জী—মৃণাল সেন বলে, মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আর একটা খোঁজ নেবেন তো—

কি বলুন তো !

রূপশ্রী কটন মিলে খোঁজ নেবেন গতকাল কোন ওয়াগন লোডিং হয়েছে কিনা—

নেবো।

হ্যাঁ—আরও একটা খোঁজ নেবেন।

কি ?

এ তল্লাটে এম. এন. রায় বলে কেউ আছেন কিনা—যদি থাকেন তার যথাসম্ভব পরিচয়—

বেশ—

পার্স টা যেটা মৃত ব্যক্তির জামার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল সেটা নিয়ে মৃণাল ফিরে এল।

পরের দিন—যেটুকু সূত্র হাতের মধ্যে আপাততঃ পাওয়া গিয়েছিল তার সাহায্যেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করে মৃণাল সেন।

ক্লাইভ রো—বেশী দূর নয়, লালবাজারের কাছেই।

প্রথমেই মৃণাল ক্লাইভ রোতে রায় এণ্ড কোম্পানির অফিসে গিয়ে হাজির হল। একটা বিরাট পাঁচতলা বিল্ডিং ৯৩ নং ক্লাইভ রোতে।

তিনতলায় রায় এণ্ড কোম্পানির অফিস।

বিরাট অফিস—দেখেই বোঝা যায়—বিরাট বিজনেস।

আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিল মৃণাল সেন—প্রধানত কয়লার খনি, ঐ সঙ্গে নানা জাতীয় কেমিকেলসএরও ব্যবসা করে রায় এণ্ড কোম্পানি।

এনকোয়ারীতে গিয়ে সন্ধান নিয়ে মৃণাল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার জন্য স্লিপ দিল বিশেষ জরুরী বলে।

॥ তিন ॥

একটু পরেই অফিস ম্যানেজার মিঃ মুখার্জীর ঘর থেকে মৃণালের ডাক এল।

মৃণাল বেয়ারার সঙ্গে গিয়ে ম্যানেজারের অফিসে প্রবেশ করল।

দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। মোটাসোটা বেশ ভারিক্কী

চেহারা। পরিধানে সাহেবী পোশাক—মুখে পাইপ। চোখে সুদৃশ্য ফ্রেমের চশমা।

বি সিটেড, প্লিজ!

মিঃ মুখার্জী কি একটা ফাইল দেখছিলেন—চোখ তুললেন না—মৃদুকণ্ঠে মৃণালকে বসতে বললেন।

মৃণাল বসল।

ফাইলটা দেখা শেষ হল একটু পরে—সেটা একপাশে ঠেলে রেখে মুখ তুলে তাকালেন মিঃ মুখার্জী।

ইয়েস মিঃ সেন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ—

আমি লালবাজার থেকে আসছি।

কথাটা বলে মৃণাল তার পরিচয় দিল।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মুখার্জীর ভ্রূ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। কয়েকটা মুহূর্ত মৃণালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেন, লালবাজার থেকে আসছেন—কি ব্যাপার বলুন তো?

মিঃ এম. এন. রায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে?

তিনিই কি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার?

হ্যাঁ—কিন্তু তিনি তো আজ এখনও অফিসে আসেন নি।

আসেন নি?

না—

ও—তা সাধারণতঃ কখন অফিসে আসেন তিনি?

ঠিক দশটায় আসেন—অত্যন্ত পাংচুয়াল তিনি—অথচ আজ প্রায় এখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেল এলেন না। তাই ভাবছিলাম—

অসুখ-বিসুখ করেনি তো!

না, না, মশাই—ভদ্রলোকের যদিও যাট বছর বয়স হল—কখনও আজ পর্যন্ত একটা দিনের জন্যও তাকে অসুস্থ হতে দেখিনি। তবে আগরপাড়ায় তাঁর বন্ধুর ওখানে গিয়ে যদি আটকে পড়ে থাকেন কোন কারণে—

আগরপাড়ায়—তিনি আগরপাড়ায় কাল গিয়েছেন নাকি? মৃণাল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

কোন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার কি?

না-না, তার এক বন্ধু আগরপাড়ায় থাকে! তার এক জরুরী চিঠি পেয়ে—

জরুরী চিঠি ?

হ্যাঁ—এক ভদ্রলোক গতকাল বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ চিঠিটা নিয়ে আসে—সেই চিঠি পড়ার পরই তিনি আমাকে বলেন—তিনি অফিসের পর আগরপাড়া যাবেন।

চিঠিটায় কি ছিল কিছু আপনি জানেন ?

চিঠিটা তিনি সঙ্গে নিয়ে যাননি—সম্ভবতঃ তাঁর টেবিলের উপরেই এখনও পড়ে আছে।

কি করে আপনি সে কথা জানলেন ?

আমি সে সময় তার ঘরে তার পাশেই বসেছিলাম—চিঠিটা তিনি পড়া হলে টেবিলের উপরেই রেখে দিলেন দেখল্যম—তারপর বের হয়ে গেলেন।

হুঁ—আচ্ছা দেখুন তো এই পার্স টা—বলতে বলতে মৃণাল সেন জলধর চাটুয্যের কাছ থেকে পাওয়া পার্স টা পকেট থেকে বের করে মিঃ মুখার্জীকে দেখান।

একি, এ তো মিঃ রায়েরই পার্স। এটা আপনি পেলেন কোথায় ?

আর ইউ সিয়োর—ঠিক জানেন ?

ঠিক জানি মানে—এ পার্স টা তার ৫৯তম বার্থ ডে'তে আমিই তাঁকে প্রেজেন্ট করেছিলাম যে—কিন্তু এ পার্স টা আপনি কোথায় পেলেন ?

মিঃ মুখার্জীর গলার স্বরে স্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ পায় যেন।

তাহ'লে আপনি নিঃসন্দেহে যে এ পার্স টা আপনাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এম. এন. রায়েরই—

হ্যাঁ—কিন্তু মিঃ সেন আপনি তো কই বললেন না, মিঃ রায়ের এ পার্স টা আপনি কোথায় পেয়েছেন ?

বলছি সব কিছুই, ব্যস্ত হবেন না মিঃ মুখার্জী—তার আগে একবার মিঃ রায়ের অফিস ঘরটা আমি দেখতে চাই—আর সেই চিঠিটা যদি পাওয়া যায় একবার সেটাও দেখব।

চলুন।

মিঃ মুখার্জী উঠে দাঁড়ান।

পাশের ঘরটাই ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের বসবার ঘর।

বেয়ারা দরজার গোড়ায় টুলের উপরে বসেছিল।

মিঃ মুখার্জীকে দেখে তাড়াতাড়ি সেলাম দিয়ে বলে, বড়া সাব্‌ তো আভি আয়া নেই সাব্‌ !

ঠিক হ্যায়—মুঝে মালুম হ্যায়।

মিঃ মুখার্জী মৃণাল সেনকে নিয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

টেবিলের উপরেই চিঠিটা পাওয়া গেল। একটা পেপার ওয়েট দিয়ে অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে চাপা দেওয়া রয়েছে চিঠিটা।

তুলে নিল হাতে মৃণাল সেন চিঠিটা।

চিঠিটা ইংরাজীতে টাইপ করা। পুরু সাদা লেটার প্যাডের কোণে ইংরাজী 'এম' অক্ষরটি মনোগ্রাম করা।

নীচে নাম সই করা, অ্যাফেকশনেটলি—ইওরস্ মণি।

চিঠিটার বাংলা তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়:

৩০।৩।৪১

প্রিয় মহেন,

অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না। ধন্যবাদ দিয়ে তোমায় ছোট করব না। তবে তোমার সৌজন্যে বর্তমানে আমার আরামেই কাটছে এখানে। সামনের শনিবার যদি একবার আসো তাহলে ভাল হয়—এবং আসবার সময় তোমার সেই চিঠিটা যদি আনো তাহলে আমরা ব্যাপারটা একটু আলোচনা করতে পারি, কারণ আমি গত পরশু ব্যাঙ্ক থেকে আমার চিঠিটা আনিয়েছি।

যদিও আগে তুমি কখনও এখানে আসনি, তাহলেও এখানে আসতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। ইচ্ছা করলে গাড়িতেও আসতে পার বা ট্রেনেও আসতে পার—তবে রাতটা কিন্তু ছাড়ছি না। গাড়িতে যদি আসো তাহলে স্টেশন থেকে উত্তর-মুখো যে পথটা গেছে সেই পথ ধরে এগিয়ে এলেই দেশবন্ধু কলোনীতে এসে পৌঁছুতে পারবে। আর ট্রেনে যদি আসো তো—একটা রিকশা নিয়ে ঐ পথটা দিয়ে আসতে পার।

স্টেশন থেকে দেশবন্ধু কলোনি প্রায় মাইলখানেক হবে। পথটা ধরে সোজা এগিয়ে এলে একটা রেস্তোরাঁ দেখবে—নামটা তার বিচিত্র—পান্থনিবাস—সেখানে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেও আমার 'সলিটারী কর্ণার' তারা দেখিয়ে দেবে।

ভালবাসা নিও—আসবে কিন্তু—আসা চাই-ই। আমি অপেক্ষা করব।

তোমার স্নেহধন্য—মণি

মৃণাল সেন চিঠিটা বার-দুই পড়ে ভাঁজ করে নিজের পকেটেই রেখে দিল, চিঠিটা আমি রাখলাম মিঃ মুখার্জী।

বেশ।

মিঃ মুখার্জী—মিঃ রায় গত পরশু নিশ্চয় তার গাড়ি নিয়েই গিয়েছেন?

না—

গাড়ি নিয়ে যাননি?

না—ট্রেনেই গিয়েছিলেন।

কেন—ট্রেন কেন ?

তার ড্রাইভার রামরূপ—বয়েস অনেক হয়েছে, রাত্রে ভাল করে চোখে দেখতে পায় না—তাই তিনি রাত্রে কখনও ওকে নিয়ে বেরুতেন না। কোথায়ও যেতে হলে ট্যাক্সিতেই যেতেন।

আশ্চর্য তো!

তাই। লোকটা বুড়ো হয়ে গিয়েছে। ভাল করে চোখে দেখে না। তবু তাকে ছাড়াবেন না। আমরা কতবার বলেছি একটা ভাল দেখে ড্রাইভার রাখুন। কিন্তু তিনি কারও কথাই শোনেন না। বলেন ও এতকাল আমার কাছে কাজ করল—এখনও চমৎকার গাড়ি চালায়—কেবল রাত্রে একটু কম দেখে—সেই অজুহাতে ওকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না এই বয়সে। সেটা অন্যায় হবে। তাছাড়া আমি তো রাত্রে বড় একটা বেরই হই না।

লোকটাকে খুব স্নেহ করেন মিঃ রায় মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ—রামরূপেরও স্যারের উপরে অগাধ ভালবাসা ও ভক্তি। তাছাড়া লোকটার আরও একটা গুণ হচ্ছে, অত্যন্ত বিশ্বাসী। অমন বিশ্বাসী লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না।

হুঁ—তাহলে তিনি ট্রেনেই গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর একটা কথা—মিঃ গাঙ্গুলী ওঁর বিশেষ বন্ধু বলেই মনে হয়—

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। তিন বন্ধু ছিলেন। এক বন্ধু গত হয়েছেন। এখন দুই বন্ধু আছেন মিঃ রায় আর আগড়পাড়ার ঐ মিঃ গাঙ্গুলী।

অনেক দিনের বন্ধুত্ব বুঝি ওঁদের ?

হ্যাঁ—মিঃ রায়ের মুখে শুনেছি ছোটবেলা থেকেই বন্ধু ছিলেন ওঁরা। মহেন্দ্রনাথ রায়, মণীন্দ্র গাঙ্গুলী আর ডাঃ নলিনী চৌধুরী।

নলিনী চৌধুরী নেই ?

না—

আচ্ছা মিঃ মুখার্জী—মিঃ গাঙ্গুলী যে চিঠির মধ্যে লিখেছেন কি একটা চিঠি কথা—তিনি ব্যাংক থেকে নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে কিছু জানেন ?

জানি, সে এক মজার ব্যাপার—

কি রকম ?

তাহলে আপনাকে ঐ চিঠির ব্যাপারটা মোটামুটি বলতে হয় ! ঐ তিন বন্ধুর মধ্যে মিঃ রায়ের অবস্থাই সব চাইতে ভাল তাঁর ব্যবসার দৌলতে।

এ ব্যবসা কি তাঁরই হাতের ?

না।

তবে ?

তাঁর বাপেরই তৈরী বিরাট লাভবান ব্যবসা। অবশ্য তাঁর পরিশ্রমও এতে কম নেই—

মিঃ মুখার্জী বলতে লাগলেন—মণীন্দ্র গাঙ্গুলী সিংগাপুরে ভাল চাকরি করতেন। যুদ্ধ বাধার পর বোমা পড়তে শুরু হলে সেখান থেকে কোনমতে নিঃস্ব কপর্দকহীন অবস্থায় প্রাণটা মাত্র হাতে করে মালয় ও বর্মা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেশে ফিরে আসেন। এসে কিছুদিন আমাদের স্যারের বালীগঞ্জের বাড়িতেই ছিলেন। তারপর স্যারের কাছ থেকেই কিছু টাকা নিয়ে আগরপাড়ায় দেশবন্ধু কলোনীতে একটা জায়গা কিনে ছোট একটা বাড়ি করে বসবাস করছেন। ডাঃ নলিনী চৌধুরী—তিন বন্ধুর মধ্যে একটু খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন বরাবর। নিজের ছোটখাটো একটা ল্যাবোরেটারী ছিল, সেখানে সর্বক্ষণ বসে বসে রিসার্চ করতেন। মাস কয়েক হল তিনি মারা গেছেন ব্লাড-ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে—

তাঁর ছেলেমেয়ে নেই ?

না, মিঃ চৌধুরী ও মিঃ গাঙ্গুলী বিয়েই করেননি। দুজনেই ব্যাচিলার।

চিঠির কথা কি বলছিলেন—

ডাঃ চৌধুরীর এক দাদা হেমন্ত চৌধুরী ছিলেন বর্মায়। শোনা যায়, যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও দেশে ফিরে আসেন। এবং আসবার সময় নাকি প্রভূত অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। যাহোক, এসে তিনি শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। এবং দেশে ফিরে আসার মাস আষ্টেক পরে হঠাৎ একদিন রাত্রে ঘরের মধ্যে সর্পদংশনে তাঁর মৃত্যু হয়।

সর্পদংশনে মৃত্যু !

সেই রকমই শুনেছি। ডাঃ চৌধুরীর দাদা তাঁর মৃত্যুর দিন দশেক আগে ডাঃ চৌধুরী—তাঁর ছোট ভাইকে শ্রীরামপুরের বাড়িতে ডেকে পাঠান, এবং ঐ সময়ই তিনি তাঁর ছোট ভাইকে প্রথম বলেন যে বর্মা থেকে আসবার সময় তিনি প্রভূত অর্থ নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। সেই অর্থ তিনি তাঁর ভাইকে দিয়ে যেতে চান—সেই অর্থ দিয়ে

যেন ডাঃ চৌধুরী তাঁর আজন্মের বাসনা—মনের মত একটা ল্যাবোরেটারী তৈরী করে তাঁর ইচ্ছামত রিসার্চ চালিয়ে যান।

তারপর—

কিন্তু তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হল না। দাদার মৃত্যুর মাস কয়েক আগে থাকতেই ডাঃ চৌধুরীর শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। দাদার মৃত্যুর দিন পনের-কুড়ি বাদে হঠাৎ ধরা পড়লো তাঁর লিউকিমিয়া, ব্ল্যাড ক্যানসার হয়েছে—ডাঃ চৌধুরী শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। মিঃ রায় সে সময় ইউরোপে। প্রত্যহই প্রায় তিনি খোঁজ নিতেন মিঃ রায় ফিরেছেন কিনা। মিঃ রায়ের ইউরোপ থেকে ফিরবার আগেই ডাঃ চৌধুরীর মৃত্যু হল। ডাঃ চৌধুরীর মৃত্যুর দিন পনের বাদে মিঃ রায় দেশে ফিরে এলেন এবং তাঁর ফিরে আসবার কয়েকদিন পরেই একদিন অফিসে ডাঃ চৌধুরীর ল-এডভাইসার কালীপদবাবু মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে দুখানা চিঠি তাঁর হাতে দিলেন। একখানা তাঁর নামে, অন্যটা তাঁদের বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলীর নামে। এবং চিঠি দুটো দিয়ে তিনি বললেন, তাঁর মৃত ক্লায়েন্টের নির্দেশমতই তিনি ঐ চিঠি দিলেন।

॥ চার ॥

তারপর?

মিঃ মুখার্জী বলতে লাগলেন—

মিঃ রায়ের মুখেই শোনা আমার কথাগুলো। ডাঃ চৌধুরীর দুখানা চিঠি এক, স্যারের নামে, অন্যখানা মিঃ গাঙ্গুলীর নামে। চিঠিতে ছিল—বরাবরের তাঁর ইচ্ছা ছিল বিরাট একটা ল্যাবোরেটারী গড়ে তুলবেন কিন্তু অর্থের জন্য পারেন নি—শেষটায় সেই অর্থ এল যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়—যাই হোক, সেই অর্থের দায়িত্ব তিনি তাঁর দুই বন্ধুর হাতে যৌথভাবে তুলে দিয়ে গেছেন। ব্যাংক থেকে চিঠি নিয়ে তাঁরা যেন ঐ অর্থ দিয়ে ভাল একটা ল্যাবোরেটারী তৈরী করেন। ভারটা অবিশ্যি তিনি তাঁর ভাগ্নের হাতেও দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু কেন যে দেন নি তা তিনিই জানেন—যদিও তাঁর নিজস্ব ল্যাবোরেটারীটা তিনি ঐ ভাগ্নেকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্নেকে তিনি ভালও বাসতেন যথেষ্ট এবং ঐ ভাগ্নে তার সঙ্গেই বরাবর কাজও করেছে।

তবে দিলেন না কেন?

তা জানি না। হয়ত বন্ধুদের মত বিশ্বাস করতেন ভাগ্নেকে ততটা করতেন না।

আচ্ছা, আপনি বলছেন বিপুল অর্থ নাকি ডাঃ চৌধুরীর ভাই হেমন্ত চৌধুরী বর্মা থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন—সে অর্থ কত ?

সে এক মশাই বিচিত্র ব্যাপার।

কি রকম ?

ডাঃ চৌধুরীর ভাই হেমন্ত চৌধুরীর বিপুল অর্থের কথাই শুনেছি কিন্তু সে কি নগদ টাকাকড়ি না অন্য কিছু তাও এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নি। এবং সেই অর্থ কোথায় আছে—আদৌ আছে কিনা—কি ব্যাপার—সেও একটা যেন রহস্যের মত।

কি রকম ?

আপনাকে তো আগেই বলেছি, ডাঃ চৌধুরী মানুষটা যেমন খেয়ালী তেমনি রহস্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁর চিঠির মধ্যে ছিল ব্যাংক থেকে নির্দেশ নিতে তাঁর অর্থ সম্পর্কে। ব্যাংকে খোঁজ করতে দেখা গেল—

কি—

দু বন্ধুর নামে দুখানা চিঠি আছে আলাদা আলাদা ভাবে—এবং সে চিঠির মধ্যে কতকগুলো অঙ্ক পর পর বসানো কেবল।

অঙ্ক !

ল্যাবে.হ্যাঁ—সে চিঠি আমিও মিঃ রায়ের কাছে দেখেছি। আর একটা জিনিস—

তিনি যা ?

তঃচিঠির কাগজটা কোণাকুনি ত্রিকোণাকার ভাবে যেন কাঁচি দিয়ে কাটা।

না.স আবার কি।

f তাই—আর সম্ভবতঃ ঐ চিঠির কথাই লিখেছেন মিঃ গাঙ্গুলী আমাদের স্যারের কাছে এবং চিঠির ব্যাপারটা আলোচনার জন্যই হয়ত ডেকেছেন—কিন্তু মিঃ সেন এখনও আপনি বললেন না তো—স্যারের ব্যাগটা আপনি কোথায় পেলেন ?

মিঃ মুখার্জী—আমি অতীব দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি মিঃ রায় বোধ হয় আর বেঁচে নেই।

সে কি ! বিস্ময়ে মিঃ মুখার্জী যেন একেবারে থ হয়ে যান।

হ্যাঁ—যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় ট্রেন-অ্যাক্সিডেণ্টে সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

না, না—আই কান'ট্ বিলিভ ইট—এ যে কিছুতেই আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না—

মৃণাল সেন অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ডেড বডিটা এখনও মর্গেই

আছে—আইডেন্টিফিকেশন-এর জন্য আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। ভাল কথা, তাঁর ছেলেমেয়ে আছে তো—তাঁর স্ত্রী—

অনেক দিন আগেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

স্ত্রী তাহলে নেই ?

না।

ছেলেমেয়ে ?

দুই ছেলে এক মেয়ে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

সম্পর্ক ছিল না !

না। অল্প বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়—তারপর থেকেই তাঁর ছেলেমেয়েরা তাদের মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে—যদিও মোটা একটা মাসোহারা বরাবরই তাদের জন্য গেছে কোম্পানী থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত।

ছেলেমেয়েরা এখনও কি তাদের মামার বাড়িতেই আছে ?

না—বড় ছেলে সৌরীন্দ্র ডাক্তার—বর্তমানে সে ইস্টার্ণ ফ্রণ্টে ইমারজেন্সী কমিশনে আছে—ক্যাপ্টেন। ছোট ভবেন্দ্র—সে বি-কম্ পাস করতে না পেরে বছর খানেক হল—সেও বাপের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে চাকরি নিয়েছে। বেরিলী না কোথায় আছে যেন—শুনেছি—সুবেদার মেজর—

আর মেয়ে !

মেয়ে কুন্তলা বছর দেড়েক হল স্বামীর মৃত্যুর পর বাপের কাছে চলে এসেছে। এম-এ পড়ে—

বাড়িতে তাহলে ঐ এক মেয়ে আর তিনিই ছিলেন ?

না—আর একজন ছোট ভাই আছেন মিঃ রায়ের।

ভাই—

হ্যাঁ সুরেন্দ্রনাথ। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেনি। আর্ট স্কুল থেকে পাস করে এখন একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। অত্যন্ত বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ।

হুঁ—তাহলে তো দেখছি একমাত্র আপনি ছাড়া আর উপায় নেই। চলুন আপনাকে দিয়েই মৃতদেহ আপাতঃ আইডেন্টিফাই করিয়ে নেওয়া যাক। হ্যাঁ আর একটা কথা—আপাততঃ অফিসে কাউকে ব্যাপারটা জানাবেন না কিন্তু—

বেশ।

অফিসের গাড়িতেই দুজনে বের হয়।

পথে যেতে যেতে এক সময় মৃণাল শুধায়, মিঃ মুখার্জীর, মিঃ রায়ের কোন উইল আছে কিনা জানেন ?

হ্যাঁ—কিছুদিন আগেই তিনি উইল করেছেন। আমি উইলের একজন সাক্ষী।

তাহলে তো উইল সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু জানেন ?

জানি। কিন্তু সে সম্পর্কে আপাততঃ কিছু আপনাকে আমি বলতে পারছি না বলে দুঃখিত।

বলতে পারছেন না কেন ?

সেই রকম নির্দেশই আছে—আর সত্যিই যদি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে, কাল-পরশুই তো সব জানতে পারবেন উইলের ব্যাপারে।

মৃণাল সেন আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

মিঃ মুখার্জীই আবার এক সময় প্রশ্ন করেন, আচ্ছা মিঃ সেন, অ্যাকসিডেণ্টে মিঃ রায়ের মৃত্যু হয়েছে বলছেন—ট্রেনে কাটা পড়েছেন কি ?

তা এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। মৃণাল সেন বলে।

মর্গে গিয়ে মৃতদেহ দেখবার পর মিঃ মুখার্জী কেঁদে ফেললেন। মুখটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও মুখার্জীর চিনতে কষ্ট হয় না মানুষটাকে !

বললেন, মৃতদেহটা তাঁর মনিবেরই বটে।

মিঃ মুখার্জীকে বিদায় দিয়ে মৃণাল সেন লালবাজারে ফিরে এল।

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন কলকাতার ইংরাজী ও বাংলা সমস্ত দৈনিক কাগজেই লক্ষপতি বিজনেস্ ম্যাগনেট্—রায় এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মাহেন্দ্রনাথ রায়ের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদটা তাঁর ফটোসহ প্রকাশিত হল।

মহেন্দ্রনাথ যে কেবল লক্ষপতি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন তাই নয়—তাঁর দান-ধ্যানও যথেষ্ট ছিল এবং একজন দেশকর্মী বলেও তাঁর পরিচয় ছিল।

সকাল তখন নয়টা হবে।

মৃণাল তার অফিস কামরায় ঢুকতে যাচ্ছে, সার্জেণ্ট সাহা এসে বললে, স্যার আপনাকে ডি. সি. মিঃ চক্রবর্তী দু'বার খোঁজ করেছেন।

মৃণাল কোন কথা না বলে ডি. সি-র ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ডি. সি.-র পাশেই একজন মধ্যবয়সী যুবক বসে ছিল—কালো সুশ্রী চেহারা। মৃণাল ঘরে ঢুকতেই বললেন, এই যে মৃণাল, এস পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি সুব্রত রায়।

সুব্রতকে না দেখলেও তার নামের সঙ্গে মৃণালের যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

সে হাত তুলে সুব্রতকে নমস্কার জানায়।

অতঃপর মিঃ চক্রবর্তী বললেন, কালকের সেই অ্যাক্সিডেণ্ট কেসটা- মহেন্দ্রনাথের ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে উনি জানতে চান—ডিটেলস্-এ।

সুব্রত ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলে, চলুন মিঃ সেন, আপনার অফিস ঘরে যাওয়া যাক।

বেশ তো চলুন।

দুজনে এসে মৃণালের অফিস ঘরে বসে।

আপনি কেসটা সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড নাকি সুব্রতবাবু? মৃণাল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—

কি ব্যাপার বলুন তো? সংবাদপত্রে news-টা পড়েই কি—

তা ঠিক নয়।

তবে?

আপনি বোধ হয় জানেন মৃত ঐ মিঃ রায়ের একটি ছোট ভাই আছে!

আপনি সুরেন্দ্রনাথের কথা বলছেন তো?

হ্যাঁ—

তাঁকে আপনি চেনেন?

হ্যা—তার সঙ্গে আমার অনেক দিন থেকেই পরিচয়। সে-ই আমায় কাল রাত্রে টেলিফোন করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলে।

কি বলেছেন তিনি?

তার ধারণা ব্যাপারটা ঠিক একটা অ্যাকসিডেণ্ট নয়, ওর মধ্যে সুনিশ্চিত একটা কোন ফাউল প্লে আছে।

ফাউল প্লে?

হ্যাঁ—সে বলতে চায় এ আত্মহত্যাও নয়—দুর্ঘটনাও নয়—তাঁকে অর্থাৎ তার দাদাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছে।

কেন? হঠাৎ তাঁর একথা মনে হল কেন? আপনাকে তিনি বলেছেন কিছু সে সম্পর্কে?

সে বলতে চায়—তাঁর মত মানুষ আত্মহত্যা করতে পারেন না কিছুতেই।

কেন ?

তাছাড়া সে বলতে চায় আত্মহত্যা হঠাৎ করবার মতন তাঁর কোন কারণ ছিল না।

কারণ ছিল না তিনি বুঝলেন কি করে ?

সুব্রত হেসে বলে, তা তো জানি না। তবে সে বলতে চায়—তার দাদার কোন অর্থের অভাব বা দুশ্চিন্তা ছিল না। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। খুব ভাল করে না ভেবে কখনও তিনি কোন কাজ নাকি করতেন না। অবিশ্যি ছেলেদের ব্যাপারে তাঁর মনে একটা অশান্তি ছিল, তবে সে অশান্তি কোন দিনই তাঁকে তেমন বিচলিত করতে পারেনি।

হুঁ—তা ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেণ্টও নয় যে, তাই বা তিনি বুঝলেন কি করে ?

যে লোক তার মতে অত্যন্ত সাবধানী, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু কখনও করেননি, অমন একটা অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যাবেন আদৌ নাকি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তাহলে তাঁর ধারণা—ইট'স্ এ কেস অফ মার্ডার—হোমিসাইড—

সুব্রত পুনরায় মৃদু হেসে বলে, কতকটা তাই সে বলতে চায়।

সুব্রতবাবু, কেন এখনও ঠিক বলতে পারছি না—আমারও কিন্তু ঠিক তাই ধারণা।

মানে!

আমারও কেন যেন মনে হচ্ছে ঐ ব্যাপারটার মধ্যে কোন ফাউল প্লে আছে।

আপনারও মনে হয় ব্যাপারটার মধ্যে ফাউল প্লে আছে মিঃ সেন ?

হ্যাঁ।

কেন বলুন তো ?

মৃণাল সেন সংক্ষেপে তখন গতকালের ব্যাপারটা পুনরাবৃত্তি করে।

সব শোনবার পর সুব্রত বলে, পোস্ট মর্টেম্ তো আজ হবে ?

হ্যাঁ—মোটামুটি একটা রিপোর্ট হয়ত আজই পেয়ে যাব।

তারপর একটু থেমে মৃণাল সেন ডাকে, সুব্রতবাবু ?

উঁ—

সব তো শুনলেন, আপনার কি মনে হচ্ছে ?

ব্যাপারটা সহজ বা স্বাভাবিক নয়, এইটুকু বলতে পারি আপাততঃ আপনাকে।

অ্যাক্সিডেণ্ট বা আত্মহত্যা নয় ?

তাই তো মনে হয়।

কেন ?

আপনি বলেছেন মৃতের মুখটা এমন ক্ষতবিক্ষত ছিল যে চেনবার উপায় ছিল না।

হ্যাঁ।

ট্রেনের চাকার তলায় আত্মহত্যা করলে বা অ্যাক্সিডেণ্ট হলে অমন করে মুখটা মিউটিলেটেড হবে কেন?

একজ্যাক্টলি—আমারও তাই মত। কিন্তু আমি ঠিক এখনও বুঝতে পারছি না সুব্রতবাবু, অনুসন্ধানের ব্যাপারটা কি ভাবে কোথা থেকে শুরু করব—

মোটামুটি একটা পোস্টমর্টেম্ রিপোর্ট তো আজই আপনি পাবেন। হয়ত সেই রিপোর্টেই কিছু পাওয়া যাবে।

আপনি তাই মনে করেন?

দেখুন না, যেতেও পারে। তাহলে এখন আমি উঠি মিঃ সেন, রিপোর্টটা পেলেই কিন্তু আমাকে জানাবেন।

নিশ্চয়ই।

॥ ছয় ॥

সেই রাত্রেই মৃণাল সেন সুব্রতর গৃহে এসে হাজির হল।

কি ব্যাপার! মনে হচ্ছে আপনি যেন একটু উত্তেজিত—সুব্রত বলে।

আপনার কথাই ঠিক সুব্রতবাবু। মৃণাল জবাবে বলে, মৃত ব্যক্তির ব্রেনের মধ্যে রিভলভারের গুলি পাওয়া গিয়েছে একটা।

তাহলে তো আপনার অনুমানই ঠিক হল। অ্যাক্সিডেণ্ট বা সুইসাইড নয়। ডেফিনিটলি এ কেস অফ মার্ডার—হোমিসাইড্।

সুব্রত ধীরে ধীরে কথাগুলো বললে।

হ্যাঁ। কিন্তু—

চলুন কাল সকালেই একবার আগরপাড়ায় দেশবন্ধু কলোনীতে যাওয়া যাক।

দেশবন্ধু কলোনীতে!

হ্যাঁ—মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার মিঃ রায় যখন তাঁর চিঠি পেয়ে সেখানে গিয়েই নিহত হয়েছেন।

বেশ—তাহলে কাল সকালেই আমি আসব।

মৃণাল সে রাত্রের মত বিদায় নেয়।

পরের দিন বেলা প্রায় নটা নাগাদ সুব্রতসহ মৃণাল সেন আগরপাড়া থানায় গিয়ে জলধরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দেশবন্ধু কলোনীর দিকে রওনা হল। অবশ্য সুব্রতর গাড়িতেই।

নতুন কলোনী। সবে গড়ার মুখে। এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে খান পনের-ষোল বাড়ি উঠেছে। কাঁচা রাস্তা।

কলোনীর একেবারে শেষপ্রান্তে খোলা মাঠের একধারে ছোট একতলা একটা সাদা রঙের বাড়ি, সলিটারী কর্ণার। সামনে ছোট একটা বাগান। লোহার গেট। গেটের একপাশে লেখা সলিটারী কর্ণার, অন্য পাশে এস গাঙ্গুলী লেখা নেম-প্লেট।

লোকটি সাহেবী-ভাবাপন্ন বোঝা যায়।

গেটের পরেই লাল সুরকীর রাস্তা। তার দু'পাশে মেহেদীর কেয়ারী। শীতের রৌদ্রে ঘন সবুজ দেখায়।

গেটের বাইরেই গাড়ি রেখে সুব্রত, মৃণাল ও জলধর চাটুয্যে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

সামনেই একটা বারান্দা। কয়েকটি বেতের চেয়ার ও টেবিল পাতা। পর পর ঘরগুলো দেখা যায়। তিনটে দরজা। দুটো বন্ধ, অন্যটায় একটা ঘন নীল রঙের পর্দা ঝুলছে।

ওরা ডাকবে কি ডাকবে না ইতস্তত: করছে এমন সময় মধ্যবয়সী একটা ভৃত্য বের হয়ে এল পর্দা তুলে ঘর থেকে।

পরনে তার পরিষ্কার ধুতি ও ফতুয়া।

কাকে চান?

মিঃ গাঙ্গুলী বাড়িতে আছেন?

হ্যাঁ। সাহেব বাড়িতেই আছেন।

জলধর চাটুয্যেই কথা বললেন, সাহেবকে খবর দাও, বলগে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন, দেখা করতে চান।

সাহেব তো এসময় কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

বল গিয়ে থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছেন।

ভৃত্য এবার আর কোন প্রতিবাদ করল না। ওদের বাইরের ঘরে বসিয়ে ভিতরে খবর দিতে গেল।

ছোট ড্রইংরুম কিন্তু পরিপাটি ভাবে সাজানো।

গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দেয়।

একটু পরেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। পরনে পায়জামা

ও ড্রেসিং গাউন। পায়ে চপ্পল। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হবে। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল কিন্তু বেশীর ভাগই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। মুখখানা রুক্ষ। চোয়ালের হাড় দুটো 'ব'-এর আকারে দুপাশে ঠেলে উঠেছে। চোখ দুটো ছোট ছোট কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত। লম্বা বলিষ্ঠ দেহের গড়ন। বুকের ও হাতের পেশীগুলো সজাগ। দৈহিক শক্তিরই পরিচয় দেয়।

আপনারা—ভদ্রলোকই প্রশ্ন করলেন।

কথা বললেন জলধর চাটুয্যে, আপনিই বোধ হয় মিঃ গাঙ্গুলী?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা—

আমি এখানকার থানার ও. সি. আর ইনি লালবাজার থেকে আসছেন, ইন্সপেক্টার মৃণাল সেন। জলধর চাটুয্যে বললেন।

মিঃ গাঙ্গুলীর চোখের দৃষ্টি কুঞ্চিত হল যেন।

আমার কাছে কি কোন দরকার ছিল?

হ্যাঁ। নচেৎ আসব কেন বলুন! মৃদু হেসে জলধর চাটুয্যে বলেন কথাটা।

কি দরকার বলুন তো।

বসুন!

মিঃ গাঙ্গুলী বসলেন একটা সোফায়।

বলুন।

মিঃ গাঙ্গুলী, কলকাতার রায় এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ এম. এন রায়কে আপনি তো চেনেন? কথাটা বলে মৃণাল সেনই।

হ্যাঁ—সে আমার বিশেষ বন্ধু। কিন্তু কি ব্যাপার?

আপনার এখানে গত শনিবার তাঁর আসার কথা ছিল, মানে আপনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন! কথা বলে এবারে সুব্রত।

আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম মহেন্দ্রকে?

হ্যাঁ—চিঠি দিয়ে?

হোয়াট ননসেন্স—আমি আবার তাকে কবে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালাম!

সে কি! আপনি ডেকে পাঠাননি চিঠি দিয়ে? সুব্রত কথাটা পুনরাবৃত্তি করে।

মোটেই না—

সুব্রত এবার চিঠিটা বের করে দেয়।—দেখুন তো এই চিঠিটা।

চিঠিটা গাঙ্গুলী হাতে করে নিয়ে দেখলেন। পড়লেন, তারপর বললেন, ফানি! এ চিঠি আপনারা কোথায় পেলেন?

এ চিঠি আপনার লেখা তো ?

কস্মিনকালেও নয়।

আপনার নয় ?

নিশ্চয়ই নয়। প্রথমতঃ আমার বাড়িতে কোন টাইপরাইটিং মেসিন নেই। দ্বিতীয়তঃ টাইপ করতেই আমি জানি না আর এ যদিও হুবহু প্রায় নকল করার চেষ্টা হয়েছে তবু এটা আমার সই নয়। কিন্তু এ চিঠি কোথা থেকে আপনারা পেলেন ?

বলছি—

আচ্ছা মিঃ রায়ের সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কবে হয়েছিল ?

গত মাসে। মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় গিয়েছিলাম একটা কাজে। সেখানে অফিসে গিয়ে দেখা করি।

তারপর আর দেখা হয়নি ?

না।

তাঁর কোন খবরও জানেন না ?

না। কিন্তু কি ব্যাপার ! এনিথিং রং।

গতকালের সংবাদপত্র পড়েন নি ?

সংবাদপত্র আমি পড়ি না। কিন্তু ব্যাপার কি ?

গত শনিবার আপনার বন্ধু মিঃ রায় এখানে এই আগরপাড়ার কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

হোয়াট ! কি—কি বললেন ? গাঙ্গুলী যেন অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন, মহেন্দ্র খুন হয়েছে ! সে নেই—না, না—এ আপনি কি বলছেন !

দুঃখের সঙ্গেই বলছি কথাটা মিথ্যা নয় মিঃ গাঙ্গুলী।

আমার—আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ইন্সপেক্টার। মহেন্দ্র হ্যাজ বিন কিল্ড ! আর আমারই বাড়ি থেকে কিছু দূরে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে !

আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী—সুব্রত এবার কথা বলে।

কিন্তু মিঃ গাঙ্গুলী কোন সাড়া দিলেন না। আপন মনেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, নলিনী আগেই গেছে। মহেন্দ্রও চলে গেল। বাকী রইলাম আমি। বুঝতে পারছি আমারও যাবার সময় হয়েছে। আমার দিনও হয়ত ফুরিয়ে এসেছে।

॥ সাত ॥

মিঃ গাঙ্গুলী—

আবার ডাকে সুব্রত।

জানেন ইন্সপেক্টার, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আমাদের—নলিন গেল ক্যানসারে আর মহেন গেল পিস্তলের গুলিতে।

আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী—ঐ চিঠিটার মধ্যে যে একটা চিঠির কথা আছে—

হ্যাঁ—ঐ এক বিচিত্র ব্যাপার।

কি রকম!

চিঠিটা আমি ব্যাঙ্ক থেকে দিন সাতেক হল এনেছি। চিঠি ঠিক বলব না। একটা ত্রিকোণাকার কাগজের টুকরোর মধ্যে পর পর কতগুলো অঙ্ক বসানো।

অঙ্ক!

হ্যাঁ।

দেখতে পারি চিঠিটা?

হ্যাঁ বসুন, আনছি।

মিঃ গাঙ্গুলী ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে হাতে একটা সিলমোহর ভাঙা লম্বা লেফাফা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

এই দেখুন, এর মধ্যেই আছে সে কাগজ।

সুব্রত হাত বাড়িয়ে লেফাফাটা নিল—উপরে ইংরাজীতে লেখা—মণীন্দ্র গাঙ্গুলী কোণে লাল কালিতে লেখা 'পারসোন্যাল'।

সুব্রত খাম থেকে কাগজটা বের করল।

মিথ্যে নয়, সত্যিই ত্রিকোণাকার একটা কাগজ এবং তার মধ্যে পর পর কতক গুলো অঙ্ক বসানো। আর নীচের কোণে ইংরাজীতে লেখা এ্যালফাবেট্!

মিঃ গাঙ্গুলী বলেন, দেখলেন তো, আমি তো মশাই ওর মাথা মুণ্ডু অর্থ কিছু খুঁজে বের করতে পারিনি। অথচ মজা কি জানেন, নলিনের মত লোক মরার আগে যে আমাদের সঙ্গে একটা ঠাট্টা-তামাসা করে গিয়েছে তাও ভাবতে পার যায় না।

আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী!

বলুন।

মহেন্দ্রবাবুর চিঠিটা আপনি দেখেছেন?

হুঁ—দেখছি বৈকি, সেটাও ঠিক অমনিই একটা ত্রিকোণ কাগজে এমনি কতক-গুলো অঙ্ক লেখা।

আপনার মনে আছে চিঠির অঙ্কগুলো ?

না মনে নেই, তবে—

তবে!

আমি একটা কাগজে অঙ্কগুলো টুকে এনেছিলাম।

কেন ?

কারণ ভেবেছিলাম—মানে তখনও তো আমার চিঠিটা আমি দেখিনি, যদি ঐ অঙ্কগুলোর কোন অর্থ বা সূত্র আমার চিঠি থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ সে লিখেছিল আমরা যৌথভাবে যেন তার অর্থের দায়িত্ব নিই।

সে কাগজটা আছে ?

আছে। দেখবেন ?

আনুন তো।

মিঃ গাঙ্গুলী ভিতরে গিয়ে একটা মোটা অমনিবাস ডিটেকটিভ গল্পের বই নিয়ে এলেন। তার মধ্যেই কাগজটা ছিল।

কাগজের মধ্যে অমনি কতগুলো অঙ্ক।

এবং সেটাও যদিও ত্রিকোণাকার—হয়ত এমনি হবে।

সুব্রত পাশাপাশি দুটো কাগজ রেখে একবার দুবার তিনবার লেখাগুলো পড়ল, অঙ্কগুলোর কোন অর্থ যদি বের করা যায়। কিন্তু কোন হদিসই যেন পায় না সুব্রত।

পারবেন না মশাই, পারবেন না। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন, আমিও অনেক ভেবেছি দু দিন দু রাত ; কিন্তু কোন হদিসই করতে পারিনি।

আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন কি আপনার বন্ধুর হাতে অনেক টাকা ছিল!

করি—কারণ নলিন ছিল যেমন সত্যবাদী তেমনি সিরিয়াস টাইপের মানুষ এবং মধ্যে মধ্যে তার অসামান্য চরিত্রের মধ্যে যেন একটা সহজ কৌতুক প্রকাশ পেত।

কৌতুক !

এটা আর কৌতুক ছাড়া কি বলুন তো—

আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী !

বলুন !

আপানাদের এই চিঠির ব্যাপার আর কেউ জানে ?

না। আমরা দুই বন্ধু ছাড়া আর কে জানবে!

আচ্ছা ডাঃ চৌধুরীর আপনার বলতে তো তাঁর একমাত্র ভাগ্নে ডাঃ নীরেন সান্যাল। এবং তিনিই তো ডাঃ চৌধুরীর সব কিছু পেয়েছেন?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই?

থাকবে না কেন! ভেরি নাইস বয়—যেমন ভদ্র তেমনি বিনয়ী—

তিনি আপনার বন্ধুর এই চিঠির কথা জানতেন না?

না।

আপনারাও বলেননি?

না, প্রয়োজন মনে করিনি।

কেন প্রয়োজন বোধ করেননি?

কারণ তাকে যদি নলিনীর জানাবার ইচ্ছাই থাকত তবে আমাদের দুই বন্ধুকেই বা কেন এত সাবধানতার সঙ্গে ব্যাপারটা জানিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আমাদের দুজনকে ছাড়া আর কেউ জানুক তার ইচ্ছা ছিল না।

আচ্ছা আপনি কি সত্যিই মনে করেন মিঃ গাঙ্গুলী চিঠির এই অঙ্কগুলোর মধ্যে থেকে আপনার বন্ধু মিঃ রায়ও কোন কিছু বের করতে পারেননি—?

না। আমি বা মহেন্দ্র কেউ ওর কোন মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।

আচ্ছা একটা কথা মিঃ গাঙ্গুলী, সুব্রত আবার প্রশ্ন করে, আপনি ও মহেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই মিঃ চৌধুরীর ঐ চিঠির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন?

তা করেছি।

তাহলে সে-সময়ও তো কেউ আপনাদের আলোচনা শুনে চিঠির ব্যাপারটা জানতে পারে—

সে আর এমন অসম্ভব কি—

আর একটা কথা মিঃ গাঙ্গুলী—

বলুন—

আপনি তো মধ্যে মধ্যে বাড়ি থেকে বের হন!

বিশেষ না—তবে—

তবে—

মধ্যে মধ্যে কলোনীতে যে পান্থনিবাস রেস্টুরেন্টটা আছে—সেখানে গিয়ে বসি—পান্থনিবাসের প্রোপ্রাইটার ঋষি লোকটা চমৎকার কফি বানায়—সেই কফির লোভে

মধ্যে মধ্যে সেখানে যাই। তাছাড়া কোথাও বড় একটা আমি যাই না।

সাধারণতঃ কখন রাত্রে শোন?

তা রাত দশটা।

সেদিন, মানে শনিবারও রাত দশটায়ই শুতে গিয়েছিলেন?

না, সেদিন একটু আগেই যাই, রাত সাড়ে ন'টায়। বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে ক'দিন। সেদিন আবার ঠাণ্ডাটা একটু বেশীই পড়েছিল।

তাই। আচ্ছা সেদিন পান্থনিবাসে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কতক্ষণ ছিলেন?

সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। দোকানে লোকজন ছিল না তেমন। আমি আর ঋষি বসে বসে গল্প করছিলাম।

ঋষির সঙ্গে আপনার তাহলে বেশ আলাপ আছে?

তা আছে। আঠার বছর বয়সের সময় লোকটা জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত যায়। সেখানে বছর চল্লিশ ছিল। তারপর বিশ্রী একটা খুনের মামলার জড়িয়ে পড়ে ও আর ওর বর্মিনী স্ত্রী—

বর্মিনী স্ত্রী নাকি লোকটার?

হ্যাঁ। মালার বাবাও বিলেতে মশলার একটা দোকান করেছিল। সেখানে চাল ডাল সব কিছু পাওয়া যেত। ঋষি ঐ দোকানে চাল ডাল কিনতে যেত, দুজনায় আলাপ হয়—তারপর বিয়ে হয়।

তারপর ঋষির কথা বলুন। কি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল বলছিলেন?

হ্যাঁ—অ্যারেস্ট হবার আগেই সে ও তার বর্মিনী স্ত্রী কৌশলে বিলেত থেকে পালায়—তারপর হংকং হয়ে যুদ্ধের ঠিক শুরুতে ইণ্ডিয়াতে এসে পৌঁছায়। তারপর এখানে এসে ঘুরতে ঘুরতে আগরপাড়ার এই কলোনীতে একটা জায়গা কিনে ছোট একটা বাড়ি করেছে। সেই বাড়িরই বাইরের অংশে একটা রেস্তোরাঁ খুলেছে। রেস্তোরাঁর প্রধান আকর্ষণই ঐ কফি—

হু—তাহলে আপনি সেদিন ছটার পর ফিরে আসেন—সোজা বাড়িতেই তো আসেন?

না—একটু এদিক ওদিক ঘুরেছি। ঠাণ্ডা চিরদিনই আমার ভাল লাগে।

কখন তাহলে ফিরলেন বাড়িতে?

রাত সোয়া আটটা প্রায়।

আচ্ছা আজ তাহলে আমরা উঠব মিঃ গাঙ্গুলী, হয়ত আবারও আপনাকে বিরক্ত করতে আসতে পারি। মৃণাল সেন বলল।

না, না—বিরক্ত কি—আসবেন—নিশ্চয়ই আসবেন—ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

॥ আট ॥

সবাই উঠে পড়েছিল, হঠাৎ সুব্রত বলে মিঃ গাঙ্গুলী, আপনার এই চিঠিটা আর ঐ কপিটা আমি নিতে পারি? এ দুটো কপি করে দু-এক দিনের মধ্যেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

বেশ তো—নিয়ে যান—

আচ্ছা তাহলে চলি—নমস্কার—

নমস্কার।

সকলে সলিটারী কর্ণার থেকে বের হয়ে এল।

গেট দিয়ে বের হয়ে সকলে এসে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করে। সুব্রত গাড়ি চালাচ্ছিল—স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে সামনের দিকে চেয়েছিল সে—যেন একটু অন্যমনস্ক মৃণাল সেন পাশেই বসেছিল।

জলধর বললেন, আমাকে থানায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন স্যার।

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই—সুব্রত মৃদু কণ্ঠে বলে।

থানায় জলধর চাটুয্যেকে নামিয়ে দিয়ে ওরা বি. টি. রোড ধরে। বে[illegible]র না। প্রায় সাড়ে বারোটা হবে।

এ সময়টা বি. টি. রোডে ট্রাফিকের একটু ভিড়ই থাকে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় মিলিটারী ট্রাকের ও জীপের চলাচলটা একটু বেশীই।

অনেকগুলো ইউনিট ও ক্যাম্প ব্যারাকপুরে—মিলিটারীদের যাতায়াতও তাই একটু বেশী বি. টি. রোডে।

ভদ্রলোককে কেমন মনে হল সুব্রতবাবু? মৃণাল সেন প্রশ্ন করে। তদন্তে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

কি?

ভদ্রলোক ঐ টাইপ করা চিঠিটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উনি কিছুই জানেন না ও সম্পর্কে।

কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা উনি মিথ্যে বলেছেন।

না মিঃ সেন—মিঃ গাঙ্গুলী মিথ্যে বলেননি। কারণ সত্যিই ওঁর মহেন্দ্র রায়কে আগরপাড়ায় ডেকে আনবার জন্য কোন চিঠি লেখবার প্রয়োজন ছিল না।

ছিল না বলতে চান?

হ্যাঁ—তা যদি থাকত তো উনি এত সহজে চিঠি দুটো আমাকে দিয়ে দিতেন না। তাছাড়া টাইপ করতে জানলেও এবং টাইপিং মেসিন থাকলেও বন্ধুকে একটা একান্ত ব্যক্তিগত চিঠি টাইপ করে কেউ সাধারণতঃ দেয় না। এক্ষেত্রে তাই মনে হচ্ছে হত্যাকারী অত্যন্ত চালাক—সে জানত ঐ এক ঢিলেই হয়ত পাখি কাত হবে।

কি বলছেন!

ব্যাংকের চিঠির ব্যাপার যখন ঐ চিঠির মধ্যে উল্লেখ করা ছিল তখন হত্যাকারী জানত সুনিশ্চিত ভাবেই যে মহেন্দ্রনাথ অমন একটা চিঠি পেয়ে রীতিমত ইণ্টারেস্টেড হয়ে উঠবেন এবং যাবেনও বন্ধুর কাছে। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখুন কতখানি ভেবে কাজ করেছে হত্যাকারী। প্রথমতঃ, শনিবারটা সে বেছে নিয়েছিল এবং সময়টা সন্ধ্যার দিকে। কারণ সে জানত শনিবারে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের তিনটে সাড়ে তিনটের পর আর ভিড় থাকবে না। এই গেল এক নম্বর। দুই নম্বর, হত্যাকারী মহেন্দ্রনাথকে ভাল করেই চিনত এবং এও জানত তিনি সন্ধ্যার পর তাঁর অন্ধপ্রায় ক..ারকে নিয়ে বেরুবেন না—গেলে ট্রেনেই যাবেন। তারপর তৃতীয় নম্বর—
হ্যাঁ। ...থ ট্রেনে গেলেও চারটার পর যাবেন। কারণ শনিবারেও তিনি বিকেল সাড়ে
চাল ডাল সব ...চটা পর্যন্ত অফিসের কাজ করতেন। অতএব যেতে যেতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে
আলাপ হয়— ...রে।

তাবপ... শীতের ছোট বেলা, সাড়ে পাঁচটাতেই অন্ধকার হয়ে যায়। এবং শনিবার চারটের পর যে ট্রেনটা আগরপাড়া হয়ে যায় সেটা পৌনে আটটা নাগাদ আগরপাড়া পৌঁছায়। শনিবার ঐ সময়টা স্টেশনে তেমন ভিড়ও থাকে না। কাজেই—

কি?

কেউ যদি ঐ সময় স্টেশনে এসে মিঃ গাঙ্গুলীকে রিসিভ করে তবে তিনি সঙ্গে যাবেন এবং বড় একটা কারও সেটা নজরে পড়বে না। বুঝতে পারছেন বোধহয় মিঃ সেন আমি কি বলতে চাইছি। হত্যাকারী মহেন্দ্রনাথকে স্টেশনে কাউকে দিয়ে রিসিভ করায়, তারপর তাকে বলে হয়ত, মিঃ গাঙ্গুলী পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁকে নিয়ে যেতে। ধরুন লোকটা যদি একটা সাইকেল-রিকশাওয়ালাই হয়, মহেন্দ্র নিশ্চয়ই ঐ রিকশা-ওয়ালার সঙ্গে যাবেন কারণ ইতিপূর্বে তিনিও কখনও আগরপাড়ায় সলিটারী কর্ণারে আসেননি, পথও চেনেন না। বরং খুশিই হবেন মিঃ গাঙ্গুলী লোক পাঠিয়েছেন দেখে,

তারপর ব্যাপারটা ভেবে নিন—অন্ধকারে পথের মাঝখানেই হত্যাকারী ওৎ পেতে ছিল—মহেন্দ্রনাথকে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করা এমন কিছু একটা শক্ত কাজ নয়।

কিন্তু—

ভাবছেন বোধ হয় গুলির শব্দটা, তাই না—কিন্তু তাও তো চাপা দেওয়া যেতে পারে। ধরুন যদি রিভলবারের সঙ্গে সাইলেন্সার লাগানো থাকে কিংবা রাস্তাটা নির্জন—হয়ত কারও কানে পৌছায়নি শব্দটা।

তা যেন হল কিন্তু মৃতের মুখটা অমন করে মিউটিলেটেড্ হল কি করে?

আমার অনুমান, সাধারণতঃ শনিবার রাত্রে মিল থেকে যে সব ওয়াগন ভর্তি করে সেগুলো গুডস্ ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তেমনি কোন ওয়াগনের ট্রাক্সন্ হুকের সঙ্গে হয়ত হত্যাকারী মৃতদেহটা আটকে দিয়েছিল বা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ওয়াগন চলার সময় হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে ঐভাবে মুখটা ও পরিধেয় জামা-কাপড় ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন হয়েছে যাতে করে মৃতদেহ দেখলে পুলিসের মনে হয় ব্যাপারটা স্রেফ একটা আত্মহত্যা—মার্ডার নয় আদৌ।

তাহলে আপনি বলতে চান হত্যাকারী মহেন্দ্রনাথকে বেশ ভালভাবেই চিনত—তাঁর হ্যাবিটস্ পর্যন্ত জানত?

নিশ্চয়ই। এখন নিশ্চয়ই হত্যাকারীর একটা রূপ আপনি কল্পনা করতে পারছেন মিঃ সেন মনে মনে!

হ্যাঁ—কিছুটা। আমার মনে হচ্ছে—

কি?

মিঃ গাঙ্গুলীকেও এক্ষেত্রে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে না।

কেন?

মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি টাকা নিয়েছিলেন। ধরুন সেই টাকা যাতে করে শোধ আর না দিতে হয় তাই—

না, যে বন্ধুকে অমন করে টাকা দিতে পারে তার ধারের ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ থাকতে পারে না। ভাল কথা, মহেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জের বাড়িতে একবারও কি গিয়েছেন?

না।

সেখানে কিন্তু একবার আপনার যাওয়া উচিত ছিল।

যাব ভাবছি কাল।

হ্যাঁ চলুন, দুজনাই একসঙ্গে যাব—তাঁর দুই পুত্র ও কন্যা সম্পর্কে আমাদের

জানা দরকার।

পরের দিন সকালের দিকে সুব্রত ও মৃণাল সেন বালিগঞ্জে মহেন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। মৃণাল সেন ইতিপূর্বে ঐ বাড়িতে আসেনি বটে তবে সুব্রত চিনত।

ধনী ব্যক্তি মহেন্দ্রনাথ।

বালিগঞ্জে লেকের কাছে গড়িয়াহাট অঞ্চল সেই যুদ্ধের সময়ে তেমন ডেভালাপড হয়নি।

অনেক নারকেল বাগান। জঙ্গল ও ধানজমি।

তারই মধ্যে এদিকে-ওদিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে লেককে কেন্দ্র করে কিছু কিছু পয়সা-ওয়ালা লোক বেশ কিছুটা করে জায়গা নিয়ে বড় বড় বাড়ি তৈরী করে বসবাস শুরু করেছেন।

মহেন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম।

বুদ্ধিমান চতুর ব্যবসায়ী তিনি। জানতেন ও বুঝতে পেরেছিলেন ক্রমশঃ ঐ অঞ্চলটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে—লেকের জৌলুসে বিশেষ একটি এলাকায় পরিণত হবে।

সুব্রতরা যখন মহেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জের ভবনে এসে পৌছাল তখন বেলা আটটা হবে। দরোয়ান মৃণাল সেনের পুলিসের পোশাক দেখে তাকে আটকাল না। গেট খুলে দিল।

গেট দিয়ে ঢুকে সোজা ওরা এসে পোর্টিকোর সামনে গাড়ি থামাল। বাড়িটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে। সামনে বেশ খানিকটা বাগান, তাছাড়া টেনিস লনও আছে।

বাড়িটা যেন অত্যন্ত নিস্তব্ধ। কোথাও কোন যেন সাড়াশব্দ নেই।

সুব্রত কলিংবেলটা টিপল। একটু পরেই উর্দি পরা একজন বেয়ারা বের হয়ে এল।

কাকে চান?

সুরেনবাবু বাড়িতে আছেন—সুব্রতই প্রশ্ন করে।

আছেন।

একবার ডেকে দাও তো।

ভিতরে এসে বসুন।

মনে হল যেন মৃণাল সেনের পুলিসের ইউনিফর্ম দেখে বেয়ারা একটু অবাকই হয়েছে। সে তাদের এনে ড্রইংরুমে বসাল।

ড্রইংরুমটি সুন্দরভাবে সাজানো।

দামী সোফা—পুরু কার্পেট মেঝেতে। দেওয়ালে দু-চারটি দামী ল্যাণ্ডস্কেপ। সুব্রত ও মৃণালকে বেশীক্ষণ বসে থাকতে হল না।

একটু পরেই সুশ্রী, বেশ বলিষ্ঠগড়ন এক যুবক ঘরে এসে ঢুকল।

সুব্রতকেই লক্ষ্য করে যুবক বলে ওঠে, কতক্ষণ এসেছ ?

এই আসছি। লেট মি ইনট্রোডিউস, ইনি মৃণাল সেন ইন্সপেক্টার, তোমার দাদার ব্যাপারটা ইনিই তদন্ত করছেন। মিঃ সেন—এই সুরেন, মহেন্দ্রনাথের ছোটভাই, আর্টিস্ট।

মৃণাল সেন দেখছিল। আদৌ আর্টিস্টের মত চেহারা নয় সুরেন্দ্রনাথের। বরং পালোয়ান বা এ্যাথলেটের মত চেহারাটা।

পরনে পায়জামা ও গরম পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা।

কঠিন চোয়াল, খাড়া নাক।

হাতের কব্জি বেশ মোটা—আঙুলগুলোও মোটা মোটা।

সুরেন, মিঃ সেন তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান। সুব্রত বলে।

বেশ তো—বলুন না—উনি কি জানতে চান। সুরেন্দ্র মৃদু কণ্ঠে বললে।

আপনি তো এই বাড়িতেই থাকেন ?

মৃণাল সেনের প্রশ্নে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

আচ্ছা মিঃ রায়, শনিবার দুর্ঘটনার দিন তাঁর সঙ্গে শেষ কখন আপনার দেখা হয়েছিল ?

বেলা তখন পৌনে পাঁচটা হবে—বেরুচ্ছিলেন তিনি। পোর্টিকোতে আমার সঙ্গে দেখা।

তাহলে সেদিন তিনি অফিস থেকে বাড়িতে এসে তারপর আগরপাড়া গিয়েছিলেন ?

সেই রকমই মনে হয়।

আপনার সঙ্গে আপনার দাদার সে-সময় কোন কথা হয়েছিল ?

না।

আচ্ছা মিঃ রায়, সেদিন যাবার সময় আপনার দাদার পরনে কী জামা-কাপড় ছিল মনে আছে নিশ্চয়ই ?

আছে। গরম সুট পরনে ছিল। আর হাতে ছিল গ্রেট কোটটা।

কি রঙের ?

কালো রঙের।

হাতে আর কিছু ছিল না ?

হ্যাঁ, আর কলিও ব্যাগটা ছিল।

পায়ের কি জুতো ছিল ?

কালো ডার্বি সু।

আচ্ছা সুরেন—

সুব্রতর ডাকে সুরেন্দ্র এবারে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

তোমাকে সেদিন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তোমার দাদার উইলের ব্যাপারটা কিছু জান—মানে উইলে কি ভাবে তিনি তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে গেছেন—

না।

ঐ একটি মাত্র শব্দের মধ্যে দিয়ে যেন সুব্রতর মনে হল বেশ একটা বিরক্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

তুমি জান না কিছু—

না, হি ওয়াজ এ পিকিউলিয়ার সর্ট অফ ম্যান—বিচিত্র স্বভাবের এক লোক ছিলেন। আমাদের কারও পরে—এমন কি নিজের সন্তানদের পরেও তাঁর কোন মায়া-মমতা ছিল না। সেক্ষেত্রে যদি শুনি তিনি তাঁর সব কিছু থেকে আমাদের সকলকেই বঞ্চিত করে গিয়েছেন—ওয়েল—ইট ওন্'ট বী এ সারপ্রাইজ এ্যাট অল টু এনি অফ আস—আমরা কেউ এতটুকুও বিস্মিত হব না। আর হয়ত তাই কিছু করেছেন।

একথা তো তুমি আমায় বলনি সুরেন! তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদেরও কি তেমন স্নেহের চোখে দেখতেন না ?

তাই যদি হত তাহলে কি ছেলে-মেয়েরা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মামার বাড়িতে চলে যেত এবং কুন্তলা সেখানেই কি মানুষ হত! আসলে মানুষটা ছিল অত্যন্ত সেলফিশ—স্বার্থপর।

তাঁর স্ত্রী কত দিন হল মারা গেছেন ?

বৌদি!

হ্যাঁ।

কুন্তলার যখন আট বছর বয়স সেই সময়ে মারা যান বৌদি দীর্ঘদিন পরে আবার সন্তান হতে গিয়ে। সৌরীন—দাদার বড় ছেলের বয়স তখন ষোল ও ছোট ছেলে ভবেনের বয়স ছিল বোধ করি বারো-তেরো।

এমন তো হতে পারে সুরেন, তোমার দাদা তোমাদের বৌদিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন তাই তাঁর মৃত্যুতে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে ?

কে জানে ? হয়ত ভালবাসতেন।

হুঁ। তোমার ভাইঝি বাড়িতে আছেন ?

কে কুন্তলা!

হ্যাঁ।

আছে।

মিঃ সেন তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

বেশ তো—তোমরা বোস—আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে।

সুরেন্দ্র উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মৃণাল সেন সুরেন্দ্রের গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে।

॥ নয় ॥

কুন্তলা এল।

প্রায় নিঃশব্দেই এসে যেন কুন্তলা ঘরে প্রবেশ করল।

বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে। রোগা ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম যাকে বলে। মুখখানি কিন্তু ভারী সুন্দর—বিশেষ করে ছোট কপাল—টানা ভ্রূ—নাক ও চিবুক। সব কিছুর মধ্যে এমন চমৎকার একটা সামঞ্জস্য আছে যাতে করে সমগ্র মুখখানিকে অপূর্ব একটি লাবণ্য দিয়েছে।

মাথায় বেশ দীর্ঘ কেশ। তৈলহীন রুক্ষ। পরনে সাধারণ একখানা কালোপাড় শাড়ি। গায়ে সাদা ব্লাউজ। হাতে একগাছি করে সোনার বালা। পায়ে চপ্পল।

সুব্রতই আহ্বান জানায়। বলে, বসুন মিস রায়।

কুন্তলা একটা সোফায় বসল ওদের মুখোমুখি।

সুব্রতই কথা বলে, আপনার এই বিপদের সময় আপনাকে এভাবে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। কিন্তু বুঝতেই পারছেন—উপায় নেই বলেই—

কুন্তলা কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

কয়েকটা কথা আমাদের জানবার ছিল মিস্ রায়!

কুন্তলা সুব্রতর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

গত শনিবার কোন্ সময় আপনার বাবা অফিস থেকে ফিরে আসেন?

বোধ হয় সাড়ে চারটে হবে।

কখন আবার বের হয়ে যান?

পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী ছিলেন না। এসেই বের হয়ে যান—চাও খাননি—

কোথায় যাচ্ছেন কি বৃত্তান্ত এসব সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কোন কথাবার্তা হয়েছিল?

হ্যাঁ—বলেছিলেন আগরপাড়ায় মণীন্দ্র কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। পরের দিন সকালে ফিরবেন এবং দেরি হলে সোজা অফিসেই চলে যাবেন।

কেন যাচ্ছেন আগরপাড়া সে-সম্পর্কে কিছু বলেননি?

না।

আচ্ছা কুন্তলা দেবী, শুনেছি আপনাদের মা মারা যাবার পর আপনি আপনার মামাদের ওখানে চলে যান—

হ্যাঁ—আমি, দাদা, ছোড়দা—তিনজনেই গিয়ে থাকি।

তাহলে আপনারা দীর্ঘদিন মামার বাড়িতেই কাটিয়েছেন?

হ্যাঁ। বছর দুই হল বি. এ. পাস করবার পর মামীমা মারা গেলেন। তখন বাবা বললেন এখানে চলে আসতে—মামীমার শ্রাদ্ধ চলে গেলে বাবা গিয়ে সঙ্গে করেই আমাকে নিয়ে আসেন, সেই থেকে বাবার কাছেই আছি।

আর আপনার দাদারা?

দাদা ইন্টারমিডিয়েট পাস করবার পর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। তখন থেকে সে হস্টেলেই ছিল আর ছোড়দাও ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত মামার বাড়িতে ছিল। তারপর এই বাড়িতে চলে আসে।

আপনারা যখন মামার বাড়িতে ছিলেন, মিঃ রায় আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন না বা আপনারা এখানে মধ্যে মধ্যে আসতেন না?

বাবাই মধ্যে মধ্যে যেতেন। আমরা কখনও আসিনি। তবে এখানে চলে আসবার বছর খানেক আগে থাকতে বাবা মধ্যে মধ্যে আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে এখানে নিয়ে আসতেন। পাঁচ-সাতদিন এখানে আমি থেকে আবার ফিরে যেতাম।

আপনাদের বাবা আপনাদের মধ্যে সব চাইতে কাকে বেশী ভালবাসতেন বলে মনে হয় আপনার?

বাবা তাঁর সন্তানদের কাউকেই কম ভালবাসতেন না। তবে অত্যন্ত চাপা ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলে কিছু বাইরে প্রকাশ পেত না।

হুঁ। আচ্ছা আপনার বাবার বন্ধু ডাঃ নলিনী চৌধুরীকে আপনি চিনতেন?

হ্যাঁ, নলিনী কাকা তো প্রায়ই মামার বাড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

আপনাদের ঐ নলিনী কাকা আপনার বাবা ও মণীন্দ্র কাকার নামে মৃত্যুর পূর্বে ব্যাঙ্কে দুখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন, আপনি সে-চিঠি সম্পর্কে জানেন কিছু?

শুনেছিলাম—তবে সে চিঠি কিসের—কি তাতে লেখা ছিল জানি না—

চিঠির কথাটা শুনেছিলেন কার কাছে?

বাবার কাছেও শুনেছি, আর—

আর কার কাছে শুনেছেন ?

নীরেনের কাছেও শুনেছি।

নীরেন !

ডাঃ নীরেন সান্যাল দাদার বন্ধু। নলিনী কাকার ভাগ্নে।

সুব্রত লক্ষ্য করল নীরেনের কথা বলবার সময় কুন্তলার মুখটা যেন একটু রাঙা হয়ে উঠল। সে চোখ নামাল।

সুব্রত এবার প্রশ্ন করে, ডাঃ নীরেন সান্যালের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?

দাদার সঙ্গে প্রায়ই মামার বাড়িতে আসত—সেখানেই অনেক দিনের পরিচয়।

আচ্ছা মিস রায়, যাবার সময় আপনার বাবার হাতে কিছু ছিল আপনার মনে আছে ?

হ্যাঁ, তাঁর ফোলিওটা ছিল।

কেমন দেখতে সেটা ?

কালো রঙের মরক্কো লেদারের তৈরী। উপরে বাবার নাম মনোগ্রাম করা সোনার জলে।

ভাল কথা, আপনার যে দাদা আর্মিতে কাজ করেন এখন কোথায় আছেন জানেন ?

শুনেছি ইস্টার্ন ফ্রণ্টে। তবে কোথায় জানি না।

শেষ কবে ছুটিতে আসেন ?

মাস আস্টেক আগে।

আপনার ছোড়দা ?

একটু যেন ইতস্ততঃ করল কুন্তলা, তার পর মৃদু কণ্ঠে বললে, ছোড়দা এখন বেরিলিতে পোস্টেড্।

আর একটা কথা—আপনার বাবার উইল সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি ?

না। মাত্র গতকালই আমাদের সলিসিটার এসেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম বাবার উইল আছে। আগামী কাল সেই উইল পড়ে শোনাবেন তিনি বলে গেছেন। আচ্ছা আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। আপনি যেতে পারেন।

কুন্তলা উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সেদিনের মত ওরা বিদায় নিল মহেন্দ্র রায়ের বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে।

দিন দুই পরে।

মিঃ মুখার্জী—রায় অ্যাণ্ড কোম্পানির ম্যানেজারের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল।

সুব্রত, মৃণাল সেন ও মিঃ মুখার্জী কথা বলছিল।

গতকাল সন্ধ্যায় উইল পড়া হয়ে গিয়েছে।

মহেন্দ্র রায় তাঁর ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের চার লক্ষ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা তাঁর মেয়ে কুন্তলাকে—নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাই সুরেন্দ্রকে ও বালিগঞ্জের বাড়িতে যতদিন তারা বেঁচে থাকবে তাদের থাকবার অধিকার দিয়ে গিয়েছেন।

বাকী দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নানা প্রতিষ্ঠানে দান করে গিয়েছেন। এবং শকুন্তলা ও সুরেন্দ্রর অবর্তমানে বাড়িটাও রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে গিয়েছেন অবলা বিধবাদের একটা আশ্রম করবার জন্য।

আর কোম্পানির স্বত্বের অর্ধেক দিয়ে গিয়েছেন কুন্তলাকে অর্ধেক মিঃ মুখার্জীকে।

দুই ছেলে কোম্পানি থেকে দেড় হাজার টাকা করে মাসোহারা পাবে মাত্র। তাদের আর কিছু দেননি।

কোম্পানির আয় বাৎসরিক চার লাখ টাকার মত।

মিঃ রায়ের সম্পত্তির পরিমাণ শুনে সুব্রত সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সঙ্গে আর একটা কথাও জানা গিয়েছে। ঐ শেষোক্ত উইলটি মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে করেছিলেন নাকি মহেন্দ্র রায় আগের উইলের বদলে।

আগের উইলে—মেয়েকে অর্ধেক দিয়ে বাদবাকী নগদ টাকা দুই ছেলেকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

বাড়িটার অবিশ্যি আগের উইলে উপরের উইলের মতই ব্যবস্থা ছিল—আর কোম্পানির অর্ধেক ছিল মিঃ মুখার্জীর ও বাদবাকী অর্ধেক তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা ছিল।

সে সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল মিঃ মুখার্জীর বসবার ঘরে।

আচ্ছা মিঃ মুখার্জী, আপনি যখন উইলের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন, আপনি হয়ত জানেন কেন হঠাৎ তিনি তাঁর উইলটা আবার বদলে ছিলেন? সুব্রত প্রশ্ন করে।

ঠিক বলতে পারব না—তবে—

কি?

মনে হয়, হয়ত ছেলেদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি উইলটা বদলে ছিলেন।

কেন, বাপ-ছেলেদের মধ্যে কি তেমন সম্প্রীতি ছিল না?

না। কোনদিনই তেমন প্রীতির সম্পর্ক ছিল না বাপ ও ছেলেদের মধ্যে।

কেন—কোন কারণ ছিল কি বাপ ও ছেলেদের মধ্যে সম্প্রীতি না থাকার ?

আমার মনে হয় কারণ একটা হয়ত ছিল—

কি ?

স্যারের একটা আনম্যারেড্ শালী ছিল—

ছিল কেন বলছেন ?

গত বছর তিনি একটা অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যান।

অ্যাক্সিডেণ্ট !

হ্যাঁ, বাড়ির বাথরুমের সুইচে ইলেকট্রিক কারেণ্টের শক্ খেয়ে মারা যান। ঐ শালীর সঙ্গে স্যারের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর বছরখানেক আগে থাকতেই নাকি গড়ে উঠেছিল। এবং মৃত্যুর পর বেশী হয়।

মিঃ রায়ের ঐ শ্যালিকা কি তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতেই থাকতেন ?

না—তিনি থাকতেন শ্যামবাজারে একটি বাড়ি নিয়ে। শ্যামবাজারের একটা স্কুলের তিনি হেডমিস্ট্রেস ছিলেন।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ মুখার্জী, মিঃ রায়ের ছেলেদের রিসেণ্ট কোন খবর জানেন ?

বড় সৌরীন্দ্রর কোন সংবাদ জানি না, তবে ছোট ছেলে ভবেন্দ্র ঐ দুর্ঘটনার দিন সাতেক আগে এক দ্বিপ্রহরে তার বাবার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে এসেছিল।

অফিসে ?

হ্যাঁ। আমার আর মিঃ রায়ের অফিস-কামরা পাশাপাশি। আমি হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য স্যারের অফিস ঘরের দিকে যাই। সেই সময় দড়াম করে দরজা খুলে ভবেন্দ্র মিঃ রায়কে শাসাতে শাসাতে রাগতভাবে বের হয়ে গেল দেখলাম।

শাসাতে শাসাতে বের হয়ে গেলেন ?

হ্যাঁ, ভবেন্দ্র বলছিল, ওল্ড ভালচার—বুড়ো শকুনি, তোমাকে আমিও দেখে নোব।

তারপর ?

আমি স্যারের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি তিনিও অত্যন্ত উত্তেজিত—বলছেন, রাস্কেল ! তারপর আমাকে দেখে বললেন, আর কখনও যেন ও আমার অফিসে না ঢুকতে পারে। দারোয়ানদের স্ট্রিক্ট অর্ডার দিয়ে দেবে মুখার্জী।

অতঃপর সুব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আপনি মিঃ রায়ের অফিসে কতদিন কাজ করছেন—মানে বর্তমান পোস্টে ?

প্রায় বছর দশেক হবে।

তার আগে?

তার আগেও তাঁর কোলিয়ারীগুলো দেখাশোনা করতাম আমি।

॥ দশ ॥

কিছু মনে করবেন না মিঃ মুখার্জী—উইলে আপনাকে মিঃ রায় অনেক কিছু দিয়েছেন শুনলাম। সুব্রত বলে।

মিঃ মুখার্জী বললেন, মিঃরায় মানে মহেন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে।

সম্পর্ক!

হ্যাঁ। আমরা মামাতো-পিসতুতো ভাই। আমার মা অর্থাৎ ওঁর পিসিমার কাছেই মিঃ রায় মানুষ হয়েছিলেন। কারণ ওঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর সেই সময় আমার মামীমা—মহেন্দ্র রায়ের মা মারা যান। উনি তাই বলতেন পিসিমার ঋণ নাকি উনি জীবনে শোধ করতে পারবেন না।

আপনি যে মিঃ রায়ের আত্মীয় কথাটা কিন্তু সেদিন বলেননি। সুব্রত মৃদুকণ্ঠে বলে।

না, বলিনি। দেখুন সুব্রতবাবু, বড়লোকের আত্মীয়তা ঘোষণা করবার মধ্যে গৌরব অনুভব করা একটা থাকতে পারে, কিন্তু মর্যাদা নেই হয়ত।

সুব্রত মিঃ মুখার্জীর কথা শুনে একবার তাঁর মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু সে বলবার আগেই মিঃ মুখার্জী পুনরায় বললেন, আমাদের পরস্পরের মধ্যে বর্তমানের অবস্থার এত আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল যে কেউ হয়ত অতীতের সে সম্পর্কের কথাটা কখনও মনে করতাম না পরবর্তীকালে।

সুব্রত ঐ সম্পর্কে আর কোন আলোচনা করল না—সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। বললে, মিঃ মুখার্জী, আপনি সেদিন বলেছিলেন মিঃ গাঙ্গুলী এদেশে ফিরে এসে তাঁর বন্ধু মিঃ রায়ের কাছ থেকেই অর্থসাহায্য নিয়ে আগরপাড়ায় বাড়ি করেছিলেন—

হ্যাঁ।

টাকার পরিমাণটা হয়ত আপনি জানেন—

জানি। হাজার চল্লিশ হবে।

আচ্ছা কি শর্তে মিঃ রায় তাঁর বন্ধুকে টাকাটা দিয়েছিলেন?

বিশেষ কোন শর্তই ছিল না।

মানে?

যখন সুবিধা হবে টাকাটা দেবেন এই আর কি—

কিন্তু একজন যিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে পৌচেছেন, যাঁর সর্বস্ব গেছে তাঁর পক্ষে আর অত টাকা শোধ করার সম্ভাবনা কোথায়।

মিঃ মুখার্জী চুপ করে থাকেন।

অবিশ্যি যদি আর কোন কারণ থেকে থাকে—

থাকলেও আমি জানি না।

হুঁ। আচ্ছা কোন ডিড হয়নি—লেনদেনের?

হয়েছিল।

সে ডিডটা একবার দেখতে পারি?

কাল অফিসে আসবেন, দেখাব।

অফিসে আছে বুঝি?

না। মিঃ রায়ের বাড়িতেই আছে। কাল আনিয়ে রাখব সেখান থেকে।

সেদিনকার মত বিদায় নিল ওরা।

দুজনে এসে গাড়িতে উঠে বসল।

সুব্রত নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিল।

মৃণাল সেন প্রশ্ন করে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন?

এণ্টালীতে।

সেখানে—

একবার ডাঃ নীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করবেন না?

নীরেন গাঙ্গুলী?

হ্যাঁ—ডাঃ নলিনী চৌধুরীর ভাগ্নে। আর—

আর—

নীরেন গাঙ্গুলীর কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন না, কুন্তলা দেবীর মুখের রঙের আভাস!

আপনি তাও নজর করে দেখেছেন? হাসতে হাসতে মৃণাল সেন বলে!

তা দেখতে হয় বৈকি। কিন্তু তার আগে একবার বরাহনগরে যাব মেজর সাহেবের ওখানে।

মেজর সাহেব।

হ্যাঁ, মেজর রণদা সিনহা। এদেশে ফায়ার আর্মসে অত বড় এক্সপার্ট খুব কম পাবেন মিঃ সেন।

অতঃপর সুব্রত মেজর সাহেবের পরিচয় দিল। মেজর রণদা সিনহা গত মহাযুদ্ধে

সামান্য সৈনিকের চাকরি নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতি করে মেজর পদে উন্নীত হন।

বছর সাতেক হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন।

রিটায়ার করার পর বরাহনগরে অনেকখানি জায়গা সমেত একটা বাগানবাড়ি কিনে বসবাস করছেন। কোন ঝামেলা নেই সংসারে। স্বামী আর স্ত্রী।

একমাত্র ছেলে, সেও আর্মির চাকরিতে বিদেশে।

একবার একটা কেসে আর্মস্ সংক্রান্ত ব্যাপারে ওপিনিয়ানের জন্য কিরীটীর সঙ্গে রণদা সিনহার বরাহনগরের 'আদি নিবাসে' গিয়েছিল। সেই সময়ই আলাপ হয় ওদের। ভারি আমুদে ও রসজ্ঞ লোকটি।

মধ্যে মধ্যে তারপরও সুব্রত ওদিকে গেলে মেজর সিনহার 'আদি নিবাসে' গিয়েছে। আড্ডা দিয়ে এসেছে।

বেশ লম্বা-চওড়া এবং রসিকপ্রকৃতির মানুষটি।

ওরা যখন 'আদি নিবাসে' গিয়ে পৌঁছল, মেজর সিনহা তৃতীয়বার চা নিয়ে বসেছিলেন।

মাথায় একমাথা পাকা চুল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

পরনে পায়জামা ও স্লিপিং গাউন—মুখে একটা মোটা সিগার।

সুব্রতকে দেখে কলস্বরে অভ্যর্থনা জানান সিনহা,আরে সুব্রতচন্দ্র যে—সুস্বাগতম্!

সুব্রত বসতে বসতে বললে, আড্ডা দিতে আজ নয় কিন্তু—

তবে?

একটা ওপিনিয়ান নিতে এসেছি।

কি ব্যাপার?

সুব্রত পকেট থেকে একটা কাগজে মোড়া বুলেট বের করল।

দেখুন তো মেজর সাহেব এই বুলেটটা!

বুলেটটা হাতে নিয়ে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে সিনহা বললেন, কোথায় পেলেন এটা? এটা তো দেখছি আর্মি রিভলভারের গুলি!

আর কিছু—অন্য বিশেষত্ব আছে বুলেটটার গায়ে?

বিশেষত্ব—দাঁড়ান দেখি! একবার লেন্সটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় তাহলে—

বলতে বলতে মেজর উঠে গেলেন ভিতরে এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন, হ্যাঁ, বুলেটটার গায়ে খুব ফাইন খাঁজ কেটে গেছে। তাতে মনে হয়—

কি?

যে রিভলভার থেকে এটা ফায়ার করা হয়েছিল তার গায়ে ভিতরে ঐ ধরনের কোন খাঁজ আছে, যে জন্য ফায়ারের পর বুলেটের গায়ে খাঁজ কেটে গেছে।

আর কিছু নেই তো?

না। কিন্তু এটা পেলেন কোথায়, ব্যাপারটাই বা কি?

একজন নিহত ভদ্রলোকের মাথার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে বস্তুটি।

সত্যি!

হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোককে সম্ভবতঃ ঐ গুলিটির সাহায্যেই হত্যা করা হয়েছে।

রিয়েলি! কিন্তু যে ধরনের রিভলবারের সাহায্যে ঐ গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল সেই রিভলবার তো কোন আর্মির লোকের কাছ ছাড়া থাকা সম্ভবপর নয়, বিশেষ করে এই যুদ্ধের সময়—

সেই কারণেই তো আপনার ওপিনিয়ানটা নিলাম মেজর। আচ্ছা আজ তাহলে উঠি—অবিশ্যি ব্যালেস্টিক একজামিনেশনের জন্যও পাঠানো হবে বুলেটটা।

উঠবেন?

হ্যাঁ।

বাঃ, তা কি করে হয়! এক কাপ চা অন্ততঃ—

আজ নয় মেজর, অন্য একদিন। আজ একটু তাড়া আছে। সুব্রত বলল উঠতে উঠতে।

কিন্তু এটা ভাল হচ্ছে না রায়সাহেব!

কেন?

কেন কি, রহস্যের দরজার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে রেখে আপনি বিদায় নিচ্ছেন।

সুব্রত মৃদু হেসে বলে, শীঘ্রই আবার একদিন আসব। চলুন মিঃ সেন।

সুব্রত মৃণাল সেনকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

চলন্ত গাড়িতে বসে মৃণাল সেন প্রশ্ন করে, মহেন্দ্রনাথের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে তাঁর ব্রেন ম্যাটারের মধ্যে যে বুলেটটা পাওয়া গিয়েছিল ওটা সেই বুলেটটাই তো?

সুব্রত সামনের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল, মৃদু কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ।

সুব্রতবাবু, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—

কি?

মিঃ গাঙ্গুলী সন্দেহের তালিকায় একেবারে শীর্ষস্থানে!

কেন?

আপনি যাই বলুন—প্রথমতঃ সিঙ্গাপুরে ছিলেন—যুদ্ধের সময় কোনমতে পালিয়ে এসেছেন। তাঁর পক্ষে—অবশ্যই একটা '৩৮ আর্মি রিভলবার সংগ্রহ করা এমন অসম্ভব কিছু নয়। শুধু তাই নয়, মোটিভ যদি ধরেন তো—চল্লিশ হাজার টাকা যেটা তিনি তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে ধার করেছিলেন—এক্ষেত্রে ধারই বলব কারণ ডিডে যখন শোধ করবার একটা কথা আছে—

তারপর? বলুন, থামলেন কেন?

ঐ ডাঃ চৌধুরীর চিঠিটা! ওটাকে আমি একেবারে কিছু না বলে উড়িয়ে দিতে যেন কিছুতেই পারছি না। আমাকে কেন যেন ধারণা—

কি?

ঐ চিঠির মধ্যে কোন একটা রহস্য আছে, যে রহস্যটা হয়ত ভদ্রলোক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বা চিঠিটার কোন সমাধানের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই বন্ধুকে কৌশলে একটা টাইপ করা চিঠি দিয়ে ডেকে এনে সে-রাত্রে হত্যা করেছেন।

অসম্ভব কিছুই নয়, কিন্তু—

কি?

একটা কথা কিন্তু ভাববার আছে এর মধ্যে। মিঃ গাঙ্গুলী মানুষটা যে বোকা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। সেক্ষেত্রে তিনি অমন ভাবে একটা কাঁচা কাজ করবেন, ব্যাপারটা যেন ঠিক মেনে নিতে পারছি না।

কাঁচা কাজ কেন বলছেন সুব্রতবাবু?

নয়ত কি!

একটু পরিষ্কার করে বলুন সুব্রতবাবু। মৃণাল সেন বলে।

ধরুন, তাঁর হত্যা করবার ইচ্ছাই যদি থাকত বন্ধুকে কোন কারণে ঐভাবে তাকে তিনি তাঁর এলাকায় ডেকে আনতে যাবেন কেন একটা চিঠি দিয়ে। সেক্ষেত্রে তাঁর উপরেই যে প্রথম সন্দেহ আসবে সেটা কি তিনি বোঝেননি! না না, ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছেন ঠিক তত সহজ নয় হয়ত মিঃ সেন।

মৃণাল সেন আর কোন কথা বলে না। চুপ করেই থাকে।

এন্টালীতে একটা গলির মধ্যে বাড়িটা ডাঃ নলিনী চৌধুরীর। দোতলা বাড়ি। লাল রঙের। পাড়াটা অনেক দিনের পুরনো—বাড়িটাও পুরনো। ঐ বাড়িটাই ভাড়া নিয়ে একসময় ডাঃ নলিনী চৌধুরী তাঁর ল্যাবোরেটারী গড়ে তুলেছিলেন দোতলায়।

দোতলায় সর্বসমেত চারখানি ঘর। একটি ছোট ঘরে তিনি থাকতেন ও

শুতেন—বাদবাকী তিনটে ঘরে তাঁর ল্যাবোরেটারি। একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে যাতায়াত করা যেত মধ্যবর্তী দরজাপথে।

নলিনী চৌধুরী বিয়ে-থা করেননি। সংসারে আপনার জন বলতে ছিল ঐ একটিমাত্র ভাগ্নে নীরেন সান্যাল। নীরেনের যখন অল্প বয়েস, বছর আট-দশ, সেই সময় থেকেই নীরেনকে বোনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলেন ডাঃ চৌধুরী।

নীরেনের মা-বাবাও আপত্তি করেননি—কারণ অনেকগুলো সন্তান, দৈন্যের সংসারে সকলকে মানুষ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আনন্দেই তাই নীরেনকে ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কোন একদিন।

নীরেনকে কলকাতায় নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ডাঃ চৌধুরী। তারপর সে ক্রমে পাস করে এম. এস-সি।

এম. এস-সি পড়িয়েছিলেন ভাগ্নেকে ডাঃ চৌধুরী ইচ্ছা করেই। তাঁর কেমিস্ট্রিতে একজন সহকারীর প্রয়োজন ছিল।

নীরেনও তার মামাকে হতাশ করেনি। পরে ডক্টরেট্ পেয়েছিল।

ভাল ভাবেই পাশ করে মামার সঙ্গে তাঁর ল্যাবোরেটারিতে রিসার্চের সাহায্য করতে লাগল। তারপর হঠাৎ একদিন ডাঃ চৌধুরীর হল ক্যানসার এবং তাঁর মৃত্যুর পর ডাঃ সান্যাল ল্যাবোরেটারি চালাতে লাগলেন।

ডাঃ নীরেন সান্যালকে তাঁর ল্যাবোরেটারির মধ্যেই পাওয়া গেল।

বাড়িটার নীচের ঘরগুলো একটা ড্রইংরুম ও অন্য দুটো স্টোররুম রূপে ব্যবহৃত হয়।

বাকি ঘরটায় ভৃত্য গোপাল থাকে।

ঐ গোপালই নীরেনকে দেখাশোনা করে। রান্না থেকে শুরু করে সব কাজই সে করে।

গোপালকে বলতেই সে বললে, ডাক্তারবাবু ওপরে তাঁর ল্যাবোরেটারি ঘরে আছেন। চলে যান।

সু· ঠিক গোপালের কথাটা শুনে যেন একটু অবাকই হয়।

সোজা ল্যাবোরেটারি ঘরে যে অমন সোজা চলে যাবার নির্দেশ মিলতে পারে তার যেন ঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু সে-সম্পর্কে সে কোন কথা বলে না। গোপালের নির্দেশমত মৃণালকে সঙ্গে নিয়ে সুব্রত সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

সিঁড়ির মুখেই একটি ব্যস্ত যুবকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দোতলায়।

হাতে তার একটি তরল পদার্থপূর্ণ টেস্ট-টিউব।

যুবকটিকেই জিজ্ঞাসা করে সুব্রত, ডাঃ সান্যাল আছেন?

হ্যাঁ, আছেন— যান, ঐ পাশের ঘরে যান। হাত দিয়ে ইশারা করে ঘরটা দেখিয়ে দিল যুবক।

ঘরের মধ্যে ঢুকে ওরা দাঁড়াল। ঘরভর্তি সব যন্ত্রপাতি। র‍্যাকে র‍্যাকে নানা আকারের শিশিতে নানা রঙের সব ওষুধ। বুনসেন বার্ণারে একটা কাঁচের আধারে কি যেন ফুটছিল।

তার সামনে একটা আরাম-কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে আরাম করে সিগারেট টানছিল একটি যুবক।

বাঙালীদের মধ্যে অমন স্বাস্থ্যবান চেহারা সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ে না। লম্বায় খুব বেশী হবে না, কিন্তু নিটোল স্বাস্থ্য।

টকটকে ফর্সা গায়ের রং। যেন ইউরোপীয়দের মত। মাথার চুল ব্যাকব্রাস করা। চোখে চশমা। চোখেমুখে একটা প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি আছে। পরনে একটা পায়জামা ও তার উপরে একটা অ্যাপ্রন্।

পদশব্দেই মুখ তুলে তাকিয়েছিল যুবক।—এবং তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল এবং পুলিসের ইউনিফর্মপরিহিত মৃণাল সেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

আমরা ডাঃ সান্যালের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। মৃণাল সেন বলে।

আমিই ডাঃ সান্যাল।

ওঃ, নমস্কার। আমার নাম মৃণাল সেন। আমি একজন ইন্সপেক্টার, লালবাজার থেকে আসছি আমরা।

লালবাজার থেকে! বলুন তো কি ব্যাপার?

একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে।

ওঃ, তা বেশ চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

চলুন।

পাশের ঘরটা একটা লাইব্রেরী। চারিদিকে আলমারি ও র‍্যাকে বই ঠাসা। চেয়ার ও টেবিল সেখানে ছিল। মৃণাল সেন ও সুব্রতকে বসতে বলে একটা চেয়ার টেনে নেয় নীরেন।

কি দরকার বলুন তো ইন্সপেক্টার?

কথা বললে সুব্রতই, ডাঃ সান্যাল, আপনি নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে পড়েছেন, রায় অ্যাণ্ড কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার একটা দুর্ঘটনায় গত শনিবার মারা গেছেন?

আমি জানি।

পেপারেই বুঝি সংবাদটা জানতে পারেন প্রথম?

না।

তবে ?

মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে কুন্তলা আমাকে ফোন করে জানায়।

কবে ?

সংবাদটা পাবার কিছু পরেই।

কুন্তলা দেবীদের সঙ্গে আপনি অনেকদিন পরিচিত, তাই না ডাঃ সান্যাল ?

ওর দাদা সৌরীন্দ্র আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ও বিশেষ বন্ধু।

আচ্ছা ডাঃ সান্যাল, আপনার মামা ডাঃ চৌধুরী মরবার আগে তাঁর দুই বন্ধুর নামে, মানে মিঃ রায় ও মিঃ গাঙ্গুলীর নামে, ব্যাঙ্কে দুখানা চিঠি জমা দিয়ে যান। আপনি সে সম্পর্কে কিছু জানেন ?

কুন্তলার মুখে একবার শুনেছিলাম বটে চিঠির কথা।

আর কিছু চিঠি সম্পর্কে জানেন না ?

না, জানবার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

মিঃ রায় ও মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিচয় ছিল, জানা-শোনাও ছিল। তাঁদের মুখে শোনেননি কিছু ঐ চিঠির সম্পর্কে কখনো ?

না।

আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী মরবার আগে কি নিয়ে রিসার্চ করছিলেন ?

স্নেক ভেনাম নিয়ে।

আচ্ছা আপনার আর এক মামা ছিলেন না বর্মায় ?

হ্যাঁ, বড়মামা জীবন চৌধুরী বরাবর বর্মাতে ছিলেন।

শোনা যায় তিনি যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভূত অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

সেই রকম একটা কানাঘুষা শুনেছিলাম বটে।

কার কাছে ?

তা ঠিক মনে নেই।

ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করেননি বুঝি ?

না।

কেন ?

বড়মামাকে দেখলে ও তাঁর চলাচলন দেখলেই বুঝতে পারতেন কেন—তাছাড়া যে লোকটা কোনদিন লেখপড়া করেনি, অল্প বয়সে জাহাজের খালাসী হয়ে পালিয়ে যায়, তার পক্ষে বড়লোক হওয়া একমাত্র আলাদীনের প্রদীপ হাতে পাওয়ারই সামিল।

কিন্তু আমি শুনেছি—আপনার বড়মামা প্রচুর অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই অর্থ তিনি তাঁর ছোট ভাইকে অর্থাৎ ডাঃ নলিনী চৌধুরীকেই দিয়ে যান মৃত্যুর পূর্বে!

কার কাছে শুনলেন এ আরব্য উপন্যাসের গল্প?

যার কাছেই শুনে থাকি না কেন, তিনি যে একটা নেহাত গল্প বানিয়ে বলেননি—তাই আমাদের ধারণা।

নীরেন সান্যাল প্রত্যুত্তরে হাসল। কোন জবাব দিল না!

সুব্রত আবার বলে, ডাঃ চৌধুরী যখন হাসপাতালে তখনই খবরটা পান তিনি—কথাটা আপনারও না-জানার কথা নয় হয়ত।

না, আমি কিছু জানি না।

আপনার ছোটমামা আপনাকে কিছু বলেননি?

না।

আচ্ছা আপনাদের আইন-পরামর্শদাতার নামটা জানতে পারি?

কালীপদ চক্রবর্তী। জোড়াবাগানে থাকেন তিনি—হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন।

আচ্ছা আপনার বড়মামার কোন আইন-পরামর্শদাতা ছিলেন?

তা জানি না।

আচ্ছা ডাঃ সান্যাল, আপনাকে বিরক্ত করলাম কিছু মনে করবেন না—এবারে আমরা উঠব।

না, না—মনে করব কেন? কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো—এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছিলেন?

কারণ পুলিসের ধারণা মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়।

বলেন কি।

হ্যাঁ ব্যাপারটা মার্ডার বলেই মনে হয় আমার। মৃণাল সেন বলে।

ও নো—ইউ ডোন্ট্ একজ্যাক্টলি মিন ইট—

সুব্রত সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আচ্ছা চলি—নমস্কার।

সুব্রত অতঃপর মৃণাল সেনকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ এগারো ॥

ঐ দিনই রাত্রে।

কুন্তলা তার ঘরে একটা রকিং চেয়ারে বসেছিল। ঘরের আলো নিভানো—অন্ধকার।

খুব শীত পড়েছে। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে বসেছিল কুন্তলা।

ভৃত্য এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকে, দিদিমণি!

কে রে?

আমি। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ডাক্তারবাবু!

আজ্ঞে, নীরেনবাবু।

নীরেনের গলা শোনা গেল, কুন্তলা!

কুন্তলা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয়।

নীরেন এসে ঘরে ঢুকল।

আবার মরোজ হয়ে বসে আছ?

কুন্তলা সোজা হয়ে বসে, কোন কথা বলে না।

তুমি এক কাজ কর কুন্তলা—

নীরেনের মুখের দিকে তাকাল কুন্তলা।

তুমি বরং কিছুদিন তোমার মামার বাড়িতে গিয়ে থেকে এস। এই পরিবেশ থেকে তোমার সরে যাওয়া দরকার, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমার মনে হয়।

কুন্তলা কোন জবাব দেয় না।

নীরেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কুন্তলার মুখোমুখি বসে।

বাবা-মা চিরকাল কারো বেঁচে থাকে না—

তা নয় নীরেন।

তবে কী?

বাবার মৃত্যু হয়েছে একটা দুর্ঘটনায়, কিছুতেই যেন কথাটা ভুলতে পারছি না!

দুর্ঘটনা বলতে তুমি কি বলতে চাও?

কেন—তুমি কি কিছু শোননি?

কি?

পুলিসের ধারণা তাঁকে কেউ হত্যা করেছে!

ননসেন্স্—কে তাঁকে হত্যা করতে যাবে বল তো—যত সব কক্ অ্যাণ্ড বুল্ স্টোরি, যেমন পুলিস তেমনি তাদের বুদ্ধি! ইফ আই অ্যাম নট্ রং, তিনি আত্মহত্যা করেছেন ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু কেন বাবা আত্মহত্যা করতে যাবেন? .

শোন কথা, আত্মহত্যা লোকে করে কেন? কোন কারণ হয়ত তাঁর ছিল!

তুমি বাবাকে জান না কিন্তু আমি জানি। তাঁর মত ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক আত্মহত্যা করতে পারে আমি বিশ্বাসই করি না।

আমাদের জীবনে বিশ্বাসের বাইরেও অনেক সময় অনেক কিছুই ঘটে কুন্তলা—

তা সত্য ঘটে—তবু—

বেশ তোমার কথাই না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু যা হয়ে গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না—তখন মিথ্যে ভেবে কি হবে!

সত্যি বাবার জন্য ভারি দুঃখ হয়—হি ওয়াজ সো লোনলি!

দেখ কুন্তলা, একটা কথা তোমাকে এতদিন আমি বলিনি—কিন্তু আজ তোমার কথাটা শুনে কেন যেন মনে হচ্ছে—

কি?

তোমার বাবার বন্ধু ঐ মণীন্দ্র গাঙ্গুলী লোকটা—

কি?

মনে হয় ওর এই ব্যাপারের মধ্যে হাত আছে!

না না, এসব তুমি কি বলছ নীরেন?

ভুলো না, অনেকগুলো টাকা তোমার বাবার কাছে ধারতো লোকটা!

কিন্তু সে টাকার জন্য তো বাবা কোনদিন তাকে তাগাদা দেননি!

দেননি—তাহলেও একদিন তো তাকে শোধ করতেই হবে, এই কড়ারেই তো সে টাকা ধার নিয়েছিল। তাছাড়া—

কি?

আজ পুলিস ইন্সপেক্টার মিঃ সেন আমার কাছে আসবার পর থেকে কেন যেন আমার একটা কথা মনে হচ্ছে!

কি কথা?

আমার বড়মামার চিঠির মধ্যে সত্যিই হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত ছিল। যদিও এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না—

কি?

বড়মামা কোন টাকাকড়ি নিয়ে আসতে পারেন বর্মা থেকে, ব্যাপারটা অত্যন্ত অ্যাবসার্ড—অসম্ভব যেন মনে হয় এখনো !

ঐদিন রাত্রে—সুব্রতর গৃহে।

আহারাদির পর সুব্রত একটা আরাম-কেদারায় বসে একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ভৃত্য এসে বললে, আগরপাড়ার স্টেশন মাস্টার রসময়বাবু দেখা করতে এসেছেন।

সংবাদটা শুনে সুব্রতর চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে, যা তাঁকে এখানে এই ঘরে নিয়ে আয়।

সুব্রত গত পরশু আগরপাড়া গিয়ে রসময়বাবুর সঙ্গে আলাপ করে বেশ একটু ভদ্রলোক সম্পর্কে ইণ্টারেস্টই বোধ করেছিল। কৌতুকও ঐ সঙ্গে একটু বোধ করেছিল, ভদ্রলোকের মনে ক্রাইম ডিটেকশনের একটা শখ আছে কথায়বার্তায় বুঝতে পেরে।

আপনার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারছি ডিটেকশনের ব্যাপারে আপনি বেশ ইণ্টারেস্টেড! তা আপনি পুলিস লাইনে গেলেন না কেন বলুন তো? সুব্রত বলেছিল একসময় রসময়কে।

হয়ে উঠল না, বুঝলেন না! রসময় বলেছিল লজ্জার হাসি হেসে।

এ কেসটায় আপনার সাহায্য কিন্তু আমি নেবো।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এ তো আমার গর্বের কথা। বলুন না কি করতে হবে, বলুন ?

দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ দেখবেন তো যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তার আশেপাশে কালো রঙের মরক্কো লেদারের একটা ফোলিও ব্যাগ পাওয়া যায় কি না।

দেখব। নিশ্চয়ই খোঁজ করে দেখব।

আর ঐদিন, মানে দুর্ঘটনার রাত্রে কটন মিল থেকে কোন ওয়াগন গুডস্ ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা এই খবরটা—

এ আর এমন কি, দিতে পারব খবরটা আপনাকে। গুডস্ ট্রেন সে-রাত্রে গেছে কিনা সে তো আমার ডাইরীতেই আছে। আর কিছু ?

হ্যাঁ। ঐ দেশবন্ধু কলোনীতে যে রেস্তোরাঁটা আছে, নাম যার পান্থ-নিবাস, তার অধিকারী ঐ ঋষিবাবুর কাছ থেকে খোঁজ নেবেন সে-রাত্রে সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত কারা কারা সেদিন তাঁর রেস্তোরাঁয় কফি-চা পান করতে গিয়েছিল!

ঋষির সঙ্গে আলাপ আছে। সেও একটি রহস্য-উপন্যাস গল্পের পোকা। মধ্যে

মধ্যে সে আমার কাছে বই নিতে আসে, তার কাছেই খবরটা পেয়ে যাব।, রসময় তার জবাব দেয়।

সুব্রত বুঝতে পারে রসময় নিশ্চয়ই কোন খবর সংগ্রহ করে এনেছে, নচেৎ এই শীতের রাত্রে ছুটে আসত না এতদূরে।

রসময় এসে ঢুকল। হাতে একটা ছোট ফোলিও ব্যাগ।

আসুন—আসুন রসময়বাবু, আসুন।

রসময় বসল।

তারপর কি খাবেন বলুন? চা কফি—

না, না। সে-সবের কিছু প্রয়োজন নেই।

বিলক্ষণ, তাই কি হয়! কফিই আনানো যাক।

সুব্রত ভৃত্যকে ডেকে দু কাপ কফির নির্দেশ দিল।

তারপর, এনি নিউজ? কিছু খবর আছে?

আছে।

ফোলিওটা পেয়েছেন নাকি?

নিশ্চয়ই, এই দেখুন।

সুটকেস থেকে একটা কালো মরক্কো লেদারের দামী ফোলিও ব্যাগ রসময় বের করে দিল। ব্যাগটা নোংরা হয়ে গিয়েছে।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল সুব্রত ফোলিও ব্যাগটা।

এম. এন. রায় নামটা সোনার জলে মনোগ্রাম করা আছে ফোলিও ব্যাগের গায়ে।

সুব্রত ব্যাগটা খুলে ফেলল।

ব্যাগের ভিতরে কিছু টাকা পাওয়া গেল। নোট, শ পাঁচেকের হবে। একশো টাকা ও দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট।

কিছু টাইপ করা কাগজপত্র।

সব কিছু ঘাঁটা—এলোমেলো যেন ভিতরটা।

সুব্রত ব্যাগটা ধীরে ধীরে আবার বন্ধ করে রাখল।

এই ব্যাগটাই খুঁজছিলেন তো স্যার?

হ্যাঁ।

পেলেন?

কি?

যা খুঁজছিলেন! রসময়ের কণ্ঠে আগ্রহ ও উত্তেজনা।

সুব্রত মৃদু হেসে বলে, ব্যাগটাই আমি খুঁজছিলাম রসময়বাবু, অন্য কিছু নয়।

ভৃত্য কফি নিয়ে এল ঐ সময়।

কফি পান করবার পর রসময় বলে, সে-রাত্রে এগারটায় গোয়ালন্দর দিকে একটা গুডস্ ট্রেন গেছে স্যার। এবং সেই টেনে রূপশ্রী কটন মিল থেকে সাতটা ওয়াগন গেছে।

কখন সেগুলো গুড্‌স ট্রেনের সঙ্গে অ্যাটাচড্ করা হয়?

রাত আটটার পর। একটা ইঞ্জিন গিয়ে মিল ইয়ার্ড থেকে ওয়াগনগুলো টেনে এনে মেল ট্রেনের সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেয়।

হুঁ, তাহলে ঐ সময়ই—। অন্যমনস্ক ও কতকটা যেন আত্মগত ভাবে কথাটা বলে সুব্রত।

কি স্যার?

না, কিছু না।

আরও একটা খবর আছে স্যার।

কি বলুন তো?

সে-রাত্রে সন্ধ্যার সময়, মানে ছটা নাগাদ মিঃ গাঙ্গুলী রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। এবং রাত আটটা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন।

সত্যি!

হ্যা স্যার, ঋষি বললে। আরও একটা জিনিস পেয়েছি স্যার ঐ ব্যাগ খুঁজতে খুঁজতে রেল লাইনের উপরে।

কি?

রসময় এবারে একটা ইংরাজী 'এস' অক্ষরের মত অনেকটা দেখতে লোহার হুক যা সাধারণতঃ ঘরে ফ্যান টাঙাবার জন্য প্রয়োজন হয়, সঙ্গে একখণ্ড দড়ি-বাঁধা—সুটকেস থেকে বের করল।

দেখুন এটা—দেখুন এতে রক্ত শুকিয়ে আছে।

সুব্রত পরীক্ষা করে দেখল রসময়ের কথাটা মিথ্যা নয়। সত্যিই দড়িটার গায়ে রক্তের দাগ। সুব্রতর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সে বলে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ রসময়বাবু। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল, মৃতের চোখ-মুখ-মাথা কেন অমন করে থেঁতলে গিয়েছে।

॥ বারো ॥

পরের দিন সকাল।

মৃণাল সেনকে ফোন করে সুব্রত ডেকে এনেছিল তার বাড়িতে।

দুজনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। সামনে কফির পেয়ালা।

সুব্রত বলছিল, এখন তো স্পষ্টই বুঝতে পারছেন মিঃ সেন, সে-রাত্রে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। হত্যাকারী কৌশলে ঐ টাইপ করা চিঠির সাহায্যে মিঃ রায়কে অকুস্থলে টেনে নিয়ে যায় বিশেষ কোন কারণে এবং তারপর তার কাজ হাসিল হওয়ার পর সে তাকে হত্যা করে এবং সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত—

আপনার তাই মনে হয়? মৃণাল সেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় সুব্রতর মুখের দিকে।

হ্যাঁ।

সুব্রত অতঃপর বলতে লাগল, প্রথমতঃ হত্যাকারী জানত মিঃ গাঙ্গুলী তার বন্ধু, তাকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালে তিনি যাবেনই—তাই সে চিঠি পাঠিয়েছে এবং ডাকে না পাঠিয়ে লোক মারফত পাঠিয়েছে যাতে করে ব্যাপারটা মিঃ রায় মনে করেন জরুরী।

একটু থেমে বলে আবার, দ্বিতীয়তঃ সে আরও জানত মিঃ রায় রাত্রে আগরপাড়া গেলে তাঁর গাড়িতে যাবেন না—ট্রেনেই যাবেন। তৃতীয়তঃ—হত্যাকারী এমন একটা দিন বেছে নিয়েছিল যেদিন শনিবার, ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড় চারটের পর আর থাকবে না—এবং শীতের সময় ও পরের দিন ছুটি বলে রাস্তায় ঐ সময়টা লোক-চলাচলও বেশী থাকবে না। চতুর্থ, সে জানত মিঃ রায়কে রিকশায় করেই দেশবন্ধু কলোনীতে যেতে হবে—হেঁটে অতটা পথ তিনি যাবেন না।

এরপর মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখুন—প্রধান জায়গা থেকে আগরপাড়ার কলোনীটা বিচ্ছিন্ন। কাজেই ওদিকটা আরও নির্জন হবে। তারপর শনিবার ও শীতের রাত বলে ঐ জায়গাটায় মানুষের চলাচল এক প্রকার ছিল না বললেই চলে সেদিন ঐ সময় এবং সেই কারণেই ঐ সময় হত্যাকারীর তাঁকে গুলি করে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে হত্যা করা খুব একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার কিছু ছিল না।

পঞ্চম: সে ঠিক করেছিল ব্যাপারটাকে একটা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনায় দাঁড় করাতে পারলে সব দিক দিয়েই তার পক্ষে সুবিধা হবে।

একটু থেমে আবার সুব্রত বলে, তাই সে মিঃ রায়কে হত্যা করবার পর ঐ হুকটার সঙ্গে মিঃ রায়ের গ্রেট কোটটা বিঁধিয়ে ওটা রূপশ্রী কটন মিলের বাইরে যে

লোডেড ওয়াগনগুলো ছিল তার একটার সঙ্গে বেঁধে দেয়।

ওয়াগনগুলো তারপর যখন এঞ্জিন টেনে নিয়ে যায় সেই সময় মৃতদেহ লাইন-স্লিপার ও পাথরের ওপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে যায় এবং ঐভাবে হেঁচড়ে হেঁচড়ে যাওয়ায় হয়ত একসময় দড়িটা ছিঁড়ে লাইনের উপরই পড়ে যায়—যার ফলে মুখটা অমন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়—নচেৎ গুলি লেগে ওভাবে থেঁতলে যেতে পারে না মুখটা অমন করে মৃতদেহের।

ঐভাবে মৃতদেহের মুখটা বিকৃত করার পিছনে হয়ত আরও একটা অভিসন্ধি হত্যাকারীর ছিল। চট করে মৃতদেহ যাতে কেউ আইডেন্টিফাই না করতে পারে এবং সে কারণেই হয়ত ফোলিও ব্যাগটাও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এত করেও হত্যাকারী দুটো ভুল করেছে—যা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ হত্যার ব্যাপারে হয়ে থাকেই—

কি রকম?

প্রথমতঃ হত্যাকারী ঐ টাইপ করা চিঠি পাঠিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ মিঃ রায়ের জামার পকেট থেকে তাঁর পার্সটা নিতে ভুল করে। পার্সটা না পেলে হয়ত এত সহজে আমরা এতখানি এগুতে পারতাম না, এখনও হয়ত অন্ধকারেই আমাদের ঘুরে ঘুরে মরতে হত।

সুব্রত একটু থেমে আবার বলতে লাগল, এবার দেখা যাক খুনী বা হত্যাকারী এক্ষেত্রে কে হতে পারে। যেভাবে মিঃ রায় নিহত হয়েছেন তাতে মনে হয় হত্যাকারী বাইরের কেউ তাঁর অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি নয়। যারা মিঃ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল তাদেরই মধ্যে একজন কেউ।

সে-কথা বলতে গেলে তো অনেকেই সন্দেহের তালিকায় এসে পড়েন—মৃণাল সেন মৃদুকণ্ঠে বলে।

নিশ্চয়ই। ছোট ভাই সুরেন্দ্র, দুই ছেলে সৌরীন্দ্র ও ভবেন্দ্র, ম্যানেজার মিঃ মুখার্জী, বন্ধু মিঃ মণীন্দ্র গাঙ্গুলী প্রত্যেকেই। কিন্তু—

কি? মৃণাল সেন সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

হত্যাকারীকে বিচার করতে হবে—মোটিভ' প্রোবাবলিটি ও চান্স, সব দিক দিয়েই। প্রথম দেখা যাক—প্রোবাবলিটির দিক থেকে কাকে কাকে ওদের মধ্যে সন্দেহ করা যায় বা যেতে পারে।

একটু থেমে সুব্রত বলতে লাগল, মিঃ রায়ের মৃত্যুতে যাদের নাম করলেন ওরা সকলেই জানত ওদের মধ্যে যে কেউই লাভবান হবে। এখন দেখা যাক কে কোথায়

হত্যার সময় ছিল—বড় ছেলে সৌরীন্দ্র অকুস্থান থেকে দুর্ঘটনার সময় অনেক দূরে ছিল—কাজেই তাকে আপাততঃ বাদ দেওয়া যেতে পারে সন্দেহের তালিকা থেকে, যদিও বাপের সঙ্গে তারও বনিবনা ছিল না, বাপের মৃত্যুতে সে লাভবানও হত—

দ্বিতীয়ত, ছোট ছেলে ভবেন্দ্র। দুর্ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে কলকাতায় দেখা গিয়েছিল। বাপের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। বাপকে সে শাসিয়ে যায়—শুধু তাই নয়, সে একজন আর্মির লোক, আমি '৩৮ রিভলবারও তার কাছে থাকা সম্ভব। মোটিভ তো তার ছিলই, উপরন্তু চান্সও ছিল প্রচুর।

ছোট ভাই সুরেন্দ্র—

হ্যাঁ, ছোট ভাই সুরেন্দ্র। দুর্ঘটনার রাত্রে সে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাড়িতেই ছিল। তারপর এক বন্ধু এসে তাকে তাসের আড্ডায় টেনে নিয়ে যায়। সেখানে রাত দুটো পর্যন্ত তাস খেলেছে। অতএব তার ক্ষেত্রে প্রোবাবলিটি একেবারে nil। মোটিভ থাকলেও চান্সের কথা তো আসেই না—

মিঃ গাঙ্গুলী? মৃণাল প্রশ্ন করে এবারে।

হ্যাঁ, মিঃ গাঙ্গুলীর কথাটা বিশেষ করে জানতে হবে—কারণ তাঁর সময়ের এলিবাইটা এখনও প্রমাণ হয়নি—মোটিভ অবশ্য ছিল—চান্স তো খুবই বেশী ছিল।

বিশেষ করে ঐ টাকার ব্যাপারটা—

হ্যাঁ—সেটাও আমি ভাবছি, তারপর ধরুন মিঃ মুখার্জী। তিনি প্রথমতঃ উইলের ব্যাপারটা সব জানতেন এবং দ্বিতীয়তঃ মিঃ রায়ের মৃত্যুতে তিনি বিশেষ ভাবে লাভবান হবেন। সব চাইতে বড় কথা ঐদিনকার মিঃ মুখার্জীর গতিবিধি সম্পর্কেও আমরা সঠিক কোন প্রমাণ যোগাড় করতে পারিনি আজ পর্যন্ত—

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা জানি না, ঐ বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলীই মিঃ রায়ের হত্যাকারী। মৃণাল সেন বলে।

সুব্রত কোন জবাব দেয় না। মৃদু হাসে।

॥ তেরো ॥

ময়না তদন্ত করে জানতে পারা গেল মৃত্যুর কারণ রিভলবারের গুলি—গুলিটা তাঁর ব্রেন ম্যাটারের মধ্যে ইমপ্যাকটেড হয়েছিল—বেস্ অফ দি স্কাল ভেদ করে থ্যালামাসে গিয়ে পৌঁচেছিল এবং মৃত্যু তাতেই হয়েছে।

সেনের ধারণা, মহেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর কারণ অ্যাক্সিডেন্ট বা আত্মহত্যা

কোনটাই নয়—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে রিভলবারের গুলির সাহায্যে।

দিন দুই পরে।

শীতের ধোঁয়া যেন কলকাতা শহরের পথে একটা শ্বাসরোধকারী পর্দা টেনে দিয়েছে।

সুব্রত এসে তার গাড়ি থেকে নামল মিঃ রায়ের গড়িয়াহাটার বাড়ির পোর্টিকোর সামনে।

বেল বাজাতেই বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

কাকে চাই ?

মিস রায় আছেন ?

হ্যাঁ।

তাঁকে আমার সেলাম দাও, বল সুব্রতবাবু এসেছেন।

বসুন এসে ভেতরে। আমি খবর দিচ্ছি।

বেয়ারা সুব্রতকে ড্রইংরুমে বসিয়ে ভিতরে চলে গেল খবর দিতে।

হঠাৎ জুতোর একটা শব্দ শুনে সুব্রত মুখ তুলে তাকায়—ডাঃ নীরেন সান্যাল।

মিঃ রায় না! নীরেন সান্যাল বলে।

হ্যাঁ, নমস্কার।

কুন্তলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বুঝি ? সে আসছে। তারপর আপনাদের ইনভেসটিগেশন কতদূর এগুলো ?

একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে—মার্ডার।

বলেন কি !

হ্যাঁ, পোস্টমর্টেমে ব্রেনে বুলেট পাওয়া গিয়েছে।

রিয়েলি !

হ্যাঁ।

স্যাড—আচ্ছা মিঃ রায় চলি। গুডনাইট্।

গুডনাইট্।

ডাঃ নীরেন সান্যাল চলে গেল।

একটু পরেই কুন্তলা এসে ঘরে ঢুকল। সমস্ত চোখেমুখে একটা ক্লান্তি যেন ব্যাপ্ত হয়ে আছে। চুল বোধ হয় বাঁধেনি আজ কুন্তলা। রুক্ষ তেলহীন ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে। পরনে কালো ভেলভেট পাড় একটা শাড়ি ও সাদা

ব্লাউজ। পায়ে চপ্পল।

নমস্কার, আপনাকে আজ আবার একটু বিরক্ত করতে এলাম কুন্তলা দেবী!

না না, বিরক্তির কি আছে!

কুন্তলা সামনের একটা সোফায় উপবেশন করল।

পুলিস বলছে, মানে তাদের মতে এটা একটা হত্যা—মানে মার্ডার কেস, সুব্রত বলে।

না না, এ আপনি কি বলছেন সুব্রতবাবু!

হ্যাঁ, ব্রেন ম্যাটারে গুলি পাওয়া গিয়েছে—রিভলবারের গুলি!

এ—এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। বাবাকে হত্যা করবে কে, আর—আর কেনই বা হত্যা করবে—

আচ্ছা মিস্ রায়—রিসেণ্টলি আপনার ছোড়দা কি কলকাতায় এসেছিলেন?

না—না তো!

ঠিক জানেন?

হ্যাঁ, তবে-

তবে?

মাসখানেক আগে ছোড়দার একটা চিঠি আমি পেয়েছিলাম।

চিঠি!

হ্যাঁ।

কি লিখেছিলেন তাতে তিনি?

কুন্তলা একটু যেন চুপ করে থাকে। একটু যেন ইতস্তত: করে, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, ছোড়দা কিছু টাকার জন্য আমাকে লিখেছিল।

টাকা!

হ্যাঁ, বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে তাকে যদি পাঠাতে পারি তাই লিখেছিল।

কেন টাকার দরকার সে-সম্পর্কে কিছু লিখেছিলেন চিঠিতে আপনাকে?

না—তবে ছোড়দা চিরদিনই একটু বেশী খরচে—একটু বেহিসাবী—হয়ত কিছু ধার-দেনা হয়েছিল।

তা আপনি আপনার বাবাকে কথাটা বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

কি বললেন তিনি?

গালাগালি করলেন। টাকা দেননি।

আপনি সে-কথা আপনার ছোড়দাকে জানিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

তারপর তাঁর আর কোন চিঠি পাননি ?

না। কিন্তু কেন—কেন এত কথা আপনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন সুব্রতবাবু?

কুন্তলার স্বরে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

কুন্তলা দেবী, আপনি বোধ হয় জানেন না একটা কথা—

কি—কি জানি না ?

আপনার ছোড়দা কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন!

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে কুন্তলা। বলে, কে আপনাকে একথা বলল ?

মিঃ মুখার্জী।

মুখার্জী কাকা ?

হ্যাঁ। এবং তিনি আপনার বাবার সঙ্গে গিয়ে অফিসে দেখাও করেন।

কুন্তলার মুখ যেন রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে তখন।

কুন্তলা দেবী।

সাড়া নেই।

মিস রায়!

অ্যাঁ—কুন্তলা মুখ তুলে তাকাল সুব্রতর দিকে।

আপনার সঙ্গেও তিনি দেখা করেছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ।

তিনি কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, কবে কার্যস্থলে ফিরে যান, জানেন কিছু ?

দুদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু এসেছিলেন কেন ? টাকার জন্যে নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ।

টাকাটার খুব প্রয়োজন ছিল, তাই না ?

হ্যাঁ।

কত টাকা ?

প্রায় হাজার টাকা।

টাকাটার যোগাড় হয়েছিল কি ?

বোধ হয় সবটা নয়।

সবটা নয় মানে!

আমি আমার জমানো টাকা থেকে শ'তিনেক টাকা ছোড়দাকে দিয়েছিলাম।

আর একটা কথা, আপনার ছোড়দা মিলিটারী ইউনিফর্মে এসেছিলেন কি ?

হ্যাঁ।

সঙ্গে রিভলবার ছিল ?

হ্যাঁ। কিন্তু কি—কি—কি আপনি বলতে চান মিঃ রায় ?

কিছু না। আচ্ছা এবারে আমি উঠব মিস রায়।

এবং কুন্তলা কিছু বলবার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে এসে সোজা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল সুব্রত।

॥ চোদ্দ ॥

সুব্রত গৃহে ফিরে দেখল মৃণাল সেন তার অপেক্ষায় বসে আছে।

মিঃ সেন, কি খবর—কতক্ষণ ?

তা প্রায় আধ ঘণ্টাটাক হবে। মৃণাল সেন বলে।

চা দিয়েছে আপনাকে ?

দিতে চেয়েছিল আপনার চাকর কিন্তু আমিই না করেছি।

সুব্রত ভৃত্যকে ডাক দিল।

ভৃত্য আসতেই তাকে দু কাপ চায়ের কথা বললে।

তারপর সোফার উপরে গা ঢেলে দিয়ে বসতে বসতে বললে, কাল থেকে আবার শীতটা কেমন জাঁকিয়ে পড়েছে মিঃ সেন! তারপর বলুন খবর কি ? আপনার মত কাজের মানুষ যখন আমার জন্য বসে আছেন বুঝতে পারছি মিঃ রায়ের হত্যার ব্যাপারে আরো কিছু জানতে পেরেছেন।

আপনি বলছিলেন না—আর্মি হেড কোয়ার্টারে সৌরীন্দ্র ও ভবেন্দ্রর রিসেণ্ট মুভমেণ্টের পার্টিকুলারস্ সম্পর্কে জানবার জন্য টেলিগ্রাম করতে ?

আপনি তো করেছিলেন! খবর এসেছে কিছু ?

হ্যাঁ। একটু আগে আই. জি'র কাছে ১৪তম আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে সংবাদ এসেছে ওদের দুজনেরই সম্পর্কে। সেই সংবাদ জানতে পেরেই আপনাকে বলতে এসেছি।

বলুন!

হেড কোয়ার্টার জানাচ্ছে ক্যাপ্টেন সৌরীন্দ্র রায় বর্তমানে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের

সঙ্গে আজ প্রায় দু'মাস হল আরাকান ফ্রন্টেই আছেন। ইতিমধ্যে তিনি কোন ছুটিও নেননি বা ঐ ইউনিট থেকে অন্যত্র ট্রান্সফারও হননি।

আর ভবেন্দ্র ?

সুবেদার ভবেন্দ্র রায় একজন নন্-কমিসণ্ড অফিসার-ক্লার্ক। ওর ওখানকার মেসে প্রচুর ধার-দেনা। অত্যধিক মদ্যপান করে। ইতিমধ্যে একদিন নাকি কোন এক ইউনিটে ডিনার খেতে গিয়েছিল কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, সেখানে তার রিভলবারটি খোয়া যায়।

তারপর ?

ব্যাপারটা একটা কোর্ট অফ এনকোয়ারি বসেছে।

বাট হোয়াট অ্যাবাউট হিজ রিসেণ্ট মুভমেণ্টস্ ?

সেটাই বলছি। গত ১৫ই ডিসেম্বর অর্থাৎ এখানকার দুর্ঘটনায় দশদিন আগে সে দশদিনের ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নাকি কলকাতায় এসেছে। এবং আজ পর্যন্ত সে ফিরে যায়নি।

ফিরে যায়নি ! এখনো কাজে জয়েন করেনি !

না।

অতঃপর সুব্রত মনে হল অন্যমনস্ক ভাবে যেন কি ভাবছে।

মৃণাল সেন সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি ভাবছেন সুব্রতবাবু ?

ভাবছি তাহলে ভবেন্দ্র নিশ্চয়ই এখনো কলকাতায়ই আছে, আর—

আর কি ?

তার বোন কুন্তলা দেবী নিশ্চয় তার খবর জানে। শুনুন, একটা কাজ অবিলম্বে করতে হবে।

কি বলুন !

প্লেন ড্রেসে একজন সি. আই. ডি-কে মিঃ রায়ের গড়িয়াহাটার বাড়ির ওয়াচে রাখুন। সে কেবল বাড়িটার প্রতিই নজর রাখবে না, কুন্তলা দেবীর মুভমেণ্টসের উপরও নজর রাখবে।

বেশ, আমি এখুনিই ফিরে গিয়েই ব্যবস্থা করছি।

আপারপাড়া সলিটারি কর্ণারের উপরে নজর রেখেছেন তো ?

হ্যাঁ। আজ বিকেল পর্যন্ত খবর হচ্ছে গত দুদিন বাড়ি থেকে বেরই হননি মিঃ গাঙ্গুলী।

সুব্রত যেন আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সে যেন কি ভাবছে।

আজ তাহলে আমি উঠি সুব্রতবাবু।

আসুন।

অতঃপর মৃণাল সেন বিদায় নেয়।

সুব্রত উঠে গিয়ে ফোনে সুরেন্দ্রকে ডাকল।

ভৃত্য ফোন ধরেছিল। সে বললে, সুরেন্দ্র বাড়িতে নেই।

দিদিমণি নেই।

আছেন—তাঁকে দেবো?

না, থাক।

ভবেন্দ্র কলকাতাতেই আছে। আর এও ঠিক, কুন্তলা জানে সে কোথায়। কিন্তু কেন, ছুটি শেষ হওয়া সত্ত্বেও ভবেন্দ্র কেন এখনো ফিরে গেল না চাকরিস্থলে?

ডেজার্টার হলে আর্মির লোকের কোর্টমার্শাল হয়, শাস্তি হয়, তা কি সে জানে না!

নিশ্চয়ই জানে। তবে ফিরে যায়নি কেন?

কুন্তলা তার ঐ ছোড়দাকে মনে হয় একটু বেশীই ভালবাসে। ঐ ছোড়দার উপরে তার একটা দুর্বলতাও আছে।

কুন্তলার চেহারাটা সুব্রতর মনের পাতায় যেন ভেসে ওঠে। বিষণ্ণ মুখ। রুক্ষ কেশভার। কপাল ও চোখ দুটি ভারি সুন্দর। যেন কপালের উপরে কয়েকগাছি চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে।

কুন্তলা নামটি ভারি মিষ্টি কিন্তু। ডাকতেও ভাল লাগে।

সুব্রত হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায়। বিরক্ত হয়ে ওঠে নিজের উপরেই। এসব কি ভাবছে সে! আবোল-তাবোল কি এসব চিন্তা সে করছে!

ঘড়ির দিকে তাকাল সুব্রত।

রাত সাড়ে দশটা।

সুব্রত উঠে পড়ল। ভৃত্যকে খাবার দিতে বলল।

পরের দিন।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা হবে। সে রাত্রেও বাইরে প্রচণ্ড শীত। হাড় পর্যন্ত যেন কাঁপিয়ে তোলে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

সুব্রত টেলিফোন ধরে কার সঙ্গে যেন কথা বলল।

ইয়েস স্যার, একটা মিস্টিরিয়াস্ লোক পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকেছে পিছন দিক দিয়ে—বোধ হয় পাঁচ-সাত মিনিট হবে।

কিপ এ ক্লোজ ওয়াচ—আমি আসছি। হ্যাঁ, মৃণাল সেনকে খবর দিয়েছ? তাকে ফোন করেছ?

হ্যাঁ স্যার, ফোন করেছিলাম—কিন্তু তিনি অফিসে নেই।

সুব্রত টেলিফোন রেখে দিল।

পনের থেকে ষোল মিনিটের মধ্যেই সুব্রত ঝড়ের বেগে যেন গাড়ি চালিয়ে গড়িয়াহাটায় মিঃ রায়ের বাড়ির সামনে এসে পড়ল।

কমল নামে যে যুবকটি বাড়ির পাহারায় ছিল সে ছুটে আসে।

এনি ফারদার নিউজ, কমল?

না স্যার।

এখনো বাড়িতেই আছে লোকটা তাহলে?

হ্যাঁ স্যার।

ঠিক আছে। আমি ভিতরে যাচ্ছি। যে পথ দিয়ে ও ভিতরে ঢুকেছে সেখানেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকো। ও নিশ্চয়ই ঐ পথ দিয়েই ফিরে যাবে। ইউ মাস্ট স্টপ হিম। আর কেউ তোমার সঙ্গে নেই?

না স্যার—তবে এখুনি আমার রিলিফ শিবনাথ আসবে।

ঠিক আছে, আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি থেকো।

ঠিক আছে স্যার।

সুব্রত অতঃপর রাস্তায় গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। গেট বন্ধ ছিল।

দারোয়ানকে ডাকতেই সে সাড়া দেয়, কৌন?

দারোয়ানজী গেট খুলিয়ে!

দারোয়ান এগিয়ে এল। সুব্রতকে সে চিনতে পারে, সাব, আপ!

হ্যাঁ, গেটটা খোল। ছোটবাবু কোঠিমে হায় না?

জী নেহি তো, উননে বাহার গয়ে।

দারোয়ান গেট খুলে দিল। সুব্রত ভিতরে প্রবেশ করে।

উপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

সুরেন্দ্রর এ সময় থাকার কথা নয় সুব্রত ভাল করেই জানে। সে এ সময়টা তাস খেলতে যায়। তাই গিয়েছে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢোকা যায় কেমন করে?

ড্রইংরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ।

একটু ইতস্ততঃ করে সুব্রত। যেন মুহূর্তকাল কি ভাবে। তারপর বেল বাজায় একবার।

ভিতরে ডিং-ডিং মিউজিক শোনা যায়।

সুব্রত রুদ্ধ নিশ্বাসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এক-একটা সেকেণ্ড যেন এক একটা ঘণ্টা বলে মনে হয়।

কলিংবেল আর একবার কিন্তু বাজাতে হল না। বেয়ারা দরজা খুলে দিল।

ছোটবাবু—সুরেন্দ্রবাবু বাড়িতে আছেন?

না তো!

কখন বের হলেন?

তা প্রায় ঘণ্টা দুই হবে।

আশ্চর্য, আমাকে এ সময় আসতে বলেছিলেন!

আসতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ, বোধ হয় এসে যাবেন এখুনি। আমি বরং একটু বসি। সুব্রত বলে।

ভৃত্য কোন কথা বলে না।

দিদিমণি আছেন?

হ্যাঁ।

কি করছেন?

দিদিমণির শরীরটা সকাল থেকে খারাপ—শুয়ে আছেন।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও, আমি বসছি।

বেয়ারা আর কথা বলল না। সুব্রত তার অপরিচিত নয়।

দু-চারদিন এখানে এসেছে—একজন পুলিস অফিসারও প্রথমবার সঙ্গে ছিল। সেদিন তো দিদিমণির সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে কথাও বলে গেল।

বেয়ারার মনে কোন সন্দেহ জাগে না।

॥ পনের ॥

বেয়ারা চলে গেল।

তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

দোতলায় একটি ঘরেই মাত্র আলো জ্বলতে দেখেছে সুব্রত গেট দিয়ে ভিতরে

ঢোকবার সময়। নিশ্চয়ই ঐ ঘরটাই কুন্তলার! দক্ষিণ দিকের ঘরটা!

পা টিপে টিপে সুব্রত ড্রইংরুম থেকে বেরুল।

একটা হলঘর। একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। হলঘরটা অন্ধকার। সিঁড়িতে একটা আলো জ্বলছে স্বল্পশক্তির। চওড়া চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে।

সুব্রত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়!

দোতলার বারান্দা। টানা বারান্দা। টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে বারান্দায়। আলো-ছায়ার একটা রহস্য যেন।

দক্ষিণ দিককার ঘরটায় আলো জ্বলছিল। দেখেছে সুব্রত। সেই দিকেই পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়।

কাঁচের শার্সী দিয়ে ঘরের ভিতরকার আলোর আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু জানালায় পর্দা থাকায় ভিতরের কিছু নজরে পড়ে না।

দরজা—দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সুব্রত। মৃদু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে তাকাল সুব্রত। কুন্তলা কুন্তলা পিছন ফিরে দরজার দিকে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা টেবিলে প্লেটে খাবার—কে একজন টুলের উপরে বসে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে।

লোকটার বয়স বেশী হবে না। সাতাশ-আটাশ বলেই মনে হয়। পরনে একটা পায়জামা ও পাঞ্জাবি, তার উপরে একটা আলোয়ান জড়ানো। একমুখ দাড়ি।

খেতে খেতে একসময় লোকটা বলে, না, এমন করে আর পারছি না কুন্তী!

ইউনিটে তুমি ফিরে যাচ্ছ না কেন?

উপায় নেই। উপায় থাকলে কি যেতাম না?

কিন্তু এভাবে পালিয়ে পালিয়েই বা কতদিন বেড়াবে?

কুন্তলা দেবী!

কে?

চমকে দুজনেই ফিরে তাকায়। যুগপৎ কুন্তলা ও ভবেন্দ্র!

ভবেন্দ্র ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

হু—হু ইজ হি? ভবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে বোনকে।

এ কি আপনি—আপনি উপরে এ ঘরে! কুন্তলার স্বরে বিরক্তিটা যেন বেশ স্পষ্টই।

আই অ্যাম ভেরী সরি, অত্যন্ত দুঃখিত মিস রায়। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

উপায় ছিল না মানে—আপনি না বলে-কয়ে—

বললাম তো অত্যন্ত দুঃখিত, ক্ষমা চাইছি।

ভবেন্দ্র আবার প্রশ্ন করে, বাট হু ইজ দিস জেনটেলম্যান, কুন্তী?

সুব্রত বলে, তাছাড়া আপনি হয়ত জানেন না, ফোনে ওঁর এখানে আসবার সংবাদ পেয়েই আমি এখানে এসেছি!

ফোনে সংবাদ পেয়েছেন?

হ্যাঁ। যারা সর্বক্ষণ এ বাড়ি পাহারা দিচ্ছে তারাই আমাকে ও ইন্সপেক্টার মিঃ সেনকে সংবাদটা দিয়েছে, উনি এখানে এসেছেন!

হঠাৎ কুন্তলার মুখটা ফ্যাকশে হয়ে যায়।

মুখের উপরে ক্ষণপূর্বে যে বিরক্তির মেঘটা দেখা দিয়েছিল তার যেন অবশিষ্ট মাত্রও থাকে না। বরং একটা ভয় একটা উদ্বেগের ছায়া যেন মুখের উপরে ভেসে উঠেছে।

সুব্রত ভবেন্দ্রকে দেখিয়ে বলে, উনি আর এখন পুলিসের অজ্ঞাতে এখান থেকে বেরুতে পারবেন না মিস রায়!

কিন্তু কেন—কেন পুলিস ওর গতিবিধির উপরে নজর রেখেছে? একটা চাপা আর্তনাদের মতই যেন প্রশ্নটা কুন্তলার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে।

সেটা আপনার ছোড়দাকেই জিজ্ঞাসা করুন না মিস রায়! সুব্রত শান্ত কণ্ঠে বলে।

ভবেন্দ্র একেবারে চুপ।

সে তখনো ঠিক ব্যাপারটা যেন বুঝে উঠতে পারছে না, কে লোকটা! পুলিসের কোন লোক বলে তো মনে হচ্ছে না। সোজা একেবারে বিনা এত্তেলায় অন্দরে চলে এসেছে এবং তার বোনের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলছে তাতে করে মনে হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে ওদের পরিচয়ও আছে।

সুব্রত আবার বলে, তাহলে সেদিন আপনি আমার কাছে সত্যি কথাটা বলেননি মিস রায়—

সত্যি কথা বলিনি!

কুন্তলা প্রশ্নটা করে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

তাই নয় কি—আপনি জানতেন আপনার ছোড়দা কলকাতাতেই আছেন—

কুন্তলা একেবারে যেন চুপ এবারে। সুব্রত আবার প্রশ্ন করে, কি, জানতেন না মিস রায়?

কুন্তলা মাথা নীচু করে।

এবার সুব্রত ভবেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি নিশ্চয় জানেন

ভবেন্দ্রবাবু, আপনি আর্মির আইনে একজন ডেজার্টার, এবং ডেজার্টারদের মিলিটারী আইনে কোর্টমার্শাল হয়!

ভবেন্দ্র যেন পাথর।

তাছাড়া আপনার মাথায় তো একটা কোর্টমার্শাল ঝুলছে আপনার রিভলবারটা হারানোর জন্য—

রিভলবার! হঠাৎ কুন্তলা চমকে ওঠে।

হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করুন না আপনার ভাইকে! সুব্রত বলে।

ছোড়দা—

কুন্তলার কথা শেষ হল না—ভবেন্দ্র বললে, হ্যাঁ, হারিয়েছে।

কোথায় হারালো—কি করে হারালো?

কুন্তলা যেন কতকটা চাপা আর্তনাদের সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করে।

জানি না—আমি কিছু জানি না—ভবেন্দ্র হঠাৎ বলে ওঠে, তারপর সুব্রতর দিকে তাকায়, চলুন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন আপনি, চলুন—

ছোড়দা—

কুন্তলা চেঁচিয়ে ডাকে আর্ত গলায়।

ভবেন্দ্র বলে, ফেড আপ—আই অ্যাম ফেড আপ, এভাবে কুকুরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে আর পারছি না।

সুব্রত হাসল।

না, ভবেনবাবু আপনি একটু ভুল করেছেন—পুলিস আপনাকে একজন ডেজার্টার হিসাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে ঠিকই এবং মিলিটারীও খুঁজছে—কিন্তু আমি—

সুব্রতকে বাধা দিয়ে ভবেন্দ্র বলে, জানি, জানি—আপনি পুলিসের গোয়েন্দা—

না, তাও আমি নই। পুলিসের বা মিলিটারীর লোক আমি নই—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাকে আমি সম্পূর্ণ অন্য কারণে কয়েকটা প্রশ্ন করবার জন্যেই এসেছি।

প্রশ্ন?

হ্যাঁ, গত ২৩শে ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন আপনি?

কোথায় ছিলাম! ভবেন্দ্র তাকাল সুব্রতর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, বলুন কোথায় ছিলেন আপনি?

মানে আমি—

মিঃ রায়, আমি সেই রাত্রের কথাই বলছি যে রাত্রে আগড়পাড়ায় আপনার বাবা রিভলবারের গুলিতে নিহত হন—

হোয়াট ! বাবা রিভলভারের গুলিতে নিহত হয়েছেন !

একটা যেন আর্ত চিৎকারের সঙ্গে প্রশ্নটা বের হয়ে আসে ভবেন্দ্রর কণ্ঠ থেকে।

হ্যাঁ, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাই বলছে—বুলেটও তাঁর ব্রেন ম্যাটারের মধ্যে ইমপ্যাকটেড হয়েছিল—পাওয়া গিয়েছে এবং এক্সপার্টের মত হচ্ছে—গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল একটা ·৩৮ আর্মি রিভলবার থেকে।

নো—নো—ইউ মিন—

হ্যাঁ, আপনি একজন মিলিটারীর লোক এবং সেই কারণেই ঐ ধরণের রিভলবার আপনার কাছে একটা থাকা সম্ভব বলেই প্রশ্নটা করছি। বলুন—দুর্ঘটনার দিন আপনি সকাল আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?

সুব্রতবাবু ! কুন্তলা যেন কি বলবার চেষ্টা করে।

তাকে বাধা দিয়ে সুব্রত বলে, ওকে বলতে দিন মিস রায়, কোথায় উনি ঐ সময়টা ছিলেন সেদিন—

আমার—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে।

বন্ধুর বাড়িতে—কোথায় ?

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ভবেন্দ্রর মুখের দিকে।

দমদম সিঁথিতে—

সকাল আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত ?

না, বিকেলবেলা শ্যামবাজার এসেছিলাম সন্ধ্যার শোতে সিনেমা দেখতে একবার।

কেউ এর সাক্ষী আছে ?

সাক্ষী ! না—সাক্ষী আবার থাকবে কি—

আপনার সেদিনকার সন্ধ্যার শোতে সিনেমা দেখার ব্যাপারে কেউ সাক্ষী থাকলে হয়ত ভাল হত মিঃ রায়। আচ্ছা মিস রায়, আমি চলি—অসময়ে এভাবে আপনাদের এসে বিরক্ত করবার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

কিন্তু ছোড়দা—কুন্তলা তার কথাটা শেষ করতে পারে না।

সুব্রত বলে, উনি যেতে পারেন—আজকের মত ওঁকে কেউ আটকাবে না। তবে ওঁর প্রতি আমার একটা বিশেষ অনুরোধ, উনি যতশীঘ্র পারেন বেরিলিতে ওঁর ইউনিটে ফিরে যান। আচ্ছা চলি—নমস্কার।

সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ষোল ॥

পরের দিন সকালে।

চায়ের কাপ হাতে করে সুব্রত গত রাত্রের কথাটাই ভাবছিল।

একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে সে এ কদিন এগুচ্ছিল, কিন্তু কাল রাত্রে অতর্কিতে ভবেশ্বের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে সাক্ষাৎ হয়ে যাবার পর সুব্রতর যেন কেন মনে হচ্ছে, মহেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যাপারটার মীমাংসায় পৌছবার জন্য ঘটনাগুলোকে যেভাবে মনে মনে সে এ কদিন ধরে সাজিয়ে নিচ্ছিল হঠাৎ যেন সে সব কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

মনে হচ্ছে আবার বুঝি প্রথম থেকে ভাবতে হবে—নতুন করে শুরু করতে হবে।

একটা সিগারেট ধরালো সুব্রত।

কিন্তু কোথা থেকে কি ভাবে শুরু করা যায়!

হঠাৎ মনে পড়ল কিরীটীকে।

কিরীটীর পরামর্শ নিলে কেমন হয়! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রত উঠে পড়ল। গায়ে জামা দিয়ে বের হয়ে পড়ল।

কিরীটীর ওখানে গিয়ে যখন পৌছল, কিরীটী তখন সবে প্রথম কাপ চা শেষ করে দ্বিতীয় কাপটা হাতে তুলেছে।

সামনে বসে কৃষ্ণা।

দিন দুই হল কিরীটীর ইনফ্লুয়েঞ্জা মত হয়েছে, কালও জর ছিল, আজ জর নেই।

সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে কিরীটী তার মুখের দিকে তাকাল।

সুব্রত এসে একটা সোফায় বসল নিঃশব্দে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে, চা দেবো?

দাও। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলে।

কি রে, একটু যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে! কিরীটী এইবার প্রশ্ন করে সুব্রতকে।

কৃষ্ণা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, ক'দিন আসনি যে?

সে কথার জবাব না দিয়ে সুব্রত মৃদু কণ্ঠে ডাকে, কিরীটী—

উঁ!

একটা মার্ডার কেস নিয়ে গত কদিন ধরে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি ভাই।

গত দশদিনের মধ্যে কই মনে তো পড়ে না, সংবাদপত্রে একটিমাত্র বিশেষ মৃত্যুর ব্যাপার ছাড়া আর কোন দুর্ঘটনার কথা পড়েছি! কিরীটী বলে।

না না রে, দুর্ঘটনার নয়—রীতিমত একটা মার্ডার কেস—

মার্ডার কেস?

হ্যাঁ।

কবে ঘটল?

গত ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার রাত্রে—

তুই কি সেই আগড়পাড়ার রেল স্টেশনের কাছে কে একজন ধনী বিজনেসম্যান—

হ্যাঁ, আমি মহেন্দ্রনাথ রায়ের হত্যার কথাই বলছি।

কিরীটী চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে, আমিও সংবাদপত্রে পড়েছি। পড়ে মনে হচ্ছিল সামথিং মিস্টিরিয়াস—তারপর শুনলাম আই. জি'র কাছে ময়নাতদন্তে মৃতের মাথার মধ্যে নাকি বুলেট পাওয়া গিয়েছে!

হ্যাঁ, সমস্ত ব্যাপারটা শুনলে হয়ত তুই বুঝতে পারবি—হাউ ক্রুয়েলি হি ওয়াজ মার্ডার্ড। মনে হচ্ছে অর্থের জন্যই লোকটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

সুব্রত একটানা কথাগুলো বলে যায়।

তোর ধারণা তাহলে ভদ্রলোককে সত্যি-সত্যিই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে?

অন্ততঃ আমার তো তাই ধারণা। ঘটনাটা তোকে খুলে বলি শোন্। সব আগাগোড়া শুনলে হয়ত তুই বুঝতে পারবি।

সুব্রত অতঃপর সমস্ত ঘটনাটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলে যায়।

পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করে পাইপটা টানতে টানতে কিরীটী আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটা শুনে যায়।

সমস্ত কাহিনী শোনার পর কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে যেন কি ভাবে।

তারপর মৃদুকণ্ঠে কেবল একটি শব্দই উচ্চারণ করে হুঁ!

কিন্তু আরো কিছু যে ঘটনার মধ্যে ইঙ্গিত দিচ্ছে ভায়া। কিরীটী আবার বলে একটু থেমে।

ইঙ্গিত? আরো কিছুর?

হুঁ!

কিসের ইঙ্গিত?

পঞ্চশরের ব্যাপার!

সে আবার কি?

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে এবার বলে, ঐ কুন্তলা দেবী!

কুন্তলা দেবী?

হুঁ, তোর মনে যে ভাবে রেখাপাত করেছেন ভদ্রমহিলা—

রাবিশ! সুব্রত বলে ওঠে।

রাবিশ নয় বন্ধু—মনের দিকে তাকিয়ে দেখ ঐ রাবিশের তলাতেই মনিরত্ন লুকিয়ে আছে—

দেখ, তোর কাছে কোথায় এলাম একটা পরামর্শ নিতে, না তুই ইয়ার্কি শুরু করে দিলি—সুব্রতর কণ্ঠে একটা উষ্মার আভাস ফুটে ওঠে যেন।

কণ্ঠের তোর ঐ উষ্মার সুর কিন্তু বন্ধু অন্য রাগ প্রকাশ করছে!

কৃষ্ণা হেসে ওঠে!

হাসছ কি, কিরীটী বলে স্ত্রীর দিক চেয়ে, বরণডালা সাজাও! না সুব্রত, যাত্রা তোর এবারে সত্যি মাহেন্দ্রক্ষণেই হয়েছে মহেন্দ্রভবনে বলতেই হবে।

তাহলে তুই ইয়ার্কি কর, আমি চলি।

সুব্রত উঠে দাঁড়ায়।

আরে বোস্—আমিও তোর সঙ্গে একমত।

একমত!

হ্যাঁ, ভদ্রলোককে সত্যিসত্যিই গুলি করে হত্যা করে ব্যাপারটাকে একটা অ্যাক্সিডেণ্টের রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তুইও তাহলে তাই মনে করিস?

হ্যাঁ, তবে কতকগুলো জিনিস তুমি এড়িয়ে গিয়েছ বন্ধু!

এড়িয়ে গিয়েছি?

হ্যাঁ।

কি?

প্রথম অর্থাৎ ১নং, ডাঃ নলিনী চৌধুরীর দুই বন্ধুকে লেখা ব্যাঙ্কে ডিপোজিট দেওয়া চিঠি দুটো।

কিন্তু—

ত্রিকোণাকার সেই পৃথক দু'খণ্ড কাগজকে একত্রে জোড়া দাও, হয়ত কোন রহস্যের হদিস পাবে। তারপর ২নং—

কি?

একটি টাইপরাইটিং মেশিন—

টাইপরাইটিং মেশিন!

হ্যাঁ, এই হত্যার ব্যাপারে বিশেষ ক্লু ঐ মেশিনটি, যেহেতু চিঠিটা টাইপ করা ছিল। তারপর ৩নং রিভলবারটি—সেটারও প্রয়োজন।

সেটা—

পেতে হবে। আর ঐ সঙ্গে ৪নং সুরেন্দ্রনাথের এই কদিনের মুভমেণ্টস্!

আর কিছু?

হ্যাঁ। ৫নং, ডাঃ চৌধুরীর কোন উইল ছিল কিনা!

আচ্ছা ঐ মিঃ গাঙ্গুলী সম্পর্কে তোর কি মনে হয় কিরীটী?

না, সে ভদ্রলোক খুন করেন নি—নির্দোষ।

আমারও তাই মনে হয়।

তবে—

কি?

গাঙ্গুলী সাহেবের উপর যে কোনও মুহূর্তে অতর্কিতে আঘাত আসাটা খুব একটা কিছু বিচিত্র নয় কিন্তু···

কেন?

তার কারণ ডাঃ চৌধুরীর চিঠির অর্ধেক তাঁর নামে ছিল। ভাল কথা, ডাঃ চৌধুরীর সে চিঠির অংশটা মানে মিঃ গাঙ্গুলীর অংশটা তো তারই কাছে আছে, তাই না? কিরীটী কথাটা বলে সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ। সঙ্গে দুটোর কপিই আছে—এই যে।

মিঃ গাঙ্গুলীর চিঠিটা ও মিঃ রায়ের চিঠির নকল যেটা মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে পেয়েছিল সুব্রত দুটোই পকেট থেকে বের করে কিরীটীকে দেয়।

দেখি! কিরীটী কাগজ দুটো হাতে নিল।

দেখতে থাকে। তারপর নিঃশব্দে গম্ভীর মনোযোগের সঙ্গে কাগজ দুটো সামনে টেবিলের উপরে মেলে ধরে।

সুব্রত কিরীটীকে প্রশ্ন করে, কিছু বুঝতে পারছিস?

আপাততঃ পারিনি না বটে, তবে—

তবে?

এটা একেবারে অর্থহীন নয়। কিছুর ইঙ্গিতই দিচ্ছে যেন মনে হয়। আমাকে একটা দিন ভাবতে দে সুব্রত, কাল সন্ধ্যায় বরং আসিস একবার।

বেশ, আমি তাহলে এখন উঠি।

আয়। তবে যে পয়েণ্টস্‌গুলো বললাম মনে রাখিস।

সুব্রত কোন কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রতর গমনপথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃদু কণ্ঠে কিরীটী আবৃত্তি করে, পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো একি সন্ন্যাসী—বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে—!

হঠাৎ সেদিন বিকেলের দিকে অসময়ে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। সেই ঝড়ো হাওয়ার সনসনানি।

সুব্রত আর কোথাও বের হল না।

তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে শয্যায় আশ্রয় নেয়। এবং ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমটা ভেঙে গেল রাত বারোটা নাগাদ ক্রমাগত টেলিফোনের শব্দে।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং

আঃ! বিরক্ত হয়ে সুব্রত লেপের তলা থেকে উঠে গিয়ে ফোন ধরে।

হ্যালো --

কে, মিঃ রায়? আমি মৃণাল সেন কথা বলছি।

কি ব্যাপার!

কিছুক্ষণ আগে আগরপাড়া থানা থেকে চ্যাটার্জী ফোন করেছে। মিঃ গাঙ্গুলীর সলিটারী কর্ণারের উপরে যাকে ওয়াচ রাখতে বলা হয়েছিল সে খবর দিয়েছে চ্যাটার্জীকে—গাঙ্গুলী নাকি আত্মহত্যা করেছে।

চ্যাটার্জীকে—গাঙ্গুলী নাকি আত্মহত্যা করেছে।

সে কি!

হ্যাঁ। আমি যাব। আপনি যাবেন?

নিশ্চয়ই, আপনি আমায় তুলে নিয়ে যেতে পারবেন?

পারি।

তাহলে আসুন—আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি।

তাহলে কিরীটীর গতকালের ভবিষ্যৎবাণীই ফলে গেল!

ফোনটা রেখে দিল সুব্রত। বাইরে তখনো বৃষ্টি ঝরছে। সুব্রতর মনে পড়ে ঐদিনের আগের দিন সন্ধ্যাবাত্রের কিরীটীর কথাগুলো। কিরীটী বলেছিল গাঙ্গুলী সাহেবের উপরেও যে কোন মুহূর্তে আঘাত আসাটা কিছু বিচিত্র নয় কিন্তু! কথাটা যে সুব্রতর একেবারে মনে হয়নি তা নয়।

কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি ফলে গেল! তবে কি সত্যিসত্যিই ঐ চিঠির অঙ্কগুলোর মধ্যে কিছু আছে? এবং গাঙ্গুলী আত্মহত্যা করেনি, নিহত হয়েছে?

মিনিট পনেরোর মধ্যেই মৃণাল সেন পুলিস ভ্যান নিয়ে এসে গেল।

বাইরে তখনো সমানে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব চলেছে। শীগগির কমবার কোন সম্ভাবনাই নেই। ওদের গাড়ি খালি রাস্তা ধরে বৃষ্টির মধ্যেই যথাসম্ভব স্পিডে আগরপাড়ার দিকে ছুটে চলে।

চলন্ত গাড়িতে বসেই একসময় মৃণাল সেনকে সুব্রত প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার? চ্যাটার্জী ফোনে আপনাকে কি বলেছেন?

সুব্রত প্রশ্নটা করে মৃণাল সেনের মুখের দিকে তাকাল।

মৃণাল সেনকে ফোনে যা জানিয়েছিলেন জলধর চাটুয্যে—সংক্ষেপে সুব্রতকে সব কথা জানায় সে।

॥ সতের ॥

সন্ধ্যা থেকে আগরপাড়াতেও জলঝড় শুরু হয়।

বিকালের দিকে একবার গাঙ্গুলী পান্থনিবাসে গিয়েছিলেন, বোধ হয় কফি পান করতে এবং জলঝড়ের সম্ভাবনা দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন সলিটারী কর্ণারে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

তার পরই ঝড়-বৃষ্টি শুরু।

রাজেশ বলে যে ছেলেটি ওয়াচ করছিল বাড়িটা—ঝড়বৃষ্টির জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে পান্থনিবাসে আশ্রয় নেয়। ঘণ্টা দুই পরে ঝড়বৃষ্টি একটু কমে। তখন সে আবার পান্থনিবাস থেকে বের হয়ে সলিটারী কর্ণারের দিকে যায়।

বৃষ্টি তখনো টিপ টিপ পড়ছে। বাড়ির কাছে গিয়ে দেখে বাড়িটা অন্ধকার।

প্রথমে রাজেশ ভেবেছিল, ঝড়বৃষ্টির জন্যে বোধ হয় তাড়াতাড়ি মিঃ গাঙ্গুলী খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন।

কিন্তু তারপরই হঠাৎ নজরে পড়ে, বাড়ির সদর দরজাটা হা-হা করছে খোলা। হাওয়ায় খুলছে আর শব্দ করে বন্ধ হচ্ছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক এবং রাজেশকে যেন কেমন সন্দিগ্ধ করে তোলে।

সে এগিয়ে যায় এবং খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢোকবার পর সেখানেও দেখে অন্ধকার। কারও কোন সাড়া-শব্দ নেই—যেন একটা পরিত্যক্ত হানাবাড়ি।

অবশেষে রাজেশ টর্চের আলোর সাহায্যে মিঃ গাঙ্গুলীর ঘরে গিয়ে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ায়।

ঘরের এক কোণে একটা রাইটিং টেবিল। তার সামনে চেয়ারে বসে গাঙ্গুলী,

তাঁর মাথাটা টেবিলের উপরে ন্যস্ত। বাঁ হাতটা টেবিলের উপরে বিস্তৃত এবং ডান হাতটা অসহায়ের মত ঝুলছে। সেই হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা একটা রিভলবার।

টেবিলের কাচের উপরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে অনেকটা জায়গা নিয়ে। সোফাতেও কিছু গড়িয়ে পড়েছে। কপালের মাঝামাঝি একটা বেশ বড় রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন।

ঘরের সব জানালাগুলো বন্ধ। পিছনের বাগানের দিককার জানালাটা খোলা। আর ঘরের দরজাটাও খোলা।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, মিঃ গাঙ্গুলীর চাকরটা কোথায় ছিল ঐ সময়?

সে তখন ছিল না।

ছিল না মানে?

বাইরে গিয়েছিল এবং একটু পরেই ফিরে আসে। সে নাকি দুপুরের দিকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

তাহলে বাড়িতে কেউ ছিল না ঐ সময়ে একমাত্র মিঃ গাঙ্গুলী ছাড়া?

না।

তারপরই একটু হেসে মৃণাল সেন বলে, তখন যদি মিঃ গাঙ্গুলীকে আপনি অ্যারেস্ট করতে দিতেন সুব্রতবাবু, তবে হয়ত এভাবে মিঃ গাঙ্গুলী আমাদের ফাঁকি দিতে পারতেন না। ধরা পড়বার ভয়েই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন হয়ত ভদ্রলোক।

না মিঃ সেন—সুব্রত বলে, মহেন্দ্রনাথের হত্যাকারী উনি নন।

এখনো আপনি তাই বলছেন?

হ্যাঁ।

তবে কে?

আর যেই হোক, আপাততঃ বলতে পারি মিঃ গাঙ্গুলী নন।

মৃণাল সেন অতঃপর চুপ করে থাকে।

ওরা যখন আগরপাড়া থানায় এসে পৌঁছল রাত তখন সোয়া একটা।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে।

তবে হাওয়া একেবারে থামেনি। হাওয়া চলেছে।

জলধর চাটুয্যে ছিলেন না, থানার ছোটবাবু সুশীল সোম ছিলেন।

তিনি বললেন, স্যার, আপনাদের বড়বাবু সোজা সলিটারী কর্ণার চলে যেতে বলেছেন।

ওরা তখনি আবার সলিটারী কর্ণারের দিকে গাড়ি ছোটায়।

ওরা যখন সলিটারী কর্ণারে গিয়ে পৌঁছল, জলধর চাটুয্যে নানাভাবে তখনো মিঃ গাঙ্গুলীর ভৃত্যকে ক্রস করছিলেন।

লোকটা জবাব দিচ্ছে আর কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছছে।

মৃণাল সেনকে দেখতে পেয়ে জলধর চাটুয্যে বলেন, এ নিশ্চয় আমার মনে হয় মিথ্যে বলছে, সেন সাহেব! ও ঝড়জলের আগেই ফিরে এসেছে!

সুব্রত একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে যে ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সত্যিই করুণ দৃশ্য।

টেবিলের সামনেই নীচে মেঝেতে একটা বই পড়ে আছে। একটা নাম-করা ইংরেজী উপন্যাস। সেই উপন্যাসের মলাটের উপরেও কয়েকটা রক্তের ফোঁটা জমাট বেঁধে আছে।

মৃণাল সেন বলে, মনে হচ্ছে এ ক্লিয়ার কেস অফ সুইসাইড। বোধ হয় পড়তে পড়তে একসময় ডিসিশন নেন, তারপরই রিভলবারটা বের করে নিজের মাথায় গুলি করেছেন।

সুব্রত মৃদু কণ্ঠে বলে, একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হয় ব্যাপারটা মিঃ সেন!

কি?

পড়তে পড়তে হঠাৎ সুইসাইড করা। তাছাড়া সে রকম হলে বইটা মাটিতে না পড়ে হয়ত টেবিলের উপরেই থাকত!

তারপরই হঠাৎ মেঝের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলে, সারা ঘরময় এত পোড়া কাগজ কেন বলুন তো?

সত্যিই তো ঘরময় পোড়া কাগজ!

সুব্রত তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে দেখতে পেল, ঘরের কোণে কি যেন পোড়ানো হয়েছে। তার সুস্পষ্ট চিহ্নও রয়েছে।

এগিয়ে গেল সুব্রত সেদিকে।

কিন্তু আধপোড়া কাগজও তখনো সেখানে পড়ে আছে।

কৌতূহলভরে সুব্রত আধপোড়া কাগজগুলো তুলে নিল।

বিক্ষিপ্তভাবে চোখে পড়ল কতকগুলো অঙ্ক, সেই পোড়া কাগজের বুকে—১৫, ২১, ২০, ১৩ ইত্যাদি।

হঠাৎ মনে পড়ে সুব্রতর। অঙ্কগুলো তার পরিচিত।

ভাবতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই চিঠি দুটোর কথা।

ডাঃ চৌধুরীর লেখা দুই বন্ধুকে দুখানা চিঠি।

কিরীটী বলেছিল সেদিন একটা কথা, একেবারে অর্থহীন নয়—কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে যেন মনে হয়!

তবে কি মিঃ গাঙ্গুলী মরার আগে ঐ অঙ্কগুলো থেকে কোন কিছুর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন?

রহস্য যেন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আবার মনে হয় সুব্রতর, মৃণাল সেন যা বলছে তাও তো হতে পারে, হয়ত মিঃ গাঙ্গুলী আত্মহত্যাই করেছেন! কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়, আত্মহত্যাই বা হঠাৎ তিনি করতে যাবেন কেন? তিনি তো মিঃ রায়ের হত্যাকারী নন? তবে?

আরো কতকগুলো প্রশ্ন ঐ সঙ্গে মনের মধ্যে জাগে। বইটা মাটিতে কেন? পোড়া কাগজগুলো কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? ঘরের দরজাটা ও সদর দরজাটা খোলা ছিল কেন? ঘরটা অন্ধকার ছিল কেন?

আরও কিছুক্ষণ পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এবং সলিটারী কর্ণারে পুলিস প্রহরা রেখে মৃণাল ও সুব্রত ফিরে এল।

মিঃ গাঙ্গুলীর ভৃত্যকেও অ্যারেস্ট করা হল।

গৃহে ফিরে প্রথমেই সুব্রত কিরীটীকে ফোন করল।

কি খবর? কিরীটী শুধায়।

সলিটারী কর্ণারের ব্যাপারটা সুব্রত বললে।

কি মনে হয় তোর কিরীটী, আত্মহত্যা?

না, আত্মহত্যা নয়।

আমারও তাই মনে হয়েছে। আর একটা মার্ডার!

তোর অনুমান মিথ্যে নয় বলেই মনে হয় সুব্রত।

পরের দিনই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেল।

পুলিস সার্জেন ডাঃ মজুমদার রিপোর্ট দিয়েছেন, মৃণাল সেন রিপোর্টটা নিয়ে এসেছেন। মৃত গাঙ্গুলীর ব্রেনের মধ্যে বুলেট পাওয়া গিয়েছে।

বুলেট! সুব্রত বলে।

হ্যাঁ, দেখুন। পকেট থেকে একটা বুলেট বার করে দেয় মৃণাল সেন।

সুব্রত দেখল একই ধরনের বুলেট।

মিঃ সেন! সুব্রত ডাকে।

বলুন?

মৃণাল সেন তাকাল সুব্রতর মুখের দিকে।

মৃতদেহের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যে রিভলবারটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা কোথায়?

লালবাজারে আছে।

চলুন, সেটা নিয়ে একবার মেজর সিনহার ওখানে যাওয়া যাক।

বেশ তো, চলুন।

দুজনে উঠে পড়ে। সোজা দুজনে লালবাজারে যায়।

সেখান থেকে রিভলবারটা নিয়ে মেজর সিনহার গৃহে যায়।

মেজর ওদের দেখে বলেন, কি ব্যাপার? সুব্রতবাবু, উনি—

ইন্সপেক্টার মৃণাল সেন। আপনাকে আবার একটু বিরক্ত করতে এলাম।

কি ব্যাপার!

সেই বুলেটটার কথা আপনার মনে আছে, মেজর?

আছে বৈকি। রিভলবারটা ট্রেস করতে বলেছিলাম, পাওয়া গেল?

হ্যাঁ।

পাওয়া গেছে?

সুব্রত তখন রিভলবার ও দ্বিতীয় বুলেটটা বের করে মেজরের হাতে দিয়ে বলে দেখুন তো মেজর এ দুটো পরীক্ষা করে!

মেজর সিনহা প্রথমে বুলেটটা পরীক্ষা করলেন—তারপর রিভলবারটা।

হুঁ, এ তো দেখছি '৩৮ ওয়েবলি রিভলবার। আর এখন বুঝতে পারছি—

কি?

কেন—কেন—হোয়াই—বুলেটটার গায়ে দাগ পড়েছিল!

কেন?

রিভলবারের ব্যারেলের ভিতরটা কোন কারণে ড্যামেজড্ হয়েছে!

ড্যামেজড্!

হ্যাঁ, মনে হয় অ্যাসিড বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর অ্যাকশনে ড্যামেজ্ হয়ে গিয়েছে, তাইতেই এই রিভলবার থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেটের গায়ে অমন খাঁজ কেটে গিয়েছে।

তার মানে, মেজর আপনি বলতে চান—দিস ইজ দি রিভলবার—

হাঁা, সুব্রতবাবু। আমার স্থির ধারণা, এই রিভলবার থেকেই ঐ দুটো বুলেট ছোঁড়া হয়েছে।

ধন্যবাদ মেজর। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। সুব্রত বললে।

তারপর মৃণাল সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন মিঃ সেন, ওঠা যাক।

মেজরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বাইরে এসে গাড়িতে উঠে বসে।

মিঃ সেন! সুব্রত ডাকে।

বলুন।

আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি?

আজই বেরিলিতে ভবেন্দ্র রায়ের ইউনিটে একটা জরুরী তার পাঠান। ঐ রিভলবারের নম্বরটা দিয়ে ৫৬৩৭৭৯ সুবেদার মেজর ভবেন্দ্র রায়ের যে রিভলবারটা হারিয়েছে সেটারও ঐ নম্বর কিনা এবং ভবেন্দ্র ইউনিটে ফিরে গিয়েছে কিনা খবর নিন।

নিশ্চয়ই—আজই পাঠাব।

দুদিনের মধ্যেই তারের জবাব এল।

যে রিভলবারটা ভবেন্দ্রর কাছ থেকে খোয়া গিয়েছে তার নম্বর ঐ একই অর্থাৎ ৫৬৩৭৭৯ এবং ওয়েবলি '৩৮ রিভলবার।

আর জানালেন ভবেন্দ্র ইউনিটে ফিরে গিয়েছে গতকালই। সে এখন ওপন অ্যারেস্ট আছে। কোর্ট অফ এনকোয়ারী শীঘ্রই বসবে।

মিঃ সেন প্রশ্ন করে, তবে কি ঐ ভবেন্দ্রই, সুব্রতবাবু—

কি?

তার বাপকে হত্যা করেছে?

না। সুব্রত মৃদু হাসল।

না—তবে কে?

দু-একদিনের মধ্যেই আশা করি জানতে পারবেন।

আমি তাহলে এবারে উঠি।

আসুন।

মৃণাল সেন অতঃপর বিদায় নিল।

সুব্রত বলেছিল, হত্যাকারী কে দু-একদিনের মধ্যেই জানা যাবে কিন্তু তার প্রয়োজন হল না।

ঐদিনই রাত্রে ঘটনাটা ঘটল।

সুব্রত একাকী তার ঘরের মধ্যে বসে একটা রহস্য উপন্যাস পড়ছিল।

সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে কিরীটীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে।

অনেক আলোচনা হয়েছে।

সবশেষে কিরীটী বলেছে, অঙ্কগুলোর রহস্য বোধ হয় সল্‌ভ্‌ করতে পেরেছি।

সুব্রত শুধিয়েছিল, কি রহস্য?

কিরীটী জবাব দিয়েছে, আর দুটো দিন ভাবতে চাই। তারপর—

সুব্রতবাবু!

কে? সুব্রত চমকে সামনের দিকে তাকায়।

এ কি, আপনি! এত রাত্রে, কি ব্যাপার! আসুন আসুন, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে আসুন!

সুব্রত সাদর আহ্বান জানায়।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কুন্তলা। কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে সুব্রত টেরই পায়নি।

গায়ে একটা দামী কাশ্মীরী শাল। শালটা মাথায় ঘোমটার মত করে তুলে দেওয়া।

কুন্তলা এসে ঘরে ঢুকল।

বসুন।

কুন্তলা সামনের খালি চেয়ারটার উপরে বসে।

ছোড়দাকে আপনি বাঁচান সুব্রতবাবু—কথাটা বলতে বলতে দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে কুন্তলা।

॥ আঠারো ॥

কুন্তলা কাঁদছে। সুব্রত নিজেকে যেন ঘটনার আকস্মিকতায় অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে।

কি বলবে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

কেবল মৃদুকণ্ঠে কুন্তলাকে অনুরোধ জানায়, কুন্তলা দেবী, আমাকে সব কথা খুলে বলুন।

কুন্তলা কোন জবাব দেয় না, কাঁদতেই থাকে ফুলে ফুলে।

প্লীজ বলুন!

ধীরে ধীরে কুন্তলা এবার মুখ তুলল।

তার চিবুক ও গণ্ড অশ্রুতে প্লাবিত। দু'চোখের কোণে তখনো টলমল

করে অশ্রু।

সুব্রতবাবু!

বলুন।

ছোড়দা—ছোড়দা সেদিন আপনাকে মিথ্যা কথা বলছিল।

আমি তা জানি কুন্তলা দেবী। শান্ত কণ্ঠে সুব্রত জবাব দেয়।

জানেন?

জানি বৈকি। আর এও জানি গত ২৩শে ডিসেম্বর আপনার ভাই সমস্ত দিন সিঁথিতে তাঁর যে বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলেন সেখানে ছিলেন না—এবং তিনি যে আমাকে সে-রাত্রে বলেছিলেন ঐ সময় সিনেমাতে গিয়েছিলেন তাও মিথ্যা।

মিথ্যা!

হ্যাঁ, মিথ্যা বলেছিলেন তিনি। এবং যতক্ষণ না তিনি বলছেন ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ততক্ষণ তাঁর উপর থেকে পুলিসের সন্দেহটা কিছুতেই যাবে না। বিশেষ করে যখন জানা গিয়েছে তাঁরই রিভলবারে আপনার বাবা ও মিঃ গাঙ্গুলী উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে।

হ্যাঁ, ইন্সপেক্টার আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় গিয়েছিলেন, তিনিও তাই বলে এলেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি সুব্রতবাবু, ছোড়দার চরিত্রে যত দোষই থাক, সে জুয়া খেলে, বেহিসাবী, অসংযমী—কিন্তু সে বাবাকে হত্যা করেনি। তার মনটা এত সফ্‌ট, এত কোমল—

কিন্তু পুলিস তো মনের খবর নিয়ে কাজ করে না কুন্তলা দেবী, আর করবেও না। তারা ফ্যাক্ট নিয়ে সব বিচার করে।

ছোড়দা রাত দশটা পর্যন্ত কোথায় ছিল জানি না সন্ধ্যা থেকে। কিন্তু—

কি বলুন, থামলেন কেন?

বোধ করি তখন সাড়ে এগারোটা হবে, ছোড়দা আমার কাছে এসেছিল সে রাত্রে গড়িয়াহাটার বাড়িতে—সে সময় পরনে ছিল তার মিলিটারি ইউনিফর্ম। মাথার চুল এলোমেলো। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। কেমন যেন অস্বাভাবিক চেহারা।

তারপর?

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোথা থেকে আসছে সে? এত রাত্রে বেরিলি থেকে নাকি?

আচ্ছা, সদর দিয়ে সে-রাত্রে সে বাড়িতে ঢুকেছিল কি?

না, পিছনের পাচিল টপকে।

তারপর ?

সে বললে, না, বেরিলী থেকে সে আট-দশদিন হল এসেছে। ছুটি নিয়ে এসেছে।

বলেছিল ছুটি নিয়ে এসেছে ?

হ্যাঁ, বলেছিল। আরো বলেছিল চাকরি করতে আর ভাল লাগছে না।

তারপর ?

আমি তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন বাড়িতে ওঠোনি ? তাতে বলেছিল—

কি ?

বাড়িতে আর সে কোন দিনও আসবে না। বাবা নাকি তাকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন আপনি চলে আসবার পর বললে, সে, আমার কাছে মিথ্যে বলেছিল। ছুটি নিয়ে আসেনি। পালিয়ে এসেছে।

আর—আর কিছু আপনার ছোড়দা আপনাকে বলেনি ?

না।

কিন্তু আমি জানি—

কি ?

কিছু সে আমার কাছে গোপন করেছে। কিন্তু যাই সে গোপন করে থাকুক না কেন, বাবাকে সে হত্যা করেনি আপনি বিশ্বাস করুন সুব্রতবাবু।

সুব্রত চুপ করে কি যেন ভাবে।

কুন্তলা আবার বলে, ছোড়দাকে আপনি বাঁচান সুব্রতবাবু!

আপনি অধীর হবেন না, শান্ত হোন।

কিন্তু আগে আপনি বলুন, ছোড়দাকে আপনি বাঁচাবেন ?

ঢং করে রাত্রি সাড়ে বারোটা ঘোষণা করল ঐ সময়।

রাত অনেক হয়েছে—চলুন, উঠুন—বাড়ি যান এবার। সুব্রত বলে।

কুন্তলা উঠে দাঁড়ায়। কিসে এসেছেন ? সুব্রত শুধায়।

ট্যাক্সিতে।

ছি ছি, এত রাত্রে এই যুদ্ধের সময় একা একা ট্যাক্সিতে এসেছেন! খুব অন্যায় করেছেন—চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

না, না—আমি একাই যেতে পারব। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

কষ্ট নয়—আপনাকে এত রাত্রে একা একা আমি ছেড়ে দিতে পারি না। সুরেনের ভাইঝি আপনি, তাছাড়া এসময় এত রাত্রে ট্যাক্সিও আপনি পাবেন না।

সুব্রত অতঃপর জামাটা গায়ে দিয়ে গাড়ির চাবিটা নিয়ে বললে, চলুন—

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে গাড়ির দরজা খুলে সুব্রত কুন্তলাকে ডাকে, আসুন উঠুন।

কুন্তলা গাড়িতে উঠে বসল।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হলেও শীত তখনও শহরে বেশ। শীতের আকাশ—কিন্তু কুয়াশার লেশমাত্রও ছিল না, কৃষ্ণা-চতুর্দশীর চাঁদ আকাশে। ম্লান চাঁদের আলোয় যেন প্রকৃতি মূর্ছাতুরা। খাঁ খাঁ করছে রাস্তা।

সুব্রতর গাড়ি হ্যারিসন রোড দিয়ে শিয়ালদহ হয়ে সার্কুলার রোডে পড়ে। পাশেই একেবারে গা ঘেঁষে বসে কুন্তলা। গাড়ির খোলা জানলাপথে হাওয়ায় কুন্তলার চুল উড়ছে। মৃদু একটা ল্যাভেণ্ডারের মিষ্টি গন্ধ নাকে আসে।

এ পথ যদি না ফুরাত! সুব্রতর মনে হয়, যদি অন্তহীন এ পথ হত! আর এমনি করে কুন্তলা তার পাশে থাকত।

ছিঃ, এসব কি ভাবছে সে! মাথা তার খারাপ হয়ে গেল নাকি!

কুন্তলা দেবী!

বলুন?

আপনি কিন্তু খুব অন্যায় করেছেন।

অন্যায় করেছি! কুন্তলা ফিরে তাকায় পার্শ্বে উপবিষ্ট সুব্রতর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, করেছেন! কতটুকু বা আমার সঙ্গে আপনার পরিচয়, বলুন তো? হুট্ করে এত রাত্রে আমার ওখানে চলে এসেছেন—

আমি জানতাম।

কি?

আপনার কাছে যেতে কারোরই কোন ভয়ের কারণ থাকতে পারে না।

জানতেন!

হুঁ।

কি করে জানলেন?

পুরুষকে চিনতে কোন মেয়েরই ভুল হয় না। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

অনুরোধ!

হ্যাঁ, কাকামণির বন্ধু আপনি—আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না আর—

কিন্তু—

'তুমি' বলবেন।

বেশ। একটু থেকে আবার সুব্রত বলে, একটা কথা বলব ?

কি ?

সেদিন অমন করে হঠাৎ রাত্রে তোমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম বলে তুমি আমার ওপরে খুব রেগে গিয়েছিলে, না ?

হ্যাঁ।

আমার তো ভয়ই হয়েছিল, এখুনি বুঝি দারোয়ান ডেকে বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দেবে !

কুন্তলা চুপ করে থাকে।

কিন্তু এখন আর রাগটা নেই তো ?

কুন্তলা কোন জবাব দেয় না।

সে রাত্রে কুন্তলাকে তাদের গড়িয়াহাটার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেল সুব্রত।

॥ উনিশ ॥

অপঘাতে মৃত্যু হলেও নিয়মমাফিক মহেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেল।

কুন্তলাই শ্রাদ্ধ করল।

সুব্রত সেদিন গিয়েছিল কুন্তলার নিমন্ত্রণে তাদের গড়িয়াহাটার বাড়িতে।

তারপর আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। মহেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যাপারটা যেন কেমন চাপা পড়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে আরো দু'দিন সুব্রত কুন্তলাদের ওখানে গিয়েছিল। কুন্তলার সঙ্গে বসে বসে গল্প করেছে।

বেরিলিতে ভবেন্দ্রর কোর্ট অফ এনকোয়ারী চলছে—শেষ হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যায় কুন্তলা তার শোবার ঘরে বসে একটা উলের বুননি নিয়ে আত্মমগ্ন ছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে সামনেই তার দাঁড়িয়ে নীরেন।

কুন্তলা !

তুমি !

হ্যাঁ। নীরেন ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

কুন্তলা, আমি কিন্তু আজ একটা বিশেষ কথা জানবার জন্যই এসেছি।

কুন্তলা তাকাল নীরেনের মুখের দিকে।

বুঝতে পারছ বোধ হয়, যে ব্যাপারে তোমাকে দু'দিন আগে একটা চিঠি দিয়েছি—এবং সে চিঠিটার জবাব তুমি এখনও দাওনি—

কুন্তলা তথাপি চুপ করেই থাকে, হাতের বুননটা নিয়েই যেন সে ব্যস্ত।

চিঠিটা তুমি আমার পেয়েছ নিশ্চয়ই ?

পেয়েছি।

জবাব দাওনি।

না। তারপরই একটু থেমে কুন্তলা বলে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

ক্ষমা করব—কিসের জন্যে ? কি ব্যাপার বল তো ?

কুন্তলা নীরেনের মুখের দিকে তাকাল, চোখ তুলে বললে, আমার পক্ষে তোমার প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় ?

নীরেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

না। শান্ত গলায় আবার জবাব দেয় কুন্তলা।

তা হঠাৎ এ মতের পরিবর্তন ?

নীরেনের গলার স্বরটা যেন বেশ একটু কঠিন মনে হয়।

পরিবর্তন !

তাছাড়া আর কি ! এতদিন তো মতই ছিল—হঠাৎ সুব্রতবাবুর আবির্ভাবে—

নীরেনবাবু !

তুমি মনে কর কুন্তলা দেবী, একমাত্র এ দুনিয়ায় তুমিই চালাক আর আমরা সব বোকা—ঘাস খাই ! সুব্রতবাবুর সঙ্গে যে ঢলাঢলি শুরু হয়েছে ইদানীং—

নীরেনবাবু, ভদ্রভাবে একজন ভদ্রলোকের সম্পর্কে কথা বললেই আমি খুশি হব।

ভদ্রলোক—তাই না ! হঠাৎ ফাঁকতালে বাপের সম্পত্তি পেয়ে মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে !

নীরেনবাবু !

চোখ রাঙাচ্ছ কাকে কুন্তলা দেবী ?

যান—যান এখান থেকে বলছি—

কুন্তলা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।

যাচ্ছি। তবে মনে রেখো কুন্তলা দেবী, এত সহজে নীরেন সান্যাল আপনাকে হজম করে নেয় না।

বের হয়ে যান—বের হয়ে যান এ ঘর থেকে ! হঠাৎ যেন সব কিছু ভুলে চিৎকার করে উঠে কুন্তলা।

চিয়ারিও মাই হনি বাঞ্চ ! আই অ্যাম গোয়িং নাউ, বাট ইউ উইল হিয়ার মি এগেন—হোয়েন আই ওয়াণ্ট ইউ। আপাততঃ বিদায়—

নীরেন সেন কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়—আর ঠিক তার পরমুহূর্তেই সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করে।

কুন্তলা !

কুন্তলা দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল, সুব্রতর ডাকে যেন ভেঙে পড়ে। চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

সুব্রত কুন্তলার মাথায় একটা হাত রাখে, কি হয়েছে কুন্তলা ?

কুন্তলা জবাব দেয় না, কাঁদতেই থাকে।

ঐ দিনই রাত্রে।

কিরীটীর বাড়িতে—সুব্রত আর কিরীটী কথা বলছিল।

আসলে কিরীটীই বলছিল, সুব্রত শুনছিল।

তাহলে তুমি বলছ মিঃ গাঙ্গুলীকেও হত্যা করা হয়েছে।

হ্যাঁ, সুব্রত। তাঁকেও একই হত্যাকারী, যে মহেন্দ্রনাথকে হত্যা করেছিল, সে-ই হত্যা করেছে। তারপর যেমন মহেন্দ্রনাথের ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেণ্ট বা সুইসাইড বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল, এক্ষেত্রেও মিঃ গাঙ্গুলীর হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলবারটা গুঁজে দিয়ে সেই চেষ্টাই করেছে খুনী।

কিন্তু কেন—গাঙ্গুলীকে হত্যা করল কেন সে ? সুব্রত প্রশ্ন করে।

ঠিক একই কারণে। অর্থাৎ যে কারণে মহেন্দ্রনাথকে সে হত্যা করেছে।

কি—কি সে কারণ ?

এখনো বুঝতে পারনি !

না।

ডাঃ নলিনী চৌধুরীর ঐ চিঠি।

মানে সেই সাংকেতিক চিঠি !

হ্যাঁ, সেই চিঠিই হল কাল। চিঠিই ডেকে এনেছে নৃশংস মৃত্যু।

কিন্তু কি করে, তবে কি—

তাই—এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সম্ভবতঃ মহেন্দ্রনাথ চিঠির

সাংকেতিক পাঠ প্রথম উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রথম আঘাত হানে হত্যাকারী। তারপর মিঃ গাঙ্গুলী—তিনিও হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁর বন্ধুর ঐ সাংকেতিক চিঠির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন, আর সে-কথা হত্যাকারী জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের মতই পথের কাঁটা হিসাবে পথ থেকে তাঁকেও সরিয়ে দিতে দেরি করেনি। তাঁকেও পৃথিবী থেকে সরে যেতে হল।

তাহলে তুই নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিস—

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি হত্যাকারী কে এবং—

কিরীটীর কথা শেষ হল না—ঘরের ফোনটা হঠাৎ ঐ সময় ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তোলে, কে—হ্যাঁ আছে, ধরুন। সুব্রত তোর ফোন—

কে ?

তোর হবু খুড়শ্বশুর সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন !

হ্যাঁ, দেখ্‌, বোধ হয় জামাইকে নিমন্ত্রণ জানাতে চায় !

কিরীটীর ঠাট্টায় কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরে, কি খবর সুরেন।

কুন্তলা কি তোমার ওখানে গিয়েছে ?

কুন্তলা আমার এখানে ! কই না তো ? কিন্তু কি ব্যাপার বল তো ?

সন্ধ্যার মুখে একটা গাড়ি আসে তোমার একটা চিঠি নিয়ে—কুন্তলার নামে।

কুন্তলার নামে চিঠি ! কি বলছ তুমি সুরেন ?

হ্যাঁ। আর সেই চিঠি পেয়েই তো কুন্তলা চলে গিয়েছে। এত রাত হচ্ছে, ফিরছে না দেখে তোমার বাড়িতে ফোন করে জানলাম তুমি এখানে।

কিরীটী সুব্রতর কথা বলা শুনেই বুঝেছিল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। তাড়াতাড়ি সে সুব্রতর পাশে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, কি বলছে সুরেন ?

বুঝলাম না ঠিক—

কুন্তলার কথা মনে হল যেন তোকে কি জিজ্ঞাসা করছিল ?

হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করছিল কুন্তলা আমার এখানে এসেছে কিনা। কে বলে একটা চিঠি নিয়ে—

চিঠি ! কিসের চিঠি ? কার চিঠি ?

সুব্রত সংক্ষেপে তখন সব কথা খুলে বলে কিরীটীকে।

কিরীটী সব শুনে বলে, এইরকম একটা কিছু তোর কথা শুনে আমি অনুমান করেছিলাম। তুই এখুনি মৃণাল সেনকে ফোন কর, কয়েকজন আর্মড পুলিস নিয়ে যেন সে প্রস্তুত থাকে। আমরা এখুনি আসছি।

সুব্রত কিরীটীর নির্দেশমত তখুনি থানায় মৃণাল সেনকে ফোন করে দিল।

কিরীটী আর একটা মুহূর্তও দেরি করে না, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নেয়।

চল্ শীগগির—

গাড়ি লালবাজারের দিকে ছুটে চলেছে।

সুব্রতই গাড়ি চালাচ্ছিল। কিরীটী পাশে বসে।

কিরীটী বলছিল, খুনী কে—তাকে তুই তো অনেক আগেই ধরতে পারতিস যদি একবার ভাল করে ভেবে দেখতিস, ডাঃ চৌধুরীর যে উইলের কথাটা তোকে বলেছিলাম—সেই উইলের কথাটা—

ডাঃ চৌধুরীর উইল।

হ্যাঁ। মনে করে দেখ্, সে উইলে কি লেখা আছে এবং সে উইলের কথা কে কে জানত!

কিন্তু—

ঐখানেই তুই আলো দেখতে পেতিস বর্তমান রহস্যের।

আমি গতকালই সে উইলের কথা জানতে পেরেছি, কারণ তাঁর সেই উকিল বন্ধু, যিনি উইল তৈরী করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে, তিনি কলকাতায় ছিলেন না। তারপরই তো তোকে জানাই।

ঐ উইলই হচ্ছে কাল।

কিন্তু সে উইলে কি আছে?

এখন সে কথা থাক। লালবাজার পৌঁছে গেছি আমরা। সর্বাগ্রে তোর কুন্তলা, উদ্ধার, তারপর অন্য কথা।

মৃণাল সেন ফোনে নির্দেশ পেয়েই প্রস্তুত হয়ে ছিল।

কিরীটী বলে, মিঃ সেন, আপনি আমাদের গাড়িতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, পুলিশ ভ্যান আমাদের ফোন করবে।

মৃণাল সেন সুব্রতর গাড়িতে উঠে পড়ে।

সুব্রত এবারে শুধায়, কোথায় যাব?

শ্রীরামপুর।

শ্রীরামপুরে!

সুব্রত কেমন যেন বোকার মতই প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, খুব জোরে চালা।

সুব্রত গাড়ি ছেড়ে দেয়।

ধীরে ধীরে কুন্তলার জ্ঞান ফিরে এল একসময়।

নিঃশঙ্ক চিত্তেই গাড়িতে এসে উঠে বসেছিল কুন্তলা।

সুব্রতর হাতের লেখা সে কখনো দেখেনি ইতিপূর্বে এবং চিনতও না। তাই সুব্রতরই লেখা ভেবে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে এসে গাড়িতে উঠে বসেছিল চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

একবারও তার কথাটা মনে হয়নি, সুব্রতর তো বাড়িতেই ফোন ছিল! সুব্রত তাকে ফোন করেও জানতে পারত কথ টা!

আর তেমন যদি প্রয়োজন হবে তো সুব্রত চিঠি দিয়ে পাঠাবে কেন? সে নিজেও তো আসতে পারত ওর ওখানে।

আর সেটাই তো ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু অতি বড় বিচক্ষণ ব্যক্তিও মাঝে মাঝে এমন হাস্যকর ভুল করে ঘটনাচক্রে। কুন্তলাকেও বোধ হয় তাই তেমন দোষ দেওয়া যায় না।

পরে সুব্রত যখন কুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি এত বড ভুল করেছিলে কি করে কুন্তলা?

কি জানি কেন—বোধ হয়—

কি?

তুমি ডেকেছ তাই কোন কিছুই আর মনে হয়নি সে-সময়।

কিন্তু আমরা যদি আর একটু দেরি করতাম বা কোন কারণে দেরি হত।

কি আর হত!

কিছু হত না বুঝি?

না।

সত্যি—সত্যি বলছ?

কুন্তলা মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল অতঃপর।

॥ কুড়ি ॥

কুন্তলা জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখল একটা ঘরে শয্যার উপর সে শুয়ে আছে।

কেমন করে কিভাবে সে এখানে এল কিছুই যেন প্রথমটায় মনে পড়ে না।

প্রথমটায় সব অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে— কিছুই চিন্তা করতে পারে না।

তারপর মনে পড়ে, গাড়ির মধ্যে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্ধকারে বসেছিল এবং যাকে সে দেখতে পায়নি তাড়াহুড়ায়, সে যেন তাকে গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে অকস্মাৎ ঝাপটে ধরে তার নাকের ও মুখের ওপরে কি একটা চেপে ধরেছিল—সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কুন্তলার।

একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধে সব যেন সঙ্গে সঙ্গে কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল। তলিয়ে গিয়েছিল ও, হারিয়ে গিয়েছিল ও—চেতনা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

অনেক—অনেক দূর থেকে যেন ঝাপসা অস্পষ্ট কার গলা শোনা যায়।

কে যেন কাকে বলছে, কি হল ঠাকুরমশাই, তাড়াতাড়ি করুন! ভামিনী, এই ভামিনী—

কি?

দেখ্ জ্ঞান ফিরল কিনা!

দরজা খোলার শব্দ।

চোখ মেলে তাকায় কুন্তলা। ঘরের মধ্যে স্বল্পশক্তির একটা আলো জ্বলছে। আলোটা তবু যেন চোখে লাগে ওর।

কে এসে যেন পাশে দাঁড়াল।

দিদিমণি— অ দিদিমণি?

কর্কশ মেয়েলী গলায় কে যেন ডাকে কুন্তলাকে।

উঁ!

কি গো, ঘুম ভাঙল?

পূর্বের সেই কর্কশ নারী-কণ্ঠস্বর।

আমি কোথায়? ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করে কুন্তলা।

কোনমতে আস্তে আস্তে শয্যার উপরে উঠে বসে কুন্তলা। মাথাটা যেন তখনো ঝিম ঝিম করেছে।

এই যে জ্ঞান ফিরেছে—

কে?

কেন, চিনতে পারছো না?

নীরেনবাবু!

হ্যাঁ। যাক, চিনেছ তাহলে?

আমি কোথায়?

আমার বাড়িতে।

আপনার বাড়ি!

হ্যাঁ।

এর মানে কি নীরেনবাবু?

মানে তো অত্যন্ত সহজ।

নীরেনবাবু!

হ্যাঁ, যখন আমার কথায় সম্মত হল না, বুঝলাম সুব্রত তোমার মাথাটা রীতিমতই বিগড়ে দিয়েছে—সোজা আঙুলে ঘি গলবে না, তাই অন্য উপায়ে তোমাকে এখানে ধরে নিয়ে আসতে বাধ্য হলাম!

তাহলে এসব আপনারই কীর্তি?

উপায় কি?

কিন্তু জানতে পারি কি, এভাবে কৌশলে আমাকে ধরে নিয়ে এসে কি লাভ হবে আপনার?

লাভ! তা আছে বৈকি। নচেৎ এত ঝামেলা পোহাব কেন?

শুনুন নীরেনবাবু, ভাল চান তো আমার যাবার ব্যবস্থা করুন!

যাবে বৈকি। তবে অন্য কোথাও নয়, আমারই সঙ্গে আমারই ঘরে।

আপনার ঘরে?

হ্যাঁ। শোন, আমার একটা প্রস্তাব আছে।

প্রস্তাব?

হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বিয়ে।

হ্যাঁ।

কুন্তলা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? নীরেন বলে, দরজা বন্ধ!

দরজা খুলে দিন নীরেনবাবু!

দেখ কুন্তলা, আমি তোমার সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহার করতে চাই না। ধর্মতঃ আইনসঙ্গত ভাবে তোমাকে বিয়ে করতেই চাইছি—আর তাতে যদি তুমি না রাজী হও, তাহলে—

তাহলে? কুন্তলা গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকাল নীরেনের দিকে।

তাহলে আজ রাত্রে জোর করে তোমাকে—

ইউ স্কাউণ্ড্রেল!

স্কাউণ্ড্রেলই বল আর যাই বল সুন্দরী, সুব্রতর আশা ছাড়। যা বলছি এখনও শোন—ট্রাই টু বি রিজনব্‌ল, রাশন্যাল—

আবার চাপা গর্জন করে ওঠে ঘৃণায় কুন্তলা, ইতর, নীচ!

তার সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে আক্রোশে উত্তেজনায় কাঁপছে।

শোন, আমার প্রস্তাবে যদি রাজী না হও তো জেনো আমি যা একটু আগে বলেছি তাও করব না। কেবল তোমার নারীত্বের—সতীত্বের দম্ভকে চূর্ণ করে ছেঁড়া জুতোর মতই রাস্তায় ফেলে দেবো। আই স্যাল থ্রো ইউ ইন দি ডাস্ট!

নীরেনের কথা শেষ হল না, হঠাৎ কে যেন ঘরের দরজাটায় বার-দুই ধাক্কা দিল।

কে—কে এল দেখ তো ভামিনী—ঠাকুরমশাই বোধ হয়!

ভামিনী এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে প্রথমে কিরীটী, তার পশ্চাতে সুব্রত, মৃণাল সেন ও দুজন কনস্টেবল ঘরে এসে ঢুকে পড়ে।

মৃণাল সেনের হাতে উদ্যত পিস্তল, ডাঃ সান্যাল, হ্যাণ্ডস্ আপ! ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট!

কে? ও আই সি—ইন্সপেক্টর! শান্ত গলায় নীরেন সান্যাল বলে, কি চান? হোয়াই ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার!

তেওয়ারী, হাতকড়া লাগাও।

দাঁড়ান, ইন্সপেক্টর। আমি জানতে চাই এসবের অর্থ কি?

এখনো অর্থটা তাহলে পরিষ্কার হচ্ছে না। কিন্তু অর্থটা পরিষ্কার করতে হলে আপনার অপরাধের ফিরিস্তি দিতে হয়। সেটাও তো একটা নয়—আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও তা সম্ভব নয়।

কুন্তলাও ঘটনার আকস্মিকতায় হঠাৎ যেন থমকে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সুব্রতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে যায়।

সুব্রত তাড়াতাড়ি কুন্তলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

কিরীটী বলে, ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যা, সুব্রত।

মৃণাল কিন্তু ডাঃ সান্যালের দিকেই স্থিরদৃষ্টিতে তখনো তাকিয়ে আছে।

তাহলে শেষ থেকেই শুরু করি! তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, কুন্তলা দেবীকে কিডন্যাপ—

কিডন্যাপ, কুন্তলাকে! কোন দুঃখে? সে নিজেই এসেছে।

ও! উনি নিজেই এসেছেন?

হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেই ওকে জানতে পারবেন সত্য-মিথ্যা।

নীরেনবাবু, আই মাস্ট প্রেজ ইওর নার্ভ! কিরীটী এবারে বলে ওঠে, কিন্তু ওতে করে শেষরক্ষা হবে না। জেল নয়, ফাঁসির দড়ি আপনাকে গলায় নিতেই হবে জানবেন!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। দু-দুটো হত্যা ও একটা কিডন্যাপ—

মশায় কি নেশা করেছেন?

নেশাই বটে, তবে মারাত্মক নেশা। মিঃ সেন, অ্যারেস্ট করুন।

মৃণাল সেন বলে, তেওয়ারী।

কিন্তু তেওয়ারী এগুবার আগেই আচমকা নীরেন সান্যাল পকেট থেকে কি একটা বের করে চট্ করে মুখে পুরে দেয় এবং ব্যাপারটা কেউ কিছু বোঝবার আগেই নীরেনের দেহটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে যায়।

বার-দুই আক্ষেপ—তারপরই সব স্থির।

ঘটনার আকস্মিকতায় ঘরের মধ্যে সবাই যেন বিমূঢ়, হতবাক।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে, সম্ভবতঃ সায়নাইড। অল ফিনিশ্‌ড! মহেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্র গাঙ্গুলীর হত্যাকারীকে আমরা ধরেও ধরতে পারলাম না, মিঃ সেন!

মৃণাল সেন যেন চমকে ওঠে। বলে, কি বলছেন কিরীটীবাবু?

কিরীটী বলে, হ্যাঁ, মিঃ সেন। হি ইজ দি ম্যান—যে মহেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্র গাঙ্গুলীকে হত্যা করেছে!

॥ একুশ ॥

কিরীটীর বাড়ী।

কিরীটী বলছিল, আপনারা হয়ত ভাবতেও পারেননি ইন্সপেক্টার যে ডাঃ সান্ন্যালই ঐ দুজনের হত্যাকারী!

না। মৃণাল সেন বলে, নেভার ড্রিমট অফ ইট!

মনে আছে সুব্রত, যেদিন প্রথম তুমি আমার কাছে কেসটা সম্পর্কে বল, আমি সব শুনে তোমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলাম! এবং তার মধ্যে বলেছিলাম একটা কথা বিশেষ করে যা তা হচ্ছে ডাঃ চৌধুরীর ঐ দুই বন্ধুকে লেখা দুটো কাগজ—যার মধ্যে পর পর কতকগুলো লেখা রয়েছে এবং যে দুটো আমার কাছে রেখে যেতে বলেছিলাম।

হ্যাঁ, সে তো তোর কাছেই আছে। সুব্রত বলে।

হ্যাঁ, সেই কাগজই প্রথম আমাকে হত্যার মোটিভের ইঙ্গিত দেয়। কথাটা বলতে বলতে কিরীটী কাগজের টুকরো দুটো বের করে সামনের টেবিলের উপরে পাশাপাশি রাখল।

এই দেখ্!

একটা কাগজের মাথায় লেখা ২৬ ইংলিশ, অন্যটার মাথায় লেখা অ্যালফাবেট্স অর্থাৎ ইংলিশ অ্যালফাবেট্স, ইংরাজী বর্ণমালা—যার মধ্যে ২৬টি কথা আছে এ বি সি ডি করে। এখন ঐ অনুযায়ী ইংরাজী বর্ণমালা বসিয়ে যাও। তাহলে দেখ দাঁড়াচ্ছে কি—শ্রীরামপুর পর্ণকুটীর গ্রাউণ্ড ফ্লোর—সাউথ রুম। অর্থাৎ শ্রীরামপুরের পর্ণকুটীরের একতলার দক্ষিণের ঘর।

আশ্চর্য। মৃণাল সেন বলে, একবারও এসব মনে হয়নি তো আমাদের সুব্রতবাবু!

কিরীটী দুটো কাগজ জোড়া দিল।

মাঝখানে একটা রেকট্যাঙ্গল আঁকা আছে—তার দু'মাথায় 'এস' ও 'ই' লেখা অর্থাৎ সাউথ ইস্ট কোণ।

তাহলে! সুব্রত বলে।

হ্যাঁ সুব্রত, ডাঃ নলিনী চৌধুরীর দাদা যে ধন-সম্পদ বর্মা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা তিনি তাঁর শ্রীরামপুরের পর্ণকুটীরের নীচের দক্ষিণ দিককার ঘরের মেঝেতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন। এবং সেটা যে আছে সে-সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হই আমি আরো কেন জান?

কেন? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

ডাঃ নলিনী চৌধুরীর দ্বিতীয় উইলের কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে।

ডাঃ নলিনী চৌধুরীর দ্বিতীয় উইল! মৃণাল সেন বলে।

হ্যাঁ, তাঁর সেই দ্বিতীয় উইলের জন্যই তো এত কাণ্ড! এবং সে উইলের কথা আমি ডাঃ চৌধুরীর আইন-উপদেষ্টা কালীপদ চক্রবর্তীর কাছে জানতে পারি প্রথম।

কিন্তু কালীপদ চক্রবর্তী বা মিঃ গাঙ্গুলী তো সেরকম কোন উইলের কথা আমাকে বলেননি? সুব্রত বলে।

না বলেননি, তার কারণ উইলটা রেজিস্ট্রী করার আগেই ডাঃ চৌধুরীর মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই কাঁচা উইলটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কেন? উইলটা তাঁর কাছে ছিল না?

না। কারণ যে রাত্রে ডাঃ চৌধুরীর অ্যাটাক্ হয় সেই রাত্রেই কালীপদ চক্রবর্তীকে ডেকে তিনি উইলটা লিখিয়ে সই করেন। কথা ছিল চক্রবর্তী এসে উইলটা নিয়ে গিয়ে টাইপ করে পাকাপাকি সব ব্যবস্থা করবেন আর তাই উইলটা ডাঃ চৌধুরীর বালিশের তলায় ছিল। কিন্তু সেই রাত্রেই গোটাপাঁচেক নাগাদ ডাঃ চৌধুরীর মৃত্যু হয়। তারপর মিঃ চক্রবর্তী এসে উইলটার খোঁজ করেন, কিন্তু পান না।

তারপর?

কাজে-কাজেই উইলটা না পাওয়া যাওয়ায় ডাঃ চৌধুরীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এবং উইল যখন লেখা হয় তখনই ঐ কাগজটা মাঝামাঝি কেটে দুই বন্ধুর নামে দুটো খামে ভরে ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য আগেই মিঃ চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ চৌধুরী।

ঐ কাগজটা কি তাঁরই তৈরী?

না, ওটা ডাঃ চৌধুরীর দাদার কীর্তি। ডাঃ চৌধুরী কাঁচি দিয়ে কেটে দু'টুকরো করেছিলেন মাত্র জিনিসটা।

তারপর?

যা হোক উইলের সেই খসড়া চুরি গেলেও ঐ খাম দুটো চুরি যায়নি। তাই চক্রবর্তী ঐ খাম দুটো শেষে ডাঃ চৌধুরীর মৃত্যুর পর ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেন ও তাদের ব্যাপারটা বলেন। কিন্তু চক্রবর্তী বলেননি রায় ও গাঙ্গুলীকে দ্বিতীয় উইলের খসড়ার কথা প্রথমে বা ঐ দ্বিতীয় উইলে কি ছিল। যদিও উইলে অর্থের কথা স্পষ্ট করে বলা ছিল। তবু সে অর্থ সঠিক কোথায় আছে ডাঃ চৌধুরীও না বুঝতে পারায় ঐ অঙ্ক থেকে কিছু বলে যেতে পারেননি স্পষ্ট করে তাঁর উইলে।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না কিরীটী—সুব্রত বলে।

কি ?

ডাঃ চৌধুরী তাঁর ভাইকে সব কথা খুলে না বলে অমন একটা রহস্যের মধ্যে ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে রেখে গেলেন কেন ?

সেটা বলতে পারব না। যা হোক হঠাৎ তাঁর সর্প-দংশনে মৃত্যু হওয়ায় এবং আমার ধারণা সর্প-দংশনে মৃত্যুর ব্যাপারটাও তাঁর আসলে হত্যাই এবং সেটাও ঐ নীরেনরই কারসাজি। সে হয়ত কোনক্রমে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। যা হোক যা বলছিলাম, ডাক্তার ভাইয়ের কাগজপত্রের মধ্যে ওটা পেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর।

তবে যে চিঠি একটা লিখে গিয়েছিলেন তাঁর ছোট ভাইকে শুনেছিলাম ?

কথাটা ঠিক নয়। মানে চিঠি নয়—মুখে একদিন কথাটা ভাইকে বলেছিলেন মাত্র তিনি। কারণ তখনও তিনি অর্থের লোভটা সামলে উঠতে পারেননি বোধ হয়।

তাহলে উইলটা ডঃ চৌধুরীর—

সুব্রতর কথায় বাধা দিয়ে কিরীটী বলে, অবশ্যই ডাঃ চৌধুরীর ভাগ্যে আমাদের সকল রহস্যের মেঘনাদ ডাঃ নীরেন সান্যালই সরিয়েছিল। কিন্তু শুধু উইলে কি হবে ! আসল তথ্য তো ছিল দুই বন্ধুর নামে ডাঃ চৌধুরীর ব্যাঙ্কে সেই দুই খণ্ড কাগজে। আর সেই কারণেই পর পর দুটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। এখন দেখা যাক, নীরেন ডাক্তারই যে মহেন্দ্র রায়ের হত্যাকারী আমি তা জানতে পারলাম কি করে বা তাকে সন্দেহ করলাম কেন !

॥ বাইশ ॥

কিরীটী বলতে থাকে, যখন জানা গেল মহেন্দ্রনাথ নিহত হয়েছেন তখন স্বভাবতই তাঁর আত্মীয়স্বজনদের উপরেই সন্দেহ জাগে প্রথমতঃ যেহেতু তিনি ছিলেন বিত্তবান এবং তাঁর মৃত্যুতে তারা প্রত্যেকেই লাভবান হত।

তাহলেও সন্দেহের ব্যাপারটা মনে মনে বার বার বিশ্লেষণ করলাম। ছোট ভাই সুরেন্দ্র, দুই ছেলে সৌরীন্দ্র ও ভবেন্দ্র এবং মিঃ মুখার্জী ও তাঁর বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলী সকলের উপরেই সন্দেহ জাগে।

বড় ছেলে ও ভাই সুরেন্দ্রকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে পারে কারণ তাদের পক্ষে ব্যাপারটা জানা সম্ভবপর ছিল না।

তারপরই প্রথমে ধরা যাক, ছোট ছেলে ভবেন্দ্রর কথা, বিশেষ করে তার ঐ

রিভলবারটির জন্য। আসলে কিন্তু রিভলবারটি হারায়নি।

তবে?

রিভলবারটা নীরেন সান্যাল বেরিলিতে গতমাসে ভবেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিয়ে আসে। বেশ কিছু টাকা দিয়ে কিছুদিনের জন্য চেয়ে নিয়ে আসে। টাকার প্রয়োজন ছিল ভবেন্দ্রর, তাই সে দেয়। তাছাড়া সে ভেবেছিল সেটা তো আবার ফিরে পাবেই।

ফিরে পাবে!

হ্যাঁ। সেইরকমই ভবেন্দ্রকে বুঝিয়েছিল নীরেন সান্যাল।

আপনি এ-কথা জানলেন কি করে? মৃণাল সেন শুধায়।

বেরিলিতে গিয়ে ভবেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করে সব জেনেছি, আর সেই জন্যই—মানে রিভলবারটা ফিরে পাবার জন্যই ভবেন্দ্র কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু রিভলবার ফিরিয়ে দেয়নি নীরেন সান্যাল।

তাহলে—

হ্যাঁ সুব্রত, এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিল নীরেন ডাক্তার। সে জানত বাপে-ছেলেতে বিরোধ আর এও জানত ভবেন্দ্রর অনেক ধার। এই দুটোর সুযোগ নিয়ে সে বেশ কিছু মোটা টাকা দিয়ে ভবেন্দ্রর কাছ থেকে রিভলবারটা বাগিয়ে আনে মহেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্র গাঙ্গুলীকে হত্যা করবার জন্য এবং সেই হত্যার অপরাধ বেচারী ভবেন্দ্রর ঘাড়ে চাপানোর জন্য। তাতে করে সে ভেবেছিল কাজও হাসিল হবে আর তাকেও কেউ সন্দেহ করবে না।

কি সাংঘাতিক! সুব্রত বলে।

হ্যাঁ, চমৎকার প্ল্যান করেছিল নীরেন ডাক্তার। কিন্তু মারাত্মক দুটো ভুল করেছিল সে।

দুটো ভুল? মৃণাল সেন প্রশ্ন করে।

এক নম্বর—নিজের টাইপরাইটিং মেসিনে চিঠিটা টাইপ করে, সেই চিঠি মিঃ রায়কে পাঠিয়ে দিয়ে এবং দু নম্বর—তার মামার কাঁচা উইলটাকে সরিয়ে ফেলে।

কিরীটী একটু থেমে বলতে লাগল, যে মুহূর্তে ব্যাঙ্কের চিঠি দুটোর রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় তখনই একটা কথা আমার মনে হয়। ঐ ডাঃ চৌধুরীর ভাইয়ের অর্থ হ হল হত্যার মূল এবং সে-কথা কে কে জানত। মহেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্র গাঙ্গুলী ছাড়া জানত নিশ্চয়ই ডাক্তার নীরেন। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে আমার সন্দেহ হয়

কিরীটীর কথা শেষ হল।

সকলেই নির্বাক।

প্রজাপতি রঙ

শ্রীযুক্ত অভীককুমার সরকার

প্রীতিভাজনেষু

॥ এক ॥

আপনি বিশ্বাস না করলে কি করতে পারি বলুন! তবে জানবেন মাধবীকে আমি হত্যা করিনি।

হত্যা করেছেন তা কি আমি বলেছি হীরুবাবু! সুদর্শন মল্লিক মৃদু হেসে বলে, তা তো আমি বলিনি। তাছাড়া—

সুদর্শন মল্লিক ঝানু ও সি.। যেমন পালোয়ানের মত চেহারা তেমনি দুর্জয় সাহস।

চার-পাঁচজন ও. সি.-কে পর পর বদলি করার পর ডি. সি. নিজে বেছে বেছে তরুণ ও. সি.-দের মধ্যে সুদর্শন মল্লিককেই শেষ পর্যন্ত ও তল্লাটের থানার ইনচার্জ করে বসিয়েছিলেন।

পোস্টিং অর্ডারটা দেবার সময় ডি. সি. বলেছিলেন, সুদর্শন, ইউ আর মাই চয়েস। ওই তল্লাটের দশ নম্বর পল্লীটাই আমি জানি যত রকম ক্রাইমের আড্ডা। যত রকমের চোরাইকারবার—কাছের রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে ওয়াগন ভেঙে হাজার হাজার টাকার মাল সরানো তো আছেই সেই সঙ্গে বছরে চার-পাঁচটা খুন হবেই। অথচ আজ পর্যন্ত পুলিস ধরতেই পারল না কে বা কারা কারা ওই ভাবে খুন করছে। আজ তিন বছরে পর পর পাঁচজন অফিসারকে ওখানে পোস্টিং করেছি, but none of them—তাদের মধ্যে কেউই ব্যাপারটার এতটুকু কোন হদিস করতে পারেনি। তাই আমার মনে হয়—

কি স্যার?

একটা গ্যাং আছে ওই দশ নম্বর পল্লীর মধ্যে যারা ওই ক্রাইমের মূলে।

সুদর্শন বলেছিল, আমি চেষ্টা করব স্যার।

থানার চার্জ নিয়েই ওখানে এসে সুদর্শন পর পর কদিন দশ নম্বর পল্লীটার মধ্যে গিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে এসেছিল।

যাদের উপর তার সন্দেহ পড়েছিল, মনে মনে তাদের একটা লিস্টও তৈরি করে ফেলেছিল। এবং ঐ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের লিস্ট তৈরী করবার সময়ই হীরু সাহার উপর নজর পড়ে সুদর্শনের।

ব্যায়ামপুষ্ট তাগড়াই চেহারা হারু সাহার। কাছেই যে জুটমিলগুলো আছে তারই একটায় চাকরি করে। বার-দুই স্কুল-ফাইন্যাল ফেল করে পড়াশুনোয় ইতি দিয়েছিল। বাড়িতে বিধবা মা আর ছোট একটি ভাই। পরণে সর্বক্ষণ টেরিলিনের প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট। মুখে সর্বক্ষণ সিগারেট। পল্লীর সবাই তাকে ভয় করে, সমীহ করে।

আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল হীরু সাহার সঙ্গে একদিন সুদর্শন, কিন্তু হীরু সাহা পাত্তা দেয়নি। বলেছিল, অত খবরে আপনার দরকারটা কি স্যার। আমি কি করি, কখন বাড়ি ফিরি, কার কার সঙ্গে আমার দোস্তি, জানবার আপনার প্রয়োজনটা কি জানতে পারি কি?

সুদর্শন মল্লিক মৃদু হেসেছিল, তারপর বলেছিল, আপনাদের পাড়ায় এলাম, আলাপ-পরিচয় করব না?

বেশি আলাপ ভাল নয় স্যার, বুঝলেন!

কেন বলুন তো?

না, তাই বলছি। কথাটা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল হীরু সাহা।

পাশের বাড়ির খগেন পাঠক বলেছিল, ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না স্যার। কখন রাতে-বিরেতে চোরাগোপ্তা চালিয়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সোজা উপরতলার বাসিন্দা হয়ে যাবেন পার্মানেণ্টলি। হেঁ-হেঁ, বুঝলেন না—

কথাগুলো বলে রহস্যময় হাসি হেসেছিল খগেন পাঠক।

খগেন পাঠকও ওই হীরু-সাহারই সমবয়সী। সে একজন নামকরা মোটর-মেকানিক এবং ঐ পল্লীরই বাসিন্দা. সুদর্শনের সন্দেহের তালিকার মধ্যে অন্যতম চিহ্নিত।

আরো একজনের উপর নজর পড়েছিল সুদর্শন মল্লিকের।

মাধবী ব্যানার্জি।

ওই পল্লীতেই থাকে। বাপ পতিতপাবন ব্যানার্জি অন্ধ। পূর্ববঙ্গের কোন এক স্কুলে মাস্টার ছিল। দেশ-বিভাগের ফলে ছিটকে ঘুরতে ঘুরতে ওই পল্লীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বছর কয়েক আগে।

দুই ছেলে দুই মেয়ে। অবিনাশ-অমলেন্দু দুই ভাই আর দুই বোন মাধবী ও সাবিত্রী। বড় দুই ভাই স্কুলের চৌকাটটা ডিঙিয়েই, লেখাপড়া ছেড়ে একজন ঢুকেছিল মিলে, অন্যজন মোটর-ড্রাইভিং শিখে হয়েছিল বাসের ড্রাইভার। দুই ভাইয়ে যা উপার্জন করে তাতে অভাব থাকার কথা নয়, কিন্তু সংসারে তারা বড় একটা উপুড়হস্ত করে না। অগত্যা মাধবীকেই হাল ধরতে হয়েছিল।

আই. এ. পাস করে একটা অফিসে চাকরি নিয়েছিল, ওই সঙ্গে অফিসের ক্লাবে ক্লাবে অভিনয় করত। অভিনয়ে বরাবরই একটা বেশ যেন ন্যাক্ ছিল মাধবীর। ঐ অভিনয় করবার ক্ষমতার জন্যই অফিসের মাইনের দ্বিগুণ তিনগুণ ইনকাম ছিল। অভিনয় করে নানা অফিস ক্লাবে ক্লাবে বেশ মোটা টাকাই উপার্জন করত মাধবী।

ছোট বোন সাবিত্রী কলেজে বি. এ. পড়ে।

গরীব রিফিউজি স্কুল-মাস্টারের মেয়ে হলে কি হবে, দেখতে দুটি বোনই সুন্দরী। তাহলেও দুজনের সৌন্দর্যের মধ্যে একটা যেন পার্থক্য ছিল।

মাধবীর দেহ ও চোখে-মুখে যেন একটা উগ্র যৌন আকর্ষণ ছিল যেটা স্বভাবতই পুরুষকে আকর্ষণ করত। উগ্র স্পষ্ট যৌবন। দেহের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি ঢেউ যেন সোচ্চার। তার উপরে মাধবীর বেশভূষা, চালচলন, কথাবার্তা ও চোখের চাউনির মধ্যেও সর্বক্ষণ যেন একটা যৌন আবেদন স্পষ্ট হয়ে উঠত। তাই পল্লীতে অনেকেই বলাবলি করত ওর ইনকাম দেখে, কেবল চাকরি আর অভিনয়ই নয় অন্যভাবেও উপার্জন হয় ওর!

অথচ ছোট বোন সাবিত্রী একেবারে তার বড় বোনের যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। শান্ত, নম্র। ধীর গম্ভীর।

পল্লীর সকলের সঙ্গেই ছিল মাধবীর আলাপ। পল্লীর সব যুবকেরই দৃষ্টি যে মাধবীকে সর্বক্ষণ ঘিরে ছিল, তাও জেনেছিল সুদর্শন মল্লিক। কিন্তু মাধবীর যে কারো প্রতি কোন বিশেষ পক্ষপাত আছে সে-সম্পর্কে কোন সংবাদই পায়নি সুদর্শন।

মাধবীর সঙ্গেও আলাপ করেছিল সুদর্শন একদিন এদের বাড়িতে গিয়েই।

প্রথম আলাপের দিনই মাধবী বলেছিল, কি সৌভাগ্য, রাজার পদার্পণ কুঁড়ে ঘরে।

কেন ওকথা বলছেন, মাধবী দেবী? সুদর্শন কথাটা বলে হেসেছিল।

দেবী-টেবী নয়, আমাকে মিস ব্যানার্জী বলেই ডাকবেন দারোগাবাবু।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু ওই কথা বললেন কেন? আপনাদের তল্লাটে নতুন এসেছি, একটু জানা-পরিচয় থাকাটা কি ভাল নয়?

কিন্তু আপনারা যে রাজার জাত! মাধবী একটা বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল।

রাজার জাত মানে? সৌহার্দ্যের কণ্ঠে—খোঁচাটা যেন বুঝতেই পারেনি এইভাবে কথাটা বলবার চেষ্টা করেছিল সুদর্শন মল্লিক।

তা বৈকি। খোদ সরকারের প্রতিভূ এবং এ তল্লাটের একেবারে হর্তাকর্তা দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা!

সুদর্শন হেসে বলেছিল, তাই বুঝি?

নয়? ইচ্ছা করলেই তো একেবারে বেঁধে নিয়ে যেতে পারেন পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে!

সে যুগ আর নেই মিস ব্যানার্জি।

কে বললে নেই? মরা হাতী এখনো লাখ টাকা। তা যাক—, তারপরই একটু থেমে বলেছিল, কিন্তু আপনাদের মত লোকের আমাদের সঙ্গে আলাপ করলে কি সুবিধা হবে?

কেন, কেন?

তা বৈকি। তাছাড়া কথায় বলে পুলিসে ছুঁলে আঠারো ঘা!

আবার হেসেছিল সুদর্শন মল্লিক।

হাসছেন যে!

আপনি দেখছি বেশ মিষ্টি করে হুল ফোটাতে পারেন—

ওমা, সে আবার কি! না, না—ছিঃ, আপনারাই হলেন আমাদের বলভরসা। আপনাদের হুল ফোটাব এমন ধৃষ্টতা কি থাকতে পারে! আচ্ছা চলি—আমার আবার অফিসের টাইম হয়ে যাচ্ছে। নমস্কার।

নমস্কার।

॥ দুই ॥

মাধবীদের ঠিক একেবারে পাশের বাড়িরই সুবোধ মিত্রের সঙ্গেও সুদর্শনের ওইদিনই আলাপ। ফেরার পথে হঠাৎ দেখা।

সুবোধ মিত্র সেদিন অফিসে যায়নি। ওই দশ পল্লীরই বাসিন্দা হলেও যেন ওই পল্লীর একজন বলে মনে হয় না। বি. এ. পাস করে একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে। রোগা দোহারা চেহারা। কালো রঙের উপরেও একটা যেন জৌলুস আছে। চোখে-মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি। জামা-কাপড়ই কেবল দোপদুরস্ত নয়, কথাবার্তায়ও অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র। বস্তীর মধ্যে বসবাস করলেও লোকটার যে একটা রুচি আছে দেখলেই বোঝা যায়।

সমাদর করে ডেকে নিয়ে সুবোধ মিত্র সুদর্শনকে তার বাইরের বসবার ঘরে বসিয়েছিল।

বেতের একসেট সোফা, কাচের একটা আলমারি-ভর্তি বই। একদিকে একটি তক্তপোশ পাতা; উপরে একটি সুজনি বিছানো। এক কোণে একটি বুদ্ধমূর্তি ও ভাসে একগোছা ফুল। দেওয়ালে ঝোলানো একটি বেহালা।

গরীবের ঘরে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এক কাপ চা অন্তত খেতেই হবে। সুবোধ বললে।

না, না—সে-সবের কোন প্রয়োজন নেই সুবোধবাবু। ওসব হাঙ্গামা করবেন না।

হাঙ্গামা আবার কি! বসুন।

সুবোধ মিত্র পরক্ষণেই ভিতরে চলে গিয়েছিল।

একটু পরে সুদৃশ্য দামী সৌখীন কাপে এক কাপ চা নিয়ে ফিরে এল, নিন।

দেখুন তো, এখন এই অবেলায় আবার চায়ের কি প্রয়োজন ছিল!

তা হোক, আপনার মত লোক এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—

ঘণ্টাখানেক প্রায় আলাপ করেছিল সুদর্শন মল্লিক। খুশী হয়েছিল আলাপ করে। এবং ফিরে আসবার সময় স্বভাবতই সুবোধ মিত্র তার মনের পাতায় দাগ কেটেছিল।

আরো একজন ছিল দশ নম্বর পল্লীর—কল্যাণ বসু। রোগা প্যাটার্নের চেহারা। কালো গায়ের রঙ। মাথায় ঘন চুল। অর্ধেক গাল পর্যন্ত জুলপি। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বিশেষ এক পার্টির চিহ্নিত লোক ওই পল্লীর। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হবে। বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির কর্মী হিসাবে স্বভাবটা একটু রুক্ষ। এবং বেশ একটু দাপটের সঙ্গেই যেন পল্লীর মধ্যে থাকে। পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন বি গ্রেড ক্লার্ক।

সে বলেছিল প্রথম আলাপের সময়েই, আপনি তাহলে আমাদের এ তল্লাটের নতুন ও-সি হয়ে এলেন! যাক টিঁকে থাকুন এই কামনা করি।

আমাদের আর টিঁকে থাকাথাকি কি বলুন, কল্যাণবাবু! কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। যতদিন রাখবে এ থানায় ততদিন থাকব। হুকুম এলেই চলে যেতে হবে। এই দেখুন না, গত বছর দুয়েকের মধ্যেই চারজন এল আবার গেল আমার আগে এ থানা থেকে। কিন্তু কেন বলুন তো?

কি—কেন?

মানে, এই থানায় ও. সি-রা এলে চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই আবার বদলি হয়ে যায়।

কল্যাণ কিন্তু সুদর্শন মল্লিকের কথার কোন জবাব দেয়নি। মৃদু হেসে বলেছিল, আপনাকে বোধ হয় অত তাড়াতাড়ি বদলি করবে না।

কি করে বুঝলেন?

আপনি বেশ এনারজেটিক!

মানে?

এই দেখুন না এখানকার থানায় এসেই শুনেছি, আপনি আমাদের পল্লীতে প্রায়ই আসছেন। আচ্ছা মশাই—

কি?

আমাদের এ তল্লাটের এই পল্লীটা বড়কর্তাদের একটা হেডেক, তাই না?

কই, সেরকম তো কিছু শুনিনি!

শুনেছেন ঠিক স্যার, চেপে যাচ্ছেন।

সুদর্শন মল্লিক প্রত্যুত্তরে হেসেছিল। তবে বুঝেছিল কল্যাণ বসু গভীর জলের মাছ।

তবে কি জানেন মল্লিক মশাই—, পরক্ষণেই কল্যাণ বসু বলেছিল।

কি?

আপনি এ তল্লাটের থানার ও-সি, যখন যেখানে খুশি আপনার যাবার অধিকার আছে বৈকি। কিন্তু—

কিন্তু কি? বলুন না, থামলেন কেন কল্যাণবাবু?

এ পল্লীর লোকেরা পুলিসের লোকদের বড় একটা পছন্দ করে না।

কিন্তু আমি তো—

জানি, বন্ধু হিসেবেই হয়তো আলাপ-পরিচয় করতে আসেন, কিন্তু এরা হয়ত সাদা চোখে ব্যাপারটা নেবে না।

কেন—কেন?

হাজার হোক, আপনি তো জানেন, কথায় বলে পুলিস! ভাববে হয়ত কোন মতলব নিয়েই আপনি পল্লীতে ঘোরাফেরা করছেন!

সুদর্শন মল্লিক তাকিয়ে ছিল কল্যাণ বসুর দিকে।

কল্যাণ বসু হাসছিল।

যে যাই হোক হীরু সাহা, খগেন পাঠক, কল্যাণ বসু, সুবোধ মিত্র ও মাধবী ব্যানার্জি দশ নম্বর পল্লীর বাসিন্দা হিসাবে তার মনের পাতায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল যেন। মাস চারেক তারপর নিরুপদ্রবেই কেটেছিল।

অবিশ্যি ইতিমধ্যে কানে যে আসেনি দু-চারটে ব্যাপার তা নয়। যেমন মদ চোলাই, চোরাই মাল পাচার, ওয়াগন ব্রেক। কিন্তু সুদর্শন মল্লিক কথাগুলো কানে এলেও যেন ব্যাপারগুলোতে তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি বাইরে থেকে, যদিও ভিতরে ভিতরে সে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। সর্বক্ষণই সতর্ক সজাগ থাকত। এবং তার পরও দু-পাঁচ দিন দশ নম্বর পল্লীতে গিয়েছে, এর-ওর সঙ্গে আলাপ করে আবার চলে এসেছে।

তারপরই হঠাৎ এল দুঃসংবাদটা।

ফলে সুদর্শন মল্লিককে সরেজমিনে তদন্তে নামতেই হল।

নিষ্ঠুর এক হত্যাকাণ্ড!

॥ তিন ॥

সময়টা শীতকাল।

পৌষ শেষ হয়ে মাঘের শুরু। শহরে বেশ শীত পড়েছে কদিন থেকে।

সকালবেলা থানার অফিসে বসে সুদর্শন মল্লিক দিন দুই আগে রাত্রে অল্প দূরে রেলওয়ে ইয়ার্ডে একটা লোডেড ওয়াগন থেকে দশ পেটি কাপড় ওয়াগন ভেঙে চুরি হয়েছে সেই সম্পর্কেই একটা রিপোর্ট খাড়া করছিল, এমন সময় দশ নম্বর পল্লীর হরগোবিন্দ ঘোষ নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে থানায় ঢুকল।

দারোগাবাবু আছেন নাকি!

কে? ভিতরে আসুন।

হরগোবিন্দ এসে ঘরে ঢুকল। হাঁপাচ্ছে সে তখন রীতিমত।

রোগা চেহারা। মাথার সামনের দিকটায় একগাছিও চুল নেই, চকচকে একটি টাক।

এই যে দারোগাবাবু, শীগগির চলুন!

কোথায়?

দশ নম্বর পল্লীর পিছনে যে মাঠটা আছে—সেখানে।

কেন, ব্যাপার কি?

খুন মশাই খুন!

খুন?

সুদর্শন ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুন—নৃশংস খুন!

কে—কে খুন হল?

ওই পল্লীরই একটি যুবতী মেয়ে।

কি নাম বলুন তো?

ওই যে আমাদের পল্লীর অভিনেত্রী—

অভিনেত্রী!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পতিতপাবন ব্যানার্জি—ওই যে অন্ধ স্কুল-মাস্টার পতিতপাবন ব্যানার্জি—তারই বড় মেয়ে মাধবী!

সে কি?

সুদর্শন মল্লিক যেন দ্বিতীয়বার চমকে ওঠে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে।

কখন খুন হল মাধবী ব্যানার্জি ? জিজ্ঞাসা করে।

তা কি করে জানব মশাই বলুন ! সকালবেলা উঠে একটু প্রাতঃভ্রমণ করা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। আজও বের হয়েছিলাম। দশ নম্বর পল্লীর পিছনদিকে যে মাঠটা আছে—সেই মাঠেরই মধ্যে পড়ে আছে কি একটা দূর থেকে নজরে পড়ে আমার যাবার সময়ই, কিন্তু দৃষ্টি দিইনি তখন।

তারপর ?

ভাল করে তখন আলোও ফোটেনি আকাশে। বেড়িয়ে ফেরার সময় তখন বেশ আলো ফুটেছে চারদিকে। কি খেয়াল হল এগিয়ে গেলাম, আর গিয়ে দেখি আমাদের পল্লীর মাধবী পড়ে আছে—হাত-পা ছড়িয়ে, চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে, মুখটা হাঁ করা, মুখের ভেতরে জিভটা একটু বের হয়ে এসেছে—

পল্লীর সবাই শুনেছে ?

আমিই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে পল্লীতে খবরটা দিই। এতক্ষণে সেখানে হয়ত ভিড় হয়ে গিয়েছে। পরে মনে ভাবলাম, আমিই যখন ব্যাপারটা প্রথম দেখেছি, আমারই পুলিসকে একটা খবর দেওয়া কর্তব্য, তাই চলে এসেছি।

খুব ভাল করেছেন। তা আপনিও বুঝি ওই পল্লীতেই থাকেন ?

থাকি মানে ? দশ বছর আছি !

কি নাম আপনার ?

আজ্ঞে হরগোবিন্দ ঘোষ।

সুদর্শন মল্লিক আর দেরি করে না। চারজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে তখুনি হরগোবিন্দকেও সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

সকাল খুব বেশি হলে তখন সাতটার বেশি নয়। শেষরাতের দিকে বিশ্রী ঘন কুয়াশা নেমেছিল, এখনও কুয়াশাটা ভাল করে পরিষ্কার হয়ে যায়নি। তবে দেখা যায় স্পষ্টই সব কিছু।

থানা থেকে দশ নম্বর পল্লীটা মিনিট কুড়ি হবে হাঁটা-পথে। সেই পল্লীরই পিছনে একটা খোলা মাঠের মত।

এদিক-ওদিক গোটা দুই খাটাল আর একটা পুরাতন গোরস্থান আছে। তার ওধারে প্রাচীর—প্রাচীরের অপর পার্শ্বেই রেলওয়ে ইয়ার্ড।

ওই থানার চার্জ নেবার পর সুদর্শন ওই জায়গাটা, ওধারের রেলওয়ে ইয়ার্ডটা ঘুরে ঘুরে দেখে গিয়েছিল ইতিপূর্বে দিন তিনেক খুব ভাল করে, কারণ ওই ইয়ার্ড থেকেই

ওয়াগন ভেঙে মাল সরাবার ব্যাপার প্রায়ই ঘটে থাকে।

এবং যেটা সুদর্শন মল্লিকের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, নিকটবর্তী দশ নম্বর পল্লীরই কারো-না-কারো সেটা কীর্তি আর তাই সে বন্ধুত্বের ভান করে পল্লীর মধ্যে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছিল।

নানা জায়গা থেকে ওয়াগন ভর্তি হয়ে নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য আসে কলকাতা শহরে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু সে-সব আর খালাস হয় না, কখনো পাঁচ-সাত-দশ দিন পর্যন্ত মাল ওয়াগনেই পড়ে থাকে।

মালগাড়িগুলো ইয়ার্ডের মধ্যে একধারে শান্টিং করা থাকে খালাসের অপেক্ষায়।

॥ চার ॥

সীমানা প্রাচীরের চার-পাঁচটা জায়গায় ভাঙা। বোঝা যায় দুষ্কৃতকারীরা ওই পথেই ইয়ার্ডে যাতায়াত করে ও ওয়াগন ভেঙে মাল সরায়।

তবে এও সুদর্শনের মনে হচ্ছে সুনিশ্চিত যে, ওয়াগন ভেঙে মাল পাচারের ব্যাপারে মালগাড়ির এঞ্জিন ড্রাইভার ও খালাসীদের হাতও আছে। তারাও ভাগীদার। তারাই সরবরাহ করে খবরটা। নচেৎ ওরা কেমন করেই বা জানতে পারে, কোন্ ওয়াগনে মাল আছে! একটা-আধটা মালগাড়ি তো নয়, অসংখ্য মালগাড়ি থাকে দাঁড়িয়ে ইয়ার্ডের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে।

পথ চলতে চলতে একসময় হরগোবিন্দকে সুদর্শন মল্লিক শুধায়, ঘোষ মশাই!

আজ্ঞে, কিছু বলছেন?

কি করা হয় আপনার?

কাছেই আমার লেদ মেসিনের একটা দোকান আছে।

দশ নম্বর পল্লীরই বাসিন্দা যখন আপনি, নিশ্চয়ই মাধবীকে ভাল করেই চিনতেন?

চেনা মানে যাতায়াতের পথে সর্বদা দেখাশোনা হচ্ছে, একই পল্লীতে থাকি। কে চেনা নয়—সবাই তো চেনা!

তা বটে। তবে বলছিলাম, আলাপ-টালাপ ছিল না মেয়েটির সঙ্গে?

না মশাই, বড় দেমাক ছিল মেয়েটার। আমাদের বড় একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করত না।

বলেন কি?

হ্যাঁ। চাকরি করে, অভিনেত্রী—অ্যাকটো করে স্টেজে!

খুব ভাল অভিনয় করত বুঝি ?

তা জানি না মশাই, তবে আমার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করত সর্বদা। দেখতাম প্রায়ই অনেক রাত করে ফিরত—

একা একা ?

আগে আগে তো একা-একাই যাতায়াত করত, তবে ইদানীং দেখতাম—

কি ?

সঙ্গে রয়েছে সুন্দরমত সুট-পরা এক বাবু—

কে সে ? আপনাদেরই পল্লীরই নাকি ?

না !

তবে ?

জানি না। তারপরই বলে হরগোবিন্দ, বুঝলেন না, স্কুল-মাস্টারের মেয়ে হলে কি হবে—আর না-বলাটা অন্যায়ই হবে, স্বভাবচরিত্র তেমন সুবিধের ছিল না।

কেন—কেন ?

পল্লীর সব জোয়ান-মদ্দ ছোকরাগুলোই তো ওর চারপাশে ঘুরঘুর করত, হাসাহাসি ঠাট্টা-মস্করা চলত।

তাই বুঝি! তা কার সঙ্গে বেশি ভাব ছিল বলে আপনার মনে হয় ?

কে জানে মশাই, ওসব গভীর জলের মাছ। হলও শেষ পর্যন্ত তেমনি, অপঘাতে মরতে হল। ওই সব চরিত্রের মেয়ের শেষ পর্যন্ত অমনটিই হয়, বুঝলেন না।

আচ্ছা ঘোষ মশাই—

বলুন ?

আপনাদের পল্লীতে মাধবীর কোন লাভার—মানে প্রেমিক ছিল কিনা বলতে পারেন ?

ওদের মত মেয়েছেলের কি একটা-আধটা প্রেমিক থাকে মশাই ! কত প্রেমিক !

সুদর্শনের বুঝতে কষ্ট হয় না, যে কোন কারণেই হোক মাধবীর প্রতি হরগোবিন্দর একটা আক্রোশ ছিল মনের মধ্যে।

মিনিট পঁচিশের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল অকুস্থানে।

মিথ্যা বলেনি হরগোবিন্দ। ইতিমধ্যে দশ নম্বর পল্লীর অনেকেই এসে সেখানে ভিড় করেছে। নানা বয়েসী পুরুষই বেশি, তবে কিছু মেয়েও আছে। তাদের মধ্যে মাধবীর ছোট বোন সাবিত্রী আর বড় ভাই অবিনাশও ছিল।

আরো ভিড়ের মধ্যে নজরে পড়ে সুদর্শনের—খগেন পাঠক মোটর মেকানিক, মিলের কর্মী কল্যাণ বসু, রোগা প্যাকাটির মত চেহারা—ওই একই মিলের কর্মী এবং সুবোধ মিত্র—সেই ভদ্র কেতাদুরস্ত মানুষটিকে বিশেষ করে।

সুদর্শন মল্লিক ও তার সঙ্গের সেপাইদের দেখে ভিড় সরে গিয়ে ওদের এগুবার পথ করে দেয় আপনা থেকেই।

পত্রশূন্য বটগাছটার নীচেই পড়ে আছে মাধবীর দেহটা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পরনে একটা দামী শাড়ি। ডান হাতে একগাছি সোনার চুড়ি, বাঁ হাতে দামী একটা লেডিজ রিস্টওয়াচ।

মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে। ঝকঝকে দাঁতের পাশ দিয়ে জিভটা যেন সামান্য বের হয়ে এসেছে। চোখের পাতা খোলা—চোখের মণি দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসতে চায়। স্পষ্ট একটা আতঙ্ক ও সেই সঙ্গে যন্ত্রণার চিহ্ন দু-চোখের তারায়।

মুখে ও ঠোঁটে প্রসাধনের চিহ্ন বেশ বোঝা যায়। ডান পায়ের হাঁটুর কাছাকাছি শাড়িটা উঠে এসেছে। মৃতদেহটা পরীক্ষা করতেই বুঝতে পারে সুদর্শন পুরোপুরি রাইগার মর্টিস·সেট্‌ ইন করেনি। পরনের শাড়িটা বেশ এলোমেলো। গায়ের ব্লাউজটা দু-এক জায়গায় ফেঁসে গিয়েছে দেখা যায়।

মৃতদেহটাকে উপুড় করে দিতেই নজরে পড়ল সুদর্শনের—পরনের শাড়ি ও ব্লাউজে ধুলোমাটি লেগে আছে, এখানে ওখানে ফেঁসে গিয়েছে।

মনে হয় কেউ যেন পৈশাচিক হিংস্রতায় মহিলার গায়ের ব্লাউজখানা টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে।

দেহের কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নজরে পড়ল না সুদর্শনের।

একফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই কোথাও। সুদর্শন আরো একটু ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতেই তার নজরে পড়ল মৃতদেহের গলায় যেন একটা আবছা কালসিটার দাগ আছে।

সুদর্শনের পরীক্ষা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশের ভিড়কে লক্ষ্য করে বললে, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় করছেন কেন? যান সব!

একে একে সবাই চলে গেল। কেবল সাবিত্রী আর অবিনাশ তখনও দাঁড়িয়ে। অবিনাশ স্তব্ধ, সাবিত্রীর চোখে জল। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল।

চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে।

॥ পাঁচ ॥

সাবিত্রীর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সুদর্শনের মনটা যেন হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। তবু প্রশ্ন তো করতেই হবে, যা জানবার তাকে জানতেই হবে।

সাবিত্রী দেবী! সুদর্শন ডাকে।

সাবিত্রী সুদর্শনের দিকে অশ্রুভেজা লাল চোখ তুলে তাকাল।

কাল কি আপনার দিদির কোথাও অভিনয় ছিল।

ক্ষণকাল সাবিত্রী যেন একটু ইতস্তত করলে, তারপর কান্নাঝরা গলায় বললে, হ্যাঁ, একটা অফিস-ক্লাবে অভিনয় ছিল। বলে গিয়েছিল ফিরতে রাত হবে। বাবা তো দিদির অভিনয়ের ব্যাপারটা জানে না, তাই আমি জেগে অপেক্ষা করছিলাম।

তারপর?

অপেক্ষা করতে করতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর ভোরবেলা হরগোবিন্দবাবুর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায়।

সকাল হয়ে গিয়েছে তখন?

হ্যাঁ, বেলা প্রায় পৌনে ছটা হবে। তবে—

কি?

কুয়াশার জন্যে আলো তখনো তত ফোটেনি ভাল করে। চেঁচামেচি শুনে দাদাও বাইরে এসেছিল। আমি আর দাদা জিজ্ঞাসা করি ব্যাপার কি? হরগোবিন্দবাবু আমাদের বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন, শীগগির চল—পল্লীর পিছনের মাঠে!

দাদা জিজ্ঞাসা করে, কেন?

মাধবী—তোমার বোন—

কি—কি হয়েছে মাধবীর?

সে মরে গিয়েছে।

সুদর্শন প্রশ্ন করে, তারপর?

আমরা ছুটতে ছুটতে তখুনি এখানে চলে এসেছি! দাদা আর আমি।

আপনাদের মা-বাবা বোধ হয় এখনও শোনেননি কিছু?

সারাটা পল্লীই জেনে গিয়েছে। অবিনাশ বললে, তাঁদের কি আর এতক্ষণ কিছু জানতে বাকি আছে!

তা অবিশ্যি ঠিক। একটু থেমে সুদর্শন মল্লিক বলে, তাহলে এবার আপনারা

বাড়ি যান।

অবিনাশ শুধায়, মৃতদেহ কখন পাব ?

অনেক আইন-কানুনের ব্যাপার আছে, তাছাড়া পোস্টমর্টেম আছে। কাল বিকেলের আগে বডি পাবেন বলে তো মনে হয় না।

অবিনাশ সাবিত্রীর হাত ধরে চলে যাচ্ছিল, সুদর্শন আবার ডাকে, একটা কথা অবিনাশবাবু—

বলুন !

থানায় আপনাদের দুজনেরই একটা করে এজাহার দিতে হবে। সন্ধ্যার দিকে যদি একবার আসেন—

আসব।

অবিনাশ আর সাবিত্রী দাঁড়াল না। যাবার জন্য পা বাড়াল।

সুদর্শন আবার ওদের বললে, অমলেন্দুবাবুকেও আনবেন।

মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেই বেলা বারোটা বেজে গেল।

সুদর্শন মনে মনে যেন মাধবীর মৃত্যুর ব্যাপারটা ভেবে কিছুই কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। মেয়েটাকে হত্যা করল কে, আর কেনই বা হত্যা করল ? হত্যা যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এবং মৃতদেহ পরীক্ষা করে নিয়ে সুদর্শন যতটা বুঝতে পেরেছে, যে-ই হত্যা করে থাকুক হয় হত্যার পর বা আগে হত্যাকারী মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছে, তারপর হয়ত মৃতদেহটা ওইখানে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে।

হত্যা সম্ভবত অন্যত্র হয়েছে। কিন্তু সে কোথায় ?

আর একটা কথা মনে হয় সুদর্শনের। হত্যাকারী কি ওই দশ নম্বর পল্লীরই কেউ, না বাইরের কেউ ?

হরগোবিন্দ বর্ণিত সেই সুট-পরা বাবুটি, তার কথাটাও মনে পড়ে। তার খবরটাও যোগাড় করা দরকার।

পল্লীতে মাধবীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী অনেকেই ছিল। অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছে মাধবীর প্রতি। তার একটু কৃপালাভের আশায় অনেকেই তার চারপাশে মক্ষিকার মত গুঞ্জন করে ফিরেছে। তাদের কেউ একজন নয় তো ?

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিহিংসা গ্রহণ ! কিন্তু কে ?

হীরু সাহা, খগেন পাঠক, কল্যাণ বসু কিংবা হরগোবিন্দ ঘোষ !

হরগোবিন্দর কথায়বার্তায় মনে হয় মাধবীর প্রতি ওর একটা চাপা আক্রোশ

ছিল যেন।

এমনও হতে পারে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়েই হয়ত ওই আক্রোশ দেখা দিয়েছিল।

কাজেই ঐ হরগোবিন্দ লোকটারও সংবাদ নেওয়া দরকার।

আর একজন—আরও একজনের কথা মনে পড়ে সুদর্শনের।

সুবোধ মিত্র!

মাধবীদের একেবারে পাশের বাড়িতেই সে থাকে। তাকেও দেখা গিয়েছিল সকালে ভিড়ের মধ্যে। একমাত্র দেখা যায়নি হীরু সাহাকে।

সে কি খবরটা পায়নি, না পেয়েও যায়নি?

রাত প্রায় আটটা নাগাদ এল অবিনাশ একাই। সাবিত্রী আসেনি।

সুদর্শন থানার অফিস ঘরেই বসেছিল ওদের অপেক্ষায়।

আসুন! একা যে? আপনার ছোট ভাই আর বোন এলেন না? বসুন।

অমল তো এখানে নেই—বসতে বসতে বললে অবিনাশ।

কোথায় গিয়েছেন তিনি?

একদল বরযাত্রী নিয়ে গতকাল বিকেলে কৃষ্ণনগর গিয়েছে, এখনো ফেরেনি। তারপরই একটু থেমে অবিনাশ বললে, মা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, ঘন ঘন ফিট হচ্ছে তাঁর সংবাদটা পাওয়ার পর থেকেই। তাই সাবিত্রী আসতে পারল না।

ঠিক আছে। কাল যখন হোক একবার যেন সময় করে থানায় আসেন। অবিশ্যি আমিই যেতে পারতাম, কিন্তু আপনার মা-বাবার কথা ভেবেই যাইনি। একটু থেমে বললে, আপনার বাবা পতিতপাবনবাবু শুনেছেন?

হ্যাঁ।

খুব ভেঙে পড়েছেন বোধ হয়?

কান্নাকাটি তো করছেন না, একেবারে চুপচাপ।

খুবই স্বাভাবিক। সুদর্শন বলে।

॥ ছয় ॥

অতঃপর সুদর্শন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। মনে মনে গুছিয়ে নেয় কি ভাবে শুরু করবে।

আচ্ছা অবিনাশবাবু!

বলুন।

ব্যাপারটা ডেলিকেট হলেও বুঝতেই তো পারছেন আইনের খাতিরেই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ কিছু আপনাদের করতে হচ্ছে—

আপনি অত কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন? তাছাড়া এমন একটা কিছু যে ঘটবে এ তো আমি জানতামই।

জানতেন?

হ্যাঁ। আপনি হয়তো জানেন না, ইদানীং ওর চালচলন যা হয়ে উঠেছিল—

কি রকম?

নিজের মায়ের পেটের বোন, তবু যা সত্যি তা বলতেই হবে আমাকে। ক্লাবে ক্লাবে অভিনয় করাটাই যে একদিন হবে ওর কাল আমি জানতাম—

কেন, আজকাল তো অনেক মেয়েই অভিনয় করে অ্যামেচার ক্লাবে দু-পয়সা উপার্জন করে।

শুধু তো অভিনয়ই নয়, অভিনয় করতে গিয়ে অফিসের বাবুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি, সিনেমায় যাওয়া, হোটেল-রেস্তোরাঁতে খাওয়া—কি বলব, নানা জনে নানা কথা বলতে শুরু করেছিল বেশ কিছুদিন ধরেই আর তারা যে মিথ্যা বলত তাও নয়—

আচ্ছা, শুনেছি ওর আয়েই ইদানীং আপনাদের সংসারটা চলত, কথাটা কি সত্যি?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? আপনারা তো দুই ভাই-ই শুনেছি ভাল রোজগার করেন!

দেখুন, উচ্ছৃঙ্খলতাকে আর অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্যকে কোনদিনই আমি প্রশ্রয় দিইনি। তাই বছরখানেক আমার খাওয়া-খরচ ছাড়া কিছুই আমি দিতামনা সংসারে।

আর আপনার ছোট ভাই অমলেন্দুবাবু?

ওর নিজেরই বাবুয়ানী করে আর ড্রিঙ্ক করে পয়সায় কুলোয় না তো সংসারে দেবে কি!

খুব ড্রিঙ্ক করেন বুঝি?

একটা বেহেড মাতাল। অর্ধেক দিন তো বাড়িতেই ফেরে না রাত্রে।

এবার তো আপনার ঘাড়েই সব পড়ল।

ক্ষেপেছেন? আমি চলে যাব মিলের কোয়ার্টারে। ঝামেলার মধ্যে আমি নেই

সুদর্শন বুঝতে পারে লোকটা যেমন স্বার্থপর তেমনি হৃদয়হীন।

যাক সে-সব কথা, অবিনাশ বললে, কেন আমায় ডেকেছেন বলুন?

দশ নম্বর পল্লীতে আপনারা কতদিন আছেন ?

তা প্রায় বছর বারো তো হবেই।

আপনার বাবা শুনেছি অন্ধ।

হ্যাঁ, গ্লুকোমা হয়ে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গিয়েছে বছর সাতেক হল।

আপনার বোনের হত্যার ব্যাপারে—

আপনার কি মনে হয়, সত্যি-সত্যিই তাহলে কেউ মাধবীকে খুনই করেছে ? বাধা দিয়ে অবিনাশ প্রশ্ন করে।

আমার ধারণা তাই। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সঠিক করে কিছু বলতে পারছি না।

তাহলে বলি শুনুন, আমারও সত্যি কথা বলতে কি তাই ধারণা। অবিনাশ বললে

হুঁ। আচ্ছা, বলছিলাম, আপনার বোনের হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন ?

অবিনাশ চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না সুদর্শনের প্রশ্নের।

বলুন, কথাটা প্রকাশ পাবে না !

আপনি আমাদের দশ নম্বর পল্লীর হীরু সাহাকে চেনেন ? কখনও দেখেছেন ?

হ্যাঁ দেখেছি। আলাপও হয়েছে।

ও আমাদের মিলে—মানে অন্নপূর্ণা জুট মিলে কাজ করে।

জানি শুনেছি।

আপনার জানা দরকার, ওই হীরুর মাধবীর ওপর নজর ছিল—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। একবার মাধবীকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল।

তারপর ?

মাধবী সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি তাকে না করে দিয়েছিল—

কি বলেছিলেন মাধবী দেবী ?

বলেছিলেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন না দেখাটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

তারপর ?

হীরু নাকি বলেছিল, বিয়ে তাকে হীরুকেই করতে হবে একদিন নাকি।

মাধবী দেবী কি বলেছিলেন ?

বলেছিল তার আগে সে একছড়া জুতোর মালা তাকে পাঠিয়ে দেবে।

তারপর ? আর কোন দিন কিছু হীরু বলেছিল ?

ওকে বলেনি, তবে আমাকে বলেছে।

আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন ?

বলেছিলাম, তেমন যদি কখনও অসম্ভব সম্ভব হয়ই, বোনকে আমিই গলা টিপে মেরে ফেলব।

বলেছিলেন আপনি ?

হ্যাঁ। হীরুও বলেছিল, বহুৎ আচ্ছা, দেখা যাক তাহলে অসম্ভবই সম্ভব হয় কিনা। তোমার বোনটিকে আমার ঘরে এনে তুলতে পারি কিনা।

হুঁ। আর কাউকে সন্দেহ হয় ?

না।

খগেন পাঠককে ?

ওই মোটর-মেকানিকটা ? ওটা তো একটা ছুঁচো !

কল্যাণ বসু ?

ওটা একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ বটে, তবে তার দ্বারা খুন করা সম্ভব নয়।

আর আপনাদের প্রতিবেশী—মানে ঐ—

কে, সুবোধ ?

হ্যাঁ।

ও অত্যন্ত নিরীহ টাইপের একজন ভদ্রলোক।

ওদের কারও আপনার বোনের প্রতি দুর্বলতা ছিল না ?

দুর্বলতার কথা যদি বলেন তো আমাদের পল্লীর সকলেরই মাধবীর প্রতি রীতিমত দুর্বলতা ছিল।

আচ্ছা, যাদের কথা বললাম ওদের কারো প্রতি আপনার বোনের কোন দুর্বলতা ছিল বলে আপনার মনে হয় ?

না। সেরকম মনে হয় না।

কেন ?

আমাদের পল্লীর কোন ছেলেকে সে কখনও ধর্তব্যের মধ্যেই আনত না।

কিন্তু আলাপ-পরিচয় তো ছিল !

আলাপ-পরিচয় থাকা আর দুর্বলতা থাকা বা প্রেম করা কি এক জিনিস মশাই।

তা অবিশ্যি নয়। আচ্ছা, আপনার বোনের রোজগারপাতি বেশ ভালই ছিল, তাই না ?

ভাল মানে ! রীতিমত ভাল ছিল। নচেৎ নিত্যনতুন অত দামী দামী শাড়ি,

বিলিতি প্রসাধন সব আসত কোথা থেকে ? ট্যাক্সি ছাড়া তো সে এক পা কখনও চলতই না।

বলেন কি ! তা অফিসে কত মাইনে পেত ?

বোধ হয় শ' দুই।

মাত্র ?

হ্যাঁ। কিন্তু অভিনয়—ইদানীং তো শুনতাম এক এক রাত্রের অভিনয়ে একশ' সোয়াশ' করে টাকা নিত। সপ্তাহে তিন-চারটে ক্লাবে অভিনয় তো তার বাঁধা ছিল বলতে গেলে।

ব্যাঙ্কে রাখত না কিছু ?

তা জানি না। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বড় একটা ছিল না।

বোনকে আপনি ভালবাসতেন না ?

বাসব না কেন ? তাই বলে অন্যায় আমি সহ্য করি না কখনও।

আচ্ছা অবিনাশবাবু, বাইরের কাউকে—মানে কোন যুবককে কখনও আপনাদের বাড়িতে আসতে দেখেছেন বা আপনার বোন মিশতেন এমন কাউকে জানেন ?

তা ঠিক জানি না, তবে একজন ভদ্রলোককে বার দুই দেখেছি ওর কাছে আসতে। মানে ঠিক আসা না, ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে।

তার কোন পরিচয় বা নাম জানেন ?

না।

বয়স কত হবে ?

তা বয়স বছর আটত্রিশ-উনচল্লিশ হবে—

দেখতে কেমন ?

মোটামুটি। তবে পরনের সুট দেখে মনে হয়েছে ভাল ইনকাম করেন ভদ্রলোক।

॥ সাত ॥

আরো কিছু কথাবার্তার পর সাড়ে দশটা নাগাদ অবিনাশ বিদায় নিল।

সুদর্শন একটা সিগারেট ধরায়।

সিগারেটটা শেষ করে উঠতে যাবে, দরজার বাইরে কার চাপা সতর্ক গলা শোনা গেল, জয় রাধেশ্যাম ! আসতে পারি স্যার ?

কে ? আসুন !

মোটাসোটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি প্রৌঢ় এদিক-ওদিক সতর্ক ভাবে তাকাতে

তাকাতে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি। মাথায় পরিপাটি তেড়ি, উগ্র একটা তেলের গন্ধ নাকে আসে। গলায় কাঠির মালা, চোখে রুপোর ফ্রেমের চশমা।

কোথা থেকে আসছেন? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

জয় রাধেশ্যাম! আজ্ঞে এই দশ নম্বর পল্লী থেকেই আসছি, আর কোথা থেকে আসব!

কি নাম আপনার?

রাধেশ্যাম! আজ্ঞে নরহরি সরকার।

কি করা হয়?

রাধেশ্যাম! আজ্ঞে ছোটখাটো একটা সোনার দোকান আছে বড় রাস্তার ওপর। চোখে অবিশ্যি পড়ার মত নয়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারী। চেয়ারটায় বসব স্যার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন।

নরহরি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

উগ্র তেলের গন্ধে সুদর্শনের নাক জ্বালা করে।

আমার কাছে কি কিছু প্রয়োজন ছিল সরকার মশাই?

রাধেশ্যাম! প্রয়োজন তেমন কিছু নয়—বলছিলাম আজ সকালে মাঠের বটগাছতলায় যে যুবতীটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তার সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেন?

আপনি কিছু জানেন নাকি?

রাধেশ্যাম! আমি—আমি কেমন করে জানব? তবে—

কি তবে?

যুবতীটি ওই পল্লীতেই থাকত তো। তাই আর কি—একটা খোঁজ নেওয়া। রাধেশ্যাম!

ওরা কি আপনার কোন আত্মীয়-টাত্মীয়?

রাধেশ্যাম! ওঁরা হলেন গিয়ে ব্রাহ্মণ, আর আমি স্বর্ণবণিক।

কিন্তু আপনার কৌতূহল দেখে মনে হচ্ছে—

রাধেশ্যাম! না, না, বিশ্বাস করুন, সেরকম কিছু নয়। তাহলে সত্যি কথাই বলি, আমি এসেছিলাম কয়েকটি সংবাদ আপনাকে দিতে। রাধেশ্যাম! তা আপনি যদি—

বেশ তো, বলুন না কি জানেন আপনি মাধবী দেবী সম্পর্কে?

কি জানেন! রাধেশ্যাম! মেয়েটি বিশেষ সুবিধের ছিল না।

কি রকম?

রাধেশ্যাম ! মানে—ওই নষ্ট-দুষ্ট চরিত্রের আর কি—

তাই বুঝি ?

রাধেশ্যাম ! হ্যাঁ, নৌটঙ্কী মশাই—যাকে বলে নৌটঙ্কী ! পল্লীর সব ছোকরাগুলোর কি ঢলাঢলি, মাতামাতি !

আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল না ?

রাধেশ্যাম ! ক্ষেপেছেন মশাই ? ওসব নষ্ট-দুষ্ট মেয়েছেলে যত এড়িয়ে চলা যায় ততই মঙ্গল। তবে হ্যাঁ, আসত—মধ্যে মধ্যে আমার দোকানে আসত।

গয়না গড়াতে বোধ হয় ?

রাধেশ্যাম ! আজ্ঞে না।

তবে আপনার গয়নার দোকানে কেন আসত ?

রাধেশ্যাম ! কথাটা তাহলে বলেই দিই। গিনি—বুঝলেন, গিনি—

গিনি !

হ্যাঁ, গিনি কিনতে আসত।

গিনি কিনতে !

রাধেশ্যাম ! তাহলে আর বলছি কি ? আগে আগে দিয়েছি, তবে ইদানীং সোনা কণ্ট্রোল হয়ে যাবার পর—রাধেশ্যাম ! গিনি আর কোথা পাব বলুন ?

তা তো বটেই। তবুও আসত, তাই না ?

রাধেশ্যাম ! সোনার লোভ বড় লোভ, বুঝলেন না—

আচ্ছা সরকার মশাই—

রাধেশ্যাম ! বলুন ?

আপনি তো দশ নম্বর পল্লীর দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ?

রাধেশ্যাম ! তা মনে করুন আপনার স্বর্গীয় পিতা,—তস্য স্বর্গীয় পিতার আমল থেকেই ওইখানে আমাদের বাস। দশ নম্বর পল্লী বলে তখন তো কিছুই ছিল না, পরে ওই নাম দেওয়া হয়েছে। ছেলেছোকরাদের কাজ, বুঝলেন না ? রাধেশ্যাম !

তাহলে তো আপনি সব খবরই রাখেন ওই দশ নম্বর পল্লীর ?

রাধেশ্যাম ! সব আমার নখদর্পণে।

তা তো হবেই। আচ্ছা, শুনেছি ওই দশ নম্বর পল্লীর মধ্যে একটা বিরাট চোরা-কারবারের ঘাঁটি আছে !

রাধেশ্যাম ! সে কি বলছেন হুজুর ?

আমার পূর্ববর্তী পুলিস অফিসাররা সেই রকম রিপোর্ট লিখে রেখে গিয়েছেন।

রাধেশ্যাম! না না, তা কখনও হতে পারে?

শুনেছি একজনের হাত দিয়েই মাল বেচা-কেনা হয়ে থাকে—

রাধেশ্যাম! আমি বৈষ্ণব মানুষ, ওসব খবর আমি থাকলেও জানি না। ছোট-খাটো একটা পৈতৃক আমলের দোকান আছে, তাই নিয়েই আছি। রাধেশ্যাম! আদার ব্যাপারী আমি, আমার জাহাজের খবরের প্রয়োজনটা কি বলুন আজ্ঞে?

তা বটে।

রাধেশ্যাম! এবারে তাহলে হুজুরের আজ্ঞা হোক, আমি উঠি।

আসুন।

রাধেশ্যাম! রাধেশ্যাম! নরহরি সরকার উঠে পড়ল।

॥ আট ॥

সুদর্শন আবার একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। সিগারেট টানতে টানতে চিন্তা করে সুদর্শন।

মাধবী সম্পর্কে আর একটা নতুন সংবাদ পাওয়া গেল। মধ্যে মধ্যে সে নরহরির কাছে টাকা দিয়ে গিনি ক্রয় করতে যেত।

ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখত না। অবিনাশের উক্তি থেকে বোঝা যায়, ইদানীং মাধবীর মাসিক আয় ভালই ছিল। একশোটা টাকা নিয়ে সপ্তাহে যদি তিন-চারটে অভিনয় করে, তাহলে কমপক্ষেও তার চাকরি নিয়ে ইনকাম বারো-চোদ্দশ' টাকা ছিল মাসে।

আয়ের বেশ কিছুটা অংশ হয়ত সে ওইভাবে গিনি ক্রয় করে জমাত। কিন্তু গিনিগুলো সে কোথায় রাখত?

তাদের বাড়িতেই কি? তাই যদি হয়ে থাকে, বাড়ির আর কেউ না জানলেও মাধবীর বোন সাবিত্রী হয়ত জানলেও জানতে পারে। কেউ ওই অর্থের লোভেই মাধবীকে হত্যা করেনি তো? অসম্ভব একটা কিছু নয়। হয়ত ওই অর্থই তার মৃত্যুর কারণ। প্রেম-ট্রেম-ঘটিত কোন ব্যাপার নেই। হয়ত সে ভুল পথেই এগোচ্ছিল।

নিঃসন্দেহে জটিল ব্যাপারটা।

খুব সতর্কভাবে থেকে অনুসন্ধানের ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে। মাধবীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যদি সব কিছু জানা যেত, হয়ত অনুসন্ধানের সুবিধে হত।

কিন্তু কেমন করে জানা যায় ?

পরের দিন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল।

Death due to strangulation! শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে মাধবীকে। শুধু তাই নয়, তার অনুমান ঠিক—মৃত্যুর পূর্বে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল।

বোঝা যাচ্ছে, যে-ই হত্যাকারী হোক মাধবীর—মাধবীর প্রতি তার একটা আক্রোশ জমা ছিল মনে, যে আক্রোশের ফলে হত্যাকারী তাকে ধরে জোর করে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। তারপর মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে বটগাছতলায় ফেলে রেখে এসেছে।

ডাক্তারের মতে রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে মাধবীর মৃত্যু হয়েছে কোন এক সময়ে।

আরও মনে হয়, সাধারণ কোন চোর-ছ্যাচোড়ের কাজ নয় ওটা।

তাহলে তার হাতের বালা ও দামী সোনার রিস্টওয়াচ থাকত না। হত্যাকারীর সেদিকে কোন নজর ছিল না।

বেলা চারটে নাগাদ পরের দিন অবিনাশের হাতে মাধবীর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছিল। সে ওই দশ নম্বর পল্লীরই কয়েকজনের সাহায্যে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ হল সন্ধ্যা হয়েছে। শীতের সন্ধ্যা ধোঁয়ায় শ্বাসরোধকারী।

সুদর্শন অফিস ঘরের মধ্যে বসে মাধবীর হত্যার কেসের একটা প্রাথমিক রিপোর্ট লিখছিল, দারোয়ানজী এসে জানাল, একজন জেনানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

যাও, ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

মাথায় গুণ্ঠন এক নারী। গায়ে একটা কালো আলোয়ান। কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ?

মাথার ওপর থেকে অবগুণ্ঠন হাত দিয়ে তুলে দিল নারী। চিনতে পারল সুদর্শন ওকে—নিহত মাধবীর বোন সাবিত্রী!

সাবিত্রী দেবী, বসুন!

আপনি আমায় গতকাল আসতে বলেছিলেন, কিন্তু আসতে পারিনি। মার ঘন

ঘন ফিট হচ্ছিল—

শুনেছি। তা আপনার মা এখন কেমন আছেন ?

ওই রকমই। সকালে আমার এক বিধবা মাসিমা এসেছেন, তিনিই এখন মার কাছে আছেন।

বসুন! দাঁড়িয়ে কেন ?

সাবিত্রী চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

সুদর্শন সাবিত্রীকে আসতে বলেছিল বটে, কিন্তু এখন কি ভাবে তার কথা শুরু করবে বুঝতে পারে না। অবশেষে সাবিত্রীই একসময় কথা বললে, আমাকে আপনি আসতে বলেছিলেন কেন ?

আপনাকে আসতে বলেছিলাম আপনার দিদির সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব বলে। কথাগুলো বলে সুদর্শন সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

বিষণ্ণ মুখখানি। চোখের কোল ফোলা। মনে হয় সর্বক্ষণই কাঁদছে। দু-একগাছি চূর্ণকুন্তল কপালের ওপর এসে পড়েছে।

এত কাছাকাছি সুদর্শন ইতিপূর্বে সাবিত্রীকে দেখবার সুযোগ পায়নি। মাধবীর মত সাবিত্রীও দেখতে সত্যিই সুন্দরী। গাত্রবর্ণ রীতিমত উজ্জ্বল গৌর। মুখখানি একটু লম্বা প্যাটার্নের। টানা-টানা দুটি চোখ, উন্নত নাসা। সব চাইতে সুন্দর ছোট কপাল ও পাতলা দুটি ঠোঁট ও চিবুকের গঠনটি। বাঁ গালে একটা লাল তিল আছে।

কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে যেন একটা শান্ত কমনীয় সৌন্দর্য আছে সাবিত্রীর চোখে মুখে—যেটা মাধবীর ছিল না। যৌবন উদ্ধত নয়, বিনম্র শান্ত সমাহিত।

মাধবীর চোখের দৃষ্টিতে ছিল যেন একটা স্পষ্ট যৌন আবেদন। সম্ভবত যেটা সব পুরুষকেই আকৃষ্ট করত—হয়ত তার অভিনয়শক্তিরও মূল উৎসই ছিল সেই যৌনাশ্রিত চোখের চটুল দৃষ্টি।

কিন্তু সাবিত্রীর চোখের দৃষ্টি শান্ত, কোমল, ভীরু।

তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার যা সুদর্শনের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, ইদানীংকার ওই বয়েসী মেয়েদের মত সাবিত্রীর পোশাকের মধ্য দিয়ে দেহের যৌবনকে প্রকট করে অন্যের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরার যেন বিন্দুমাত্র প্রয়াসও নেই।

সাধারণ ব্লাউজ ও শাড়ি সাধারণ ঘরোয়া ভাবে পরা।

মাধবীর নামোল্লেখেই বোধ হয় সাবিত্রীর চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। সে মাথা নীচু করে।

॥ নয় ॥

সুদর্শন ধীরে ধীরে একসময় শুরু করে—

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বুঝতেই পেরেছেন, আপনার দিদির মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়, তাকে কেউ নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে!

সাবিত্রী কোন জবাব দিল না, সে মুখ তুলে সুদর্শনের দিকে তাকাল। নীরব অশ্রুধারায় তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে তখন।

সুদর্শন বলতে থাকে, আমি জানি, আপনার দিদিকে আপনি খুব ভালবাসতেন।

আমার যা কিছু, মৃদু কণ্ঠে বললে সাবিত্রী, দিদিই ছিল।

বুঝতে পারছি। তাই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। কারণ তাঁর সম্পর্কে আপনি আমাকে যতটা সংবাদ দিতে পারবেন, আর কেউ তা হয়ত পারবে না।

আমি এখনও যেন ভাবতেই পারছি না দারোগাবাবু, দিদি নেই—দিদির মৃত্যু হয়েছে। একটু আমুদে—রহস্যপ্রিয় ও বেপরোয়া ছিল দিদি বরাবরই সত্যি, কিন্তু এভাবে যে তাকে কেউ খুন করতে পারে—আমার চিন্তারও অতীত ছিল।

শুনেছি আপনার দিদিই ইদানীং সংসারটা আপনাদের চালাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ। যে কাজ ছিল দাদা আর ছোড়দার উচিত-কর্তব্য—সেটা দিদিই করছিল। আর তাই তো আমি ভেবে পাচ্ছি না, এর পর আমাদের সংসারের কি অবস্থা হবে!

ভাবছেন কেন? এখন হয়ত দাদা ছোড়দাই দেখবেন?

জানেন না আপনি তাদের। তারা—, কিন্তু ঝোঁকের মুখে বলতে গিয়েও কথাটা বলল না সাবিত্রী, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় যে কথাটা বলবার জন্য উদ্যত হয়েছিল, সেটা আর সে বলল না। নিজেকে যেন সংযত করে নিল।

দিদি আপনাকে খুব ভালবাসত, তাই না?

আমার থেকে মাত্র তিন বছরের বড়, কিন্তু সে ছিল আমার সব। একাধারে সব কিছু।

এবারে তো আপনার বি-এ পরীক্ষা দেবার কথা?

পরীক্ষা হয়ত আর দেওয়াই হবে না।

হঠাৎ কি হল সুদর্শনের সে বলে বসল, কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে—শুনুন সেরকম যদি কিছু হয়ই আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবেন, আমি হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারব। জানাবেন তো!

সাবিত্রী তার জলে-ভরা দুটি চোখ বারেকের জন্য সুদর্শনের প্রতি তুলে আবার নামিয়ে নিল। কোন জবাব দিল না।

তাছাড়া আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, যেমন করেই হোক, আপনার দিদির হত্যাকারীকে আমি খুঁজে বের করবই। তবে আপনার সহযোগিতা—সাহায্য কিন্তু আমার চাই।

আমার সাহায্য! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় সাবিত্রী সুদর্শনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ আপনার সাহায্য!

কিন্তু আমি—

সুদর্শন মৃদু হাসল। বললে, আপনার চাইতে বেশি সাহায্য কেউ আমাকে করতে পারবে না।

কিন্তু কেমন করে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি!

আপনার দিদির সম্পর্কে আমি যা-যা জানতে চাই, আপনি যদি আমাকে বলেন—

কি জানতে চান বলুন?

আমি জানি এবং খবরও পেয়েছি, আপনার দিদির প্রতি দশ নম্বর পল্লীতে অনেকেরই নজর ছিল—

বিরক্ত দিদিকে অনেকেই করত জানি—

কে কে বলুন তো? আচ্ছা, আমিই বলি। আমার যদি ভুল হয় তো আপনি শুধরে দেবেন, কেমন? একটু থেমে সুদর্শন বলে, হীরু সাহা, খগেন পাঠক, কল্যাণ বসু—

হ্যাঁ—ঠিকই শুনেছেন আপনি।

আর কেউ?

আরও ছিল।

আর কে?

হরগোবিন্দ ঘোষ।

যার ওই লেদ কারখানা আছে?

হ্যাঁ। আগের দু-দুটো বৌ মারা গিয়েছে। দেখা হলেই দিদিকে বিয়ে করবার জন্য প্রায়ই তাকে পথেঘাটে বিরক্ত করত।

বলেন কি!

আরও, ওই যে নরহরি সরকার—

সেও! নরহরিও!

হ্যাঁ।

ওরও কি বৌ নেই ?

না। বছর চারেক হল বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। একটা ছেলে ও একটা মেয়ে আছে। আর এক ভাগ্নে ছিল, তাকে দূর করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

হুঁ। আর কেউ ?

আরও একজন দিদিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল জানি, কিন্তু দিদি তাকে প্রত্যাখ্যান করায় আর সে কখনও উচ্চবাচ্য করেনি।

কে সে ?

সুবোধদা।

মানে আপনাদের পাশের বাড়ির সুবোধ মিত্র ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা একটা কথা, আপনার দিদির কারও ওপর দুর্বলতা ছিল জানেন ? মানে কাউকে লাইক করতেন ? বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাই—

ওদের কারও প্রতি দিদির কোন দুর্বলতা ছিল বলে অন্তত আমি জানি না, তবে—

কি তবে ?

সুবোধদার প্রতি হয়ত তার মনটা—ওদের প্রতি যেমন তেমন বিরূপ ছিল না। হয়ত সুবোধদার প্রতি দিদির কিছুটা দুর্বলতা বা প্রশ্রয় ছিল।

কিসে বুঝলেন ?

বুঝতে পেরেছিলাম।

॥ দশ ॥

আচ্ছা আপনাদের পল্লীর বাইরের এমন কেউ কি ছিল যার প্রতি হয়ত তাঁর—আপনার দিদির কোন দুর্বলতা বা ভালবাসা ছিল? এবারে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে।

মনে হয়নি কখনও সেরকম কিছু।

কি করে বুঝলেন ?

হলে অন্তত আমি জানতে বোধ হয় পারতাম।

হুঁ। আচ্ছা, আপনার দিদির কাছে কেউ আসত না ? আর কারোর সঙ্গে তার আলাপ ছিল না ?

না।

কিন্তু আমি শুনেছি কে একজন স্যুট-পরা ভদ্রলোক নাকি মধ্যে মধ্যে মাধবী দেবীকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যেতেন!

কে—অমরবাবুর কথা বলছেন?

তা জানি না, তবে অমরবাবু কে?

উনি এক অফিসে কাজ করেন। ওঁদের অফিসে থিয়েটার করতে গিয়ে দিদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

লোকটার বয়স কত হবে।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে বলে মনে হয়।

অমরবাবুর সঙ্গে আপনার দিদির কি রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল?

আলাপ-পরিচয় ছিল জানি, তবে সেরকমের কিছু ঘনিষ্ঠতা হলে আমি জানতে পারতাম নিশ্চয়ই।

দিদি বুঝি সব কথাই আপনাকে বলত?

সবই বলত। রাত্রে আমরা এক বিছানায় শুতাম তো—শুয়ে শুয়ে গল্প হত।

অমরবাবুর কথা কখনও বলেনি?

না।

আপনার দিদি তাহলে কাউকে ভালবাসত বলে আপনার মনে হয় না?

মনে হয়নি কখনও।

আচ্ছা, আপনার দিদি তো অনেক টাকা উপায় করত, তাই না?

তা বোধ হয় করত।

কেন, উপার্জনের কথা আপনাকে কখনও কিছু বলেনি?

না। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি কখনও।

সব টাকা তো আর খরচ হত না, নিশ্চয়ই কিছু কিছু জমাত?

বোধ হয়।

জানেন না কিছু সে সম্পর্কে?

না, সঠিক কিছু জানি না। আমিও কখনও জিজ্ঞাসা করিনি, সেও বলেনি।

কোথায় টাকা রাখত—ব্যাঙ্কে?

হতে পারে। কারণ সব সময়ই দিদি আমাকে বলত, কিছু ভাবিস না সাবি, তুই পড়ে যা—যতদূর পড়তে চাস; তারপর খুব ভাল একটা ছেলে দেখে তোর বিয়ে দেব। আমি বলেছি, তুমি বিয়ে কর না। দিদি হেসেছে।

দিদির জামা-কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র কোথায় থাকত?

আমাদের ঘরে একটা সুটকেসের মধ্যে।

তার চাবিটা কোথায়?

আমি জানি না। চাবিটা সব সময় তার হ্যাণ্ড-ব্যাগেই বোধ হয় রাখত দিদি।

আগামী কাল আমি একবার আপনাদের বাসায় যাব ভাবছি।

কেন?

আপনার দিদির জিনিসপত্রগুলো একবার দেখতে হবে।

কেন?

যদি কোন ক্লু তার মধ্যে পাওয়া যায়!

কখন যাবেন?

সকাল দশটার মধ্যেই যাব।

আচ্ছা।

আর একটা কথা, আপনার দিদিকে কেউ কখনও কোন চিঠিপত্র লেখেনি?

ইদানীং আর কোন চিঠি আসেনি, তবে বছর দেড়েক আগে পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে আকাশ-নীল রঙের খামে দিদির কাছে চিঠি আসত।

কার চিঠি?

বলতে পারি না।

শোনেননি কিছু কখনও আপনার দিদির মুখে?

না।

আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?

না, করিনি।

আপনার জানবার কৌতূহল হয়নি?

কোন জবাব দেয় না সাবিত্রী, চুপ করে থাকে।

হুঁ। কতদিন সেরকম চিঠি এসেছে?

প্রায় বছর খানেক ধরে প্রতি মাসেই একখানা দুখানা। তারপর হঠাৎ একদিন আকাশ-নীল রঙের খামে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল।

আপনার সে চিঠি সম্পর্কে—সত্যি বলবেন, কখনও কোন কৌতূহল হয়নি?

মিথ্যা বলব না—হয়েছে—জিজ্ঞাসাও করেছিলাম একবার, কে তোকে চিঠি লেখে রে দিদি?

তারপর?

দিদি জবাব দিয়েছিল, ও আমার এক বন্ধু। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি কখনও তারপর।

আপনার দিদি সে-সব চিঠির নিশ্চয়ই জবাব দিত, নচেৎ আবার চিঠি আসবে কেন?

জবাব দিত কিনা জানি না, কখনও দিতে কিন্তু আমি দেখিনি।

থানার ঘড়িতে ওই সময় ঢং ঢং কার রাত দশটা ঘোষণা করল।

অনেক রাত হল, এবার আমি যাই। সবিত্রী উঠে দাঁড়ায়।

আর একটা কথা সাবিত্রী দেবী, আপনার দিদির গিনি জমাবার শখ ছিল, তাই না?

গিনি!

হ্যাঁ, গিনি?

তা—তা তো জানি না।

আপনি দেখেননি বা শোনেননি কখনও?

না।

আচ্ছা, এবার আপনি যান—না চলুন একা যাবেন না—রাত অনেক হয়েছে, থানা থেকে অনেকটা পথ। চলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুদর্শন উঠে দাঁড়াল ড্রয়ার থেকে টর্চটা বের করে পকেটে পুরে।

ইতিমধ্যে চারদিক কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। একে শীতের রাত, তায় প্রায় দশটা বেজে গেছে। অন্যান্য রাতের মত তখনও সে-রাত্রে কুয়াশা নামেনি।

রাতের আকাশ বেশ পরিষ্কার। চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় চারদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বাইরে বেশ শীত। থানা থেকে বের হয়ে আসতেই সেটা উভয়েই টের পায়।

॥ এগারো ॥

আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন? সাবিত্রী বলে, একাই অনায়াসে আমি চলে যেতে পারতাম।

তা পারতেন, তবে এত রাত্রে এ পথটা খুব ভাল নয়। মিলের ওয়ার্কাররা এই সময়টা মদ খেয়ে ফেরে অনেকেই।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল।

সাবিত্রী আবার মাথায় গুণ্ঠন তুলে দিয়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল।

খুব শীত পড়েছে। সুদর্শন হাঁটতে হাঁটতে একসময় বলে।

সাবিত্রী সুদর্শনের কথার কোন জবাব দেয় না।

আচ্ছা সাবিত্রী—

হঠাৎ যে কেন সুদর্শন সাবিত্রীকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে, নিজেও বুঝি বুঝতে পারে না।

বলুন ?

তোমার দিদির কোন শত্রু ছিল বলে তোমার মনে হয় ?

শত্রু ?

হ্যাঁ।

না, তেমন তো কোন কিছু শুনিনি। তবে মনে হয় আমার, হীরু সাহার দিদির ওপরে একটা আক্রোশ ছিল হয়ত।

কেন ? আক্রোশের কারণ ছিল কি ?

ছিল।

কি ?

দিদিকে হীরু সাহা একসময় বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু দিদি ·flatly তাকে না করে দিয়েছিল।

তারপর ?

সেই ব্যাপার নিয়ে দাদার সঙ্গে শুনেছি হীরু সাহার কথা-কাটাকাটি হয়েছিল।

পল্লীতে আর কারও কোন রকম তার প্রতি আক্রোশ ছিল না ?

না। তাছাড়া আগেই তো আপনাকে বলেছি, দিদি অত্যন্ত বেপরোয়া আর দুঃসাহসী ছিল, কেউ আর থাকলেও দিদি হয়ত কখনও বলেনি সে কথা আমাকে।

তোমার দাদাদের সঙ্গে দিদির সম্পর্ক কেমন ছিল ?

দাদা দিদিকে দেখতে পারত না এতটুকু, ঠেস দিয়ে ছাড়া কথাই বলত না কখনও। দিদি অবিশ্যি কখনও কোন জবাব দেয়নি—

আর ছোড়দা ?

ছোড়দা একটু বেশি রাগী হলেও দিদির সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করত।

তাই বুঝি !

হ্যাঁ। মধ্যে মধ্যে টাকার দরকার হলে দিদির কাছেই যে তাকে হাত পাততে হত।

কেন ? সে তো শুনেছি ভালই রোজগার করে।

করলে কি হবে। অত বাবুয়ানী করলে আর মদ খেলে টাকা থাকবে কোথা থেকে ?

তোমার ছোড়দা ফিরেছে ?

যখন বাড়ি থেকে বের হই তখনও আসেনি—

কাল যেন বাড়িতেই থাকে, আমি না যাওয়া পর্যন্ত—বোলো তাকে।

বেশ, বলব। কিন্তু—

যদি না ফিরে এসে থাকে তবেই তো ! না এলে আর কি করবে ?

না, তা নয়—বলছিলাম, আর আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে না। আমি তো বাড়ব কাছে প্রায় এসেই গেছি, এবার একা-একাই আমি বাকি পথটুকু চলে যেতে পারব।

সুদর্শন বুঝতে পারে, সাবিত্রীর ইচ্ছা নয় সে আর তার সঙ্গে যায়।

সুদর্শন দাঁড়িয়ে গেল, বললে, বেশ, যাও।

সাবিত্রী পল্লীর দিকে এগিযে গেল। সুদর্শন কিন্তু তার পরও অনেকক্ষণ সেইখানেই পথের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। সবিত্রীর চলমান দেহটা ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল একসময়।

চারদিকে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা। রাতের আকাশ থেকে নিঃশব্দে যেন শীতের হিম ঝরে পডছে। কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। ধীরে ধীরে একসময় থানার পথে ফিরল সুদর্শন।

কয়েক পা অগ্রসর হতেই কানে এল একটা ক্ষীণ গানের সুর। কে যেন গান গাইতে গাইতেই পল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে। ক্ষীণ হলেও গানের সুর ও কথাগুলিও স্পষ্ট শুনতে পায় ঃ

এত জল তোর কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল্ কে !

সুদর্শন দাঁড়ায়।

গানের কথাগুলো কিছুটা যেন জড়ানো-জড়ানো। ক্রমশঃ গানের সুর আরও স্পষ্ট হয়। ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসে।

পরনে লংস ও গায়ে হাওয়াই শার্ট, মাথায় ও গলায় একটা কম্ফর্টার জড়ানো, কে একজন গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে আবছা-আবছা দেখতে পায় সুদর্শন। এবং প্রায় আসতে আসতে হঠাৎ বোধ হয় সুদর্শনকে দেখতে পেয়েই ওর হাত দুয়েক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঝাপসা ঝাপসা চাঁদের আলোয় সুদর্শন দেখতে পায়, লোকটা পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল। প্যাকেটে বোধ হয় একটাই সিগারেট

অবশিষ্ট ছিল। সিগারেটটা মুখে দিয়ে পকেট হাতড়ে একটা দেশলাই বের করল। তারপর দুটো কাঠি জ্বালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু একটাও জ্বলল না। আর কাঠি অবশিষ্ট ছিল না বোধ হয় দেশলাইয়ের বাক্সে।

বিরক্ত চিত্তে শূন্য দেশলাইয়ের বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বললে, লে বাবা, ফিনিশ!

হঠাৎ ওইসময় সামনে দণ্ডায়মান সুদর্শনের দিকে নজর পড়ায় ওর দিকে তাকাল এবং বললে, ম্যাচিস আছে নাকি স্যার?

সুদর্শন পকেট থেকে তার দেশলাইটা বের করে কয়েক পা এগিয়ে এসে লোকটার দিকে এগিয়ে ধরল।

॥ বারো ॥

লোকটি দেশলাইটা হাতে নিয়ে একটা কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে দেশলাইটা ফিরিয়ে দিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললে, থ্যাঙ্কস!

ক্ষণপূর্বে দেশলাই-কাঠির আলোতেই লোকটাকে চিনতে পেরেছিল সুদর্শন—সাবিত্রীর ছোড়দা অমলেন্দু।

দেশলাইটা ফিরিয়ে দিয়ে আর একটি কথাও না বলে সিগারেট টানতে টানতে অমলেন্দু পল্লীর দিকে এগিয়ে গেল। অমলেন্দুর দেহটা আবছা আলো-অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই সুদর্শন আবার থানার দিকে পা বাড়াল।

শীতের হিম-ঝরা রাত স্তব্ধ, নিঃসঙ্গ। থানার পথে ফিরতে ফিরতেই হঠাৎ কি মনে হয় সুদর্শনের। থানার দিকে না গিয়ে পল্লীর দিকেই চলতে লাগল আবার।

পল্লীর সব বাসিন্দাই ততক্ষণে যে যার ঘরে খিল এঁটে শয্যায় গা ঢেলে দিয়েছে। মাধবীদের গৃহের দিকে কেন জানি চলতে লাগল সুদর্শন। হঠাৎ কানে এল বেহালার একটা মিষ্টি সুর।

পল্লীর মধ্যেই কোথায় কে যেন বেহালা বাজাচ্ছে। সুরটা ভারি মিষ্টি এবং চেনা-চেনা মনে হয় সুদর্শনের। সুরটা ধরা পড়ে—বাগেশ্রী। বাগেশ্রী সুরে চমৎকার আলাপ করছে বেহালায়। বেহালার সেই সুরালাপের আকর্ষণে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যায় সুদর্শন।

সুবোধ মিত্রের সেই চেনা বাড়িটার সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে গেল সুদর্শন। বাইরের দিককার একটা জানলা খোলা। খোলা জানলাপথে আলোর আভাস চোখে পড়ে।

সেই ঘর থেকেই বেহালার আলাপ ভেসে আসছে। এত রাত্রে সুবোধ মিত্রের বাড়িতে কে বেহালা বাজায়? সুবোধ মিত্রের বাড়ির বাইবের ঘর ওটা!

ক'দিন আগে দেখা ঘরের পরিচ্ছন্ন চেহারাটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুদর্শনের।

বেতের এক সেট সোফা। কাচের একটা আলমারি-ভর্তি বই। একটি তক্তাপোশ এক কোণে—ওপরে সুজনি বিছানো। এক কোণে একটি ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি ও চিনেমাটির সুদৃশ্য একটি ভাসে একগোছা ফুল। দেওয়ালে ঝোলানো একটি বেহালার বাক্স।

আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে জানলা-পথে ভেতরে দৃষ্টিপাত করতেই সুদর্শনের নজরে পড়ল, ঘরের মধ্যে তক্তাপোশটার ওপর বসে চোখ বুজে আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে সুবোধ মিত্রই।

সুদর্শন মগ্ন হয়ে যায়। ভদ্রলোকের সঙ্গীতে ও বাদ্যযন্ত্রেও চমৎকার দখল।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজনা শুনে সুদর্শন আবার পল্লী থেকে বের হয়ে এল।

মাঝামাঝি পথ এসেছে, হঠাৎ নজরে পড়ল আগাগোড়া একটা চাদরে আবৃত কে একজন উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

হাতে ধরা একটা টর্চবাতি, মধ্যে মধ্যে টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেলছে সন্তর্পণে।

হঠাৎ টর্চের আলো সুদর্শনের গায়ে পড়তেই লোকটা বলে উঠল, কে? কে ওখানে?

সুদর্শন জবাব দেয় না। গলার স্বরেই চিনতে পেরেছিল অবিশ্যি—প্রশ্নকারী কে!

প্রশ্নকারী আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে সরাসরি হাতের টর্চের আলো একেবারে সুদর্শনের মুখের ওপর ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্ময়-চকিত কণ্ঠ হতে নির্গত হয়, রাধেশ্যাম! দারোগা সাহেব যে?

নরহরিবাবু!

রাধেশ্যাম! প্রাতঃপ্রণাম

প্রাতঃপ্রণাম কেন? এখন বোধ হয় রাত বারোটা—

রাধেশ্যাম! রাতের আর বাকি রইল কি?

তা এত রাত্রে ফিরছেন কোথা থেকে?

রাধেশ্যাম। কোথা থেকে আর—দোকান থেকেই-ফিরছি।

সুদর্শন ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছিল নরহরি সরকারের হাতে একটা ঝোলা। নরহরি যেন ঝোলাটা সামলাতে একটু ব্যস্তই হয়ে ওঠে।

এত রাত্রে দোকান থেকে?

রাধেশ্যাম! রাত আর কি? দোকানে তালাটালা দিয়ে বেরুতে বেরুতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়।

তাই তো দেখছি। একটু বেশি বিলম্বই বোধ হয় হয় আপনার।

রাধেশ্যাম! বিশ্বাস নেই বুঝলেন দারোগা সাহেব, আজকালকার দিনে আর কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না তো। তাই নিজেকেই সব দেখাশুনো করে সামলে-সুমলে আসতে হয় আর কি। রাধেশ্যাম!

তা হাতে কি? র‍্যাশন নাকি?

রাধেশ্যাম! ঠিক ধরেছেন। র‍্যাশনই।

তা বাড়িতে আপনার ক'টি প্রাণী?

বেশি নয়—রাধেশ্যাম—তিনটি।

আপনি, আপনার ছেলেমেয়ে, এই তো?

রাধেশ্যাম! আজকালকার দিনে তিনজনের খাইখরচাই কি কম! আপনিই বলুন না?

তা তো বটেই।

রাধেশ্যাম! অগ্নিমূল্য—সব অগ্নিমূল্য—বুঝলেন না? হাত দেবার জো আছে কি? হাত পুড়ে ছাই হয়ে যায় যেন—রাধেশ্যাম! আচ্ছা চলি, প্রণাম। রাত হল।

আসুন।

নরহরি সরকার আর দাঁড়াল না। হনহন করে চলে গেল।

সুদর্শনের মনে হল যেন কতকটা দৌড়েই তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল নরহরি সরকার।

॥ তেরো ॥

থানায় এক এক করে ডেকে এনে সুদর্শন পরের দিন সকাল থেকে দশ নম্বর পল্লীর অনেককেই নানা ভাবে জেরা করল।

সুদর্শন প্রথমেই ডেকেছিল হীরু সাহাকে।

হীরু সাহা থানায় ঢুকেই উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে, কি ব্যাপার স্যার, বলুন তো?

থানায় আসবার জন্যে জরুরী তলব পাঠিয়েছিলেন কেন ?

বসুন।

না মশাই, বসে আড্ডা দেওয়ার সময় আমার নেই। কেন তলব পাঠিয়েছিলেন বলুন !

সুদর্শন আবার গম্ভীর গলায় কতকটা যেন আদেশের ভঙ্গিতেই বললে, বসুন।

সুদর্শনের গলার স্বরেই বোধ হয় এবার হীরু সাহা খানিকটা থতমত খেয়ে যায়। সামনের খালি চেয়ারটায় বসে পড়ে।

বসতে বসতে বললে, আশ্চর্য ! এ তল্লাটে থানা-অফিসার হয়ে এসেছেন বলে কি জুলুম করবেন সবার উপরে ?

শুনুন হীরুবাবু, জুলুম নয়—আইনঘটিত একটা ব্যাপারের জন্যই আপনাদের প্রত্যেককেই আপনাদের পল্লীর আমাকে ডাকতে হয়েছে। কতকগুলো কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ও তার জবাব চাই।

বেশ। বলুন কি জানতে চান ?

গত উনিশ তারিখে অর্থাৎ শনিবার যে রাত্রে মাধবী দেবী নিহত হন, সে রাত্রে কখন আপনি বাড়ি ফেরেন ?

কেন বলুন তো ?

যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন।

হীরু সাহা একবার তির্যক দৃষ্টিতে সুদর্শনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বললে, সে রাত্রে ভোর চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ বোধ হয় আমি ফিরেছিলাম বাড়ি।

বোধ হয় ! তা অত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?

যাত্রার রিহার্সাল ছিল আমাদের।

সারারাত ধরে যাত্রার রিহার্সাল !

হ্যাঁ, শনিবার শনিবার সারাটা রাত ধরেই প্রায় আমাদের রিহার্সাল হয়।

কোথায় রিহার্সাল হয়—যাত্রাদলের নাম কি ?

নবীন অপেরা পার্টি।

কোথায় সেটা ?

জুয়েলার নরহরি সরকারকে চেনেন ?

দশ নম্বর পল্লীর আপনাদের নরহরি সরকার তো ?

হ্যাঁ।

তা চিনি বৈকি।

তারই পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা দশ নম্বর পল্লীতে একটা যাত্রাপার্টি খুলেছি—নবীন অপেরা পার্টি।

কোথায় সেটা ?

পল্লীতে ঢুকতে বড় রাস্তা পার হয়েই যে ছোট রাস্তাটার মুখে দোতলা লাল বাড়িটা—

যার দোতলায় একটা ব্যাঙ্ক আছে ?

হ্যাঁ তারই একতলার ঘরে আমাদের নবীন যাত্রাপার্টির অফিস ও রিহার্সাল-রুম।

কতদিন থেকে ওই যাত্রার দল খুলেছে।

বছর তিন হবে।

বটে! তা কি কি পালা করলেন ?

পালা আজ পর্যন্ত দুটো হয়েছে। তৃতীয় নতুন পালার রিহার্সাল চলেছে।

কি পালা ?

বীর ঘটোৎকচ।

বাঃ, বেশ নামটা তো! তা কার লেখা ওই পালাটা।

আমাদেরই দলের একজনের লেখা।

কে সে ? আপনাদের দশের পল্লীরই একজন কি ?

হ্যাঁ। নরহরিদার নিজের লেখা।

বলেন কি। সরকার মশাই তো তাহলে দেখছি গুণী ব্যক্তি। তা উনিও যাত্রার যাত্রার দলে পার্ট করেন নাকি ?

না।

কেন।

তাঁর সময় কোথায় ?

খুব বিজি মানুষ, তাই না ?

হ্যাঁ।

তা সে-রাত্রে রিহার্সালে আর কে কে ছিল ?

আমরা জনা-চারেক।

মাত্র চারজনকে নিয়ে নতুন নাটকের রিহার্সাল সারাটা রাত ধরে প্রায় হল ?

নতুন একটি মেয়ে নেওয়া হয়েছে যাত্রার দলে। সেই যাজ্ঞসেনী করবে। তাই মোশন মাস্টার তাকে আর আমাদের তিনজনকে নিয়ে বিশেষভাবে রিহার্সাল দিচ্ছিলেন।

॥ চোদ্দ ॥

মোশন-মাস্টারটি কে? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে।

অম্বিকাদা।

অম্বিকাদা! কে সে? আপনাদেরই দশ নম্বর পল্লীর কেউ?

হ্যাঁ।

তা ভদ্রলোক আর কি কাজকর্ম করে?

স্টেট বাসের ড্রাইভার।

হুঁ। তা আপনারা তিনজন ছাড়া আর কে কে সেদিন রাত চারটে পর্যন্ত রিহার্সাল দিয়েছিলেন?

আমি, গোকুল খাঁ, আর ছিল অমলেন্দু।

অমলেন্দু মানে অমলেন্দু ব্যানার্জী—মাধবী ব্যানার্জীর ভাই?

হ্যাঁ।

সে-রাত্রে রাত চারটে পর্যন্ত রিহার্সালে ছিলেন অমলেন্দুবাবু?

না, রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সে চলে যায়।

আপনি কখন রিহার্সাল-রুমে গিয়েছিলেন?

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ—খেয়েদেয়ে।

তাহলে রাত সাড়ে ন'টা থেকে রাত চারটে পর্যন্ত আপনি রিহার্সাল রুমেই ছিলেন?

তাই ছিলাম।

মধ্যে একবারও বাইরে যাননি?

না।

ঠিক করে মনে করে দেখুন, রাত সাড়ে দশটা থেকে রাত বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে—

না।

যাননি যে প্রমাণ করতে পারবেন তো?

পারব। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

মানে আপনাদের যার যার সঙ্গে মাধবী দেবীর পল্লীতে একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাদের সে-রাত্রের গতিবিধি সম্পর্কে আমার জানা প্রয়োজন, তাই—

আমার সঙ্গে মাধবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল, কে আপনাকে বললে?

ও কি আর চাপা থাকে মশাই—প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার—

ভুল করেছেন তাহলে আপনি !

ভুল করেছি ?

হ্যাঁ, রীতিমত ভুল। কারণ মাধবীর সঙ্গে আমার যাকে বলে ঝগড়াই ছিল। মুখ দেখাদেখিও ছিল না ইদানীং।

ঝগড়ার কারণটা কি—প্রত্যাখান ?

আজ্ঞে না।

তবে ?

সে আপনার শুনে কি হবে।

তবু না হয় শুনলাম।

বলতে আমি বাধ্য নই।

তাহলে আপনারই ক্ষতি।

মানে ?

মানে তো সহজ। পুলিস আপনাকেও মাধবীর হত্যাকারী হিসাবে সাসপেক্টস্‌দের দলেই ফেলবে'।

তার মানে বলতে চান আমি মাধবীকে হত্যা করেছি ?

সেরকম ভাবাটা কি খুব অন্যায় কিছু ? আপনিই বলুন না ?

হঠাৎ যেন হীরু সাহা স্তব্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুদর্শনের মুখের দিকে। তারপর বলে, আপনি তাই বিশ্বাস করেন নাকি ?

খানিকটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে বৈকি।

কেন ?

সে-রাত্রে আপনার গতিবিধি সম্পূর্ণ না জানা পর্যন্ত সন্দেহের তালিকা থেকে তো আপনাকে বাদ দেওয়া যাবে না !

কিছুক্ষণ আবার হীরু সাহা চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে, তারপর বলে, আপনি বিশ্বাস না করলে কি করতে পারি বলুন ! তবে জানবেন মাধবীকে আমি হত্যা করিনি।

হত্যা করেছেন—তা কি বলেছি হীরুবাবু? তাছাড়া—

সুদর্শন কথাটা শেষ করে না, হীরু সাহার মুখের দিকে তাকায়। হীরু সাহাও ওই সময় তার মুখের দিকে তাকায়।

তাছাড়া কি ? হীরু সাহা মিনমিনে গলায় যেন প্রশ্নটা করে এবারে।

আমি জানি, আপনি মাধবীকে ভালবাসতেন।

কে—কে বললে ?

হ্যাঁ, তাকে আপনি বিয়েও করতে চেয়েছিলেন ; এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন ইদানীং।

না।

নয় ?

না, আপনি মিথ্যে খবর পেয়েছেন।

মিথ্যে খবর ?

হ্যাঁ। ওর মত একটা সামান্য মেয়েকে ভালবাসতে যাব আমি কোন্ দুঃখে ?

দুঃখে তো মানুষ ভালবাসে না, ভালবাসাটা আনন্দেরই প্রকাশ। যাক গে সে কথা। এবার বলুন তো মাধবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল আপনার কি নিয়ে ?

সে সম্পূর্ণ আমার পার্সোনাল অ্যাফেয়ার।

সেটাও তাহলে বলবেন না ?

বলবার কিছু নেই।

হুঁ। আচ্ছা, ওর দাদা অবিনাশবাবুর সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই হৃদ্যতা আছে ?

ওটা তো একটা ছুঁচো। আই হেট হিম—

হুঁ। হীরুবাবু, কতদূর আপনি লেখাপড়া করেছেন ? না, সেটাও বলতে আপনার আপত্তি আছে ?

আমি স্কুল-ফাইনাল পাস।

কবে কত বছর আগে পাস করেছেন ?

মাধবীর দু বছর আগে।

সুদর্শন মল্লিক হীরু সাহাকে মাধবীর নামোচ্চারণ করতে শুনে মৃদু হাসল।

আচ্ছা, অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা আছে কি ?

অশিক্ষিত একটা বাস-ড্রাইভার, তায় বেহেড মাতাল। ওর সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা হয়।

আর খগেন পাঠক ?

কে, খগনা ? ওই মোটর-মেকানিকটা ? ওটা তো একটা বুদ্ধু দি গ্রেট নাম্বার ওয়ান—

আর কল্যাণবাবু ?

ও তো আমাদের মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের পাণ্ডা। ওকে শ্রদ্ধা করে না এ তল্লাটে কে এমন আছে !

আর সুবোধ মিত্র আপনাদের দশ নম্বর পল্লীর ?

ও আমাদের পল্লীতে থাকে বটে, তবে আমাদের কা'রও সঙ্গে কখনও মেশেই না। বি-এ পাস। অফিসে ভাল চাকরি করে। তার উপর আবার চমৎকার বেহালা বাজায়। ওর সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ লোকের বন্ধুত্ব হবে, তাহলেই হয়েছে !

আচ্ছা, নরহরি সরকার লোকটা কেমন ?

কেন, বলুন তো ? নরহরিদার ওপরেও আপনার সন্দেহ হয় নাকি ?

ছি ছি, কি যে বলেন ! সাত্ত্বিক, বৈষ্ণব মানুষ, ওকে সন্দেহ করব কি ? এমনি জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম—

তা এবারে আমি যেতে পারি ?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! যাবেন বৈকি।

তাহলে চললাম। নমস্কার।

সুদর্শন কোন জবাব দেয় না। সে যেন অন্যমনস্ক ভাবে তখন কি ভাবছিল।

হীরু সাহা বের হয়ে যায় থানার অফিস ঘর থেকে।

॥ পনেরো ॥

হীরু সাহার পর সুদর্শন খগেন পাঠক ও কল্যাণ বসুকেও ডেকে পাঠিয়েছিল থানায়।

তাদের দুজনের কারও কাছ থেকেই বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি সুদর্শন।

কল্যাণ বসু ওই দিন রাত্রে অর্থাৎ গত উনিশে শনিবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে আগের দিন থেকেই শয্যায় শুয়েছিল।

আর খগেন পাঠক নাকি ওই দিন রাত্রে ঘুমিয়ে ছিল। সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে, বাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।

তাছাড়া কল্যাণ বসু লোকটার সরু প্যাকাটির মত যেরকম চেহারা, তাতে করে মাধবীর মত স্বাস্থ্যবতী ও পূর্ণযৌবনা একটি মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করাটা অত সহজ নয়। অতএব ওদের দুজনের ওপরই সন্দেহটা সুদর্শনের তেমন জোরাল হয় না।

ঐদিনই বিকেলের দিকে এল অমলেন্দু—মাধবীর ছোড়দা।

অমলেন্দু প্রথমটায় আসতে চায়নি, আসেওনি। কিন্তু সাবিত্রী যখন বললে, ছোড়দা, থানার দারোগা ডেকে পাঠিয়েছেন, একবার ঘুরে আসতে ক্ষতি কি—

অমলেন্দু কি জানি কেন আর আপত্তি জানায়নি।

কি একটা ছুটির দিন যেন ছিল ওই দিনটা। তাছাড়া অফ্-ডিউটিও ছিল তার।

মাধবীর হত্যা-রহস্যের ব্যাপারটাই বিকেলের দিকে থানা-অফিস ঘরে একা বসে বসে ভাবছিল সুদর্শন, এমন সময় অমলেন্দু এল।

সে ঘরে ঢুকেই নিজে থেকেই বললে, আমার নাম অমলেন্দু ব্যানার্জি—মাধবীর ছোড়দা আমি। আমাকে আপনি ডেকেছেন শুনলাম!

বসুন, বসুন।

অমলেন্দু বিনা দ্বিধায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

অমলেন্দুর চেহারাটা খুব রোগা নয়, আবার মোটাও নয়—মাঝামাঝি। চোখের কোণে কালি, ভাঙা চোয়াল দেখলেই মনে হয় দেহের ওপর রীতিমত অত্যাচার করে লোকটা। পরনে একটা পায়জামা ও একটা পাঞ্জাবি, তার ওপরে একটা আলোয়ান জড়ানো।

আপনিই তাহলে সাবিত্রী দেবীর ছোড়দা? সুদর্শন বললে।

হ্যাঁ, বললাম তো।

আচ্ছা, গত উনিশে শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?

আমি ও সময়টা কৃষ্ণনগরে একদল বরযাত্রী নিয়ে বাস চালিয়ে গিয়েছিলাম।

ঠিক বলছেন?

কেন, বেঠিক বলব কেন?

কিন্তু আমি যে খবর পেয়েছি অন্যরকম!

কি খবর পেয়েছেন, জানতে পারি কি?

আপনি সন্ধ্যে থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত যাত্রার রিহার্সাল দিয়েছেন।

বাজে কথা। একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা।

বলছেন মিথ্যে কথা!

আলবৎ। কিন্তু কোন্ শালা অমন মিথ্যে কথাটা বলেছে, বলুন তো?

তা জেনে আপনার কি হবে? আপনি বলছেন রিহার্সাল দেননি, ফুরিয়ে গেল। তবে এটা যদি প্রমাণিত হয় পরে যে আপনি রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত রিহার্সাল-রুমে রিহার্সাল দিয়েছেন, ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াতে পারে এই আর কি!

মানে?

মানে, সেই রাত্রেই কিছু পরে আপনার বোন মাধবীকে হত্যা করা হয়েছিল কিনা!

কি বলছেন স্যার—আপনি কি শেষ পর্যন্ত তাহলে আমাকেই আমার বোনের হত্যাকারী বলে ঠাওরালেন নাকি?

সে-রাত্রে ওই সময়টা—মানে, রাত দশটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আপনার মুভমেণ্টস্ সম্পর্কে যদি সঠিক প্রমাণাদি না দিতে পারেন, পুলিস আপনাকেও সন্দেহ করবে বৈকি।

বাঃ, মশাই, বেশ! চমৎকার বুদ্ধি—ভাই হয়ে আমি আমার বোনকে খুন করব!

তা প্রয়োজনে ও স্বার্থে ভাই বোনকে, বোন ভাইকে, স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকেও খুন অনেক সময় করে বৈকি।

হঠাৎ যেন অমলেন্দু কেমন বোবা হয়ে যায়। তারপর একসময় ধীরে ধীরে বলে, না, না, স্যার, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাকে সত্যিই খুব ভালবাসতাম। ব্যাপারটা শোনা অবধি আমি কেবলই ভাবছি, কে তাকে খুন করতে পারে। যে-ই তাকে খুন করুক, যেমন করে হোক, তাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে।

তাহলে বলছেন না কেন, ওই সময়টা সে-রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? কারণ আমি জানি, আপনি আদৌ কৃষ্ণনগরে সে-রাত্রে বাস নিয়ে যাননি—যদিও সবাই তাই জানে, আপনিও সবাইকে তাই বলেছেন।

অমলেন্দু সুদর্শনের শেষের কথায় হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায় আবার।

কি, তাই সত্যি নয় কি? আপনি যাননি সে-রাত্রে বাস নিয়ে কৃষ্ণনগরে?

না, যাইনি।

তবে রাত সাড়ে দশটায় রিহার্সাল ক্লাব থেকে উঠে কোথায় গিয়েছিলেন? আর তার পরের দুটো দিন কোথায়ই বা ছিলেন রাত এগারটা পর্যন্ত?

একটা বিশেষ কাজে আমাকে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল।

কি কাজ? কোথায় যেতে হয়েছিল?

বলতে পারব না আমি।

বলবেন না!

বললাম তো, বলতে পারব না।

হুঁ। আচ্ছা, বাসের ড্রাইভারি করে আপনি কত পান?

মাইনে ও উপরি—মানে ওভারটাইম নিয়ে শ'তিনেক মত পাই।

তবু আপনি সংসারে কিছু তো দিতেনই না, এমন কি মধ্যে মধ্যে আবার মাধবী দেবীর কাছ থেকেও টাকা নিতেন, সত্যি কি না?

নিতাম। তা এত খবর পেলেন কোথায়?

যেখানেই হোক পেয়েছি, কিন্তু এখন বলুন তো একা মানুষের অত টাকার আপনার কি এমন প্রয়োজন হত ?

একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করি আমি—

তাও আমি জানি। তা এখন কি করবেন ? মাধবী দেবীই তো শুনেছি এতদিন আপনাদের সংসারটা চালাতেন!

কি আর করব—ও শালার মদটাই হয়ত শেষ-বেশ ছেড়ে দিতে হবে দেখছি।

পারবেন ?

বোধ হয় পারব না। তবু চেষ্টা তো করতে হবে। কারণ বড়বাবু এর মধ্যেই নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন, বাড়িতে আর তিনি থাকবেন না, মিলের কোয়ার্টারে চলে যাবেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। বড়বাবু আমাদের সুখের লোটন পায়রা। অত ঝামেলা তার সইবে কেন ? তা আমিও বলে দিয়েছি—

কি বলে দিয়েছেন ?

যেদিন খুশি যেখানে খুশি তার সে যেতে পারে।

॥ ষোল ॥

সুদর্শন একটু থেমে বললে, তা সংসারে তো আপনাদের লোক কম নয়! একা একা চালাতে পারবেন ?

যেমন করে হোক চালাব—চালাতেই তো হবে।

আচ্ছা শুনেছি সাবিত্রী দেবীর পড়ার খরচ মাধবী দেবীই দিতেন ?

হ্যাঁ।

এখন আপনার বোন সাবিত্রীর পড়ার কি হবে ?

ও বলছিল ছেড়ে দেবে। পরীক্ষা আর দেবে না। তা আমি বলে দিয়েছি, পরীক্ষা শালা দিতেই হবে। বি-এ পাস তাকে করতেই হবে। বাবার খুব দুঃখ, তার একটা ছেলেমেয়েও বি-এ পাস করল না।

কেন, মাধবী দেবী ?

মাধবীটা কোনমতে থার্ড ডিভিসনে আই-এ পাস করেছিল। তারপরই তো ঢুকে

গেল চাকরিতে—আর সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করতে শুরু করে দিল।

আপনার বাবা মাধবী দেবীর অভিনয় করার ব্যাপারটা জানতেন?

না। তিনি কোনদিনই জানতে পারেননি। তারপর একটু থেমে অমলেন্দু বললে, বাবার ইচ্ছা ছিল ও চাকরি করতে করতেই বি-এ পরীক্ষাটা দেয়, কিন্তু ওই বয়সে কাঁচা পয়সা হাতে এলে যা হয়—গেল মাথাটা বিগড়ে।

কেন, বিগড়ে গেল বলছেন কেন?

তাছাড়া কি! যা খুশি তাই তো করে বেড়াচ্ছিল।

যা খুশি তাই করছিলেন মাধবী দেবী? প্রশ্নটা করে তাকাল সুদর্শন অমলেন্দুর মুখের দিকে।

নয়তো কি! সেই কোন্ সকালে বের হয়ে যেত, তারপর রাত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে কোনদিনই তো বাড়িতে ফিরত না।

থিয়েটার করত তো—হয়তো থিয়েটারের রিহার্সালে আটকা পড়ত।

হ্যাঁ, রিহার্সালই বটে। যাক গে, ওসব কথায় আর কাজ কি! কতদিন বলেছি, মাধু এত রাত করে ফিরিস না, বয়েসের মেয়েছেলে তুই, কখন একটা বিপদ-আপদ ঘটাবি। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় অমলেন্দু, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

তারপর কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বলে, কি যে হল—

সুদর্শন দেখতে পায়, অমলেন্দুর চোখের কোল দুটো যেন ছলছল করছে।

অমলেন্দুবাবু!

বলুন স্যার?

আপনার বোনের হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

সন্দেহ!

হ্যাঁ। মানে, পল্লীর কাউকে বাইরের কাউকে?

না, না, পল্লীর কেউ তা করতে যাবে কেন? কত ছোট থেকে ওকে সবাই দেখে এসেছে—

কিন্তু আমি খবর পেয়েছি—

কি খবর পেয়েছেন?

অনেকেরই ওর ওপরে দৃষ্টি ছিল। এমন কি বিয়েও করতে চেয়েছিল মাধবীকে কেউ কেউ। প্রত্যাখ্যানের সেই আক্রোশে হয়ত—

এসব কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?

শুনেছি। বিশেষ করে ওই হীরু সাহা—

মনে হচ্ছে, বড়বাবুই আপনাকে হয়ত ওই সব বলেছে!

তিনি তো বলেছেনই, আপনাদের পল্লীরই আরও দু-একজনের মুখেও শুনেছি।

অমলেন্দুকে যেন সহসা কেমন একটু বিব্রত বোধ হল। একটু চুপ করে থেকে বললে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু তাই বলে সেই আক্রোশে—না না—

তাহলে আপনার কারও ওপর সন্দেহ হয় না?

না।

আরও কিছুক্ষণ এটা-ওটা কথাবার্তার পর অমলেন্দুকে ছেড়ে দিল সুদর্শন।

নাঃ, সমস্ত ব্যাপারটা যেন ক্রমশঃ বেশ জটিল হয়ে উঠছে!

সুদর্শন যেন কোন কূল-কিনারাই দেখতে পাচ্ছে না।

আরও দশ-বারোটা দিন কেটে গেল ঐ ঘটনার পরে।

মাধবীর আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দশের পল্লী ও তার আশপাশে যে কৌতূহলের চাঞ্চল্য জেগেছিল, ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সেটা যেন কেমন থিতিয়ে আসে।

পল্লীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার পূর্বের মতই চলতে শুরু করল, কিন্তু সুদর্শন মল্লিকের মনে যেন শান্তি নাই।

মাধবীর মৃত্যুটা যেন তাকে রীতিমত বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

নানা জনকে সন্দেহ করেছে, নানা দিক দিয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোথায়ও কিছু যেন দানা বেঁধে ওঠেনি। অথচ তার দৃঢ় বিশ্বাস মাধবীর হত্যাকারী বাইরের কেউই নয়—ঐ পল্লীরই কেউ। কিন্তু কে?

ঠিক এমনি সময় একদিন বিকেলের দিকে একটা কালো রঙের ফিয়াট গাড়ি থানার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি চালাচ্ছিল লম্বা রোগা এক শ্বেতশুভ্র দাড়ি ও মাথায় পাগড়ি পাঞ্জাবী ড্রাইভার।

গাড়িটা থানার সামনে এসে দাঁড়াবার পর ড্রাইভার হীরা সিং গাড়ির দরজা খুলে দিল।

পরনে পায়জামা ও গরমের পাঞ্জাবি ও তার উপরে দামী একটা শাল জড়ানো, চোখে মোটা কালো সেলুলয়েডের চশমা, মুখে চুরুট, প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামল।

থানার প্রহরাধীন সেপাইকে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করে, ও-সি সাহেব আছেন?

জী হাঁ। যাইয়ে, না অফিস-কামরামেই সাব বৈঠা হ্যায়।

আগন্তুক এগিয়ে গেল অফিস-কামরার দিকে। দরজা খোলাই ছিল।

আগন্তুকের খোলা দরজাপথে নজরে পড়ল, ও-সি সুদর্শন মল্লিক গভীর মনোযোগের সঙ্গে সামনে টেবিলের ওপরে একটা মোটা ফাইল নিয়ে কি সব দেখছে।

আগন্তুক ভিতরে পা দিল, সুদর্শন!

চমকে মুখ তুলল সুদর্শন মল্লিক। তারপরই আগন্তুকের দিকে তাকিয়েই সোল্লাসে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, দাদা, আপনি! আসুন আসুন, বসুন—বসুন এই চেয়ারটায়।

সুদর্শন নিজের চেয়ারটাতেই আগন্তুককে বসবার জন্য অনুরোধ জানায়।

পাগল নাকি! ওটা হচ্ছে ও-সি'র চেয়ার। আমি এই যে বসছি।

আগন্তুক বসল।

সুদর্শন যে কি করবে ভেবে পায় না। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, উঃ সত্যি দাদা, আমি ভাবতেই পারছি না আপনি আমার এখানে আসবেন! দাদা, কি খাবেন বলুন? চা, না কফি?

কফি-চা করবেটা কে? আগন্তুক মৃদু হেসে বলে, এখনো তো বিয়েই করলে না—

একটা ভাল কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড পেয়েছি, জানেন দাদা!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, শ্রীমান গোবর্ধন। বলতে বলতে হাসে সুদর্শন।

নামটি তো বেশ। তা পেলে কোথায় আজকালকার এই ভৃত্যসঙ্কটের দিনে?

পেয়ে গিয়েছি গুরুকৃপায়।

বল কি? গুরুও একটা পাকড়াও করেছ নাকি ইতিমধ্যেই?

গুরু লাভ তো আমার বহু পূর্বেই হয়ে গিয়েছে দাদা!

তাই বুঝি? তা সে মহাশয় ব্যক্তিটি কে যে তোমার মত ঘোর নাস্তিক ও অবিশ্বাসীকে কৃপা করল?

কিরীটী রায়।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ দাদা, আপনি। মনে মনে একলব্যের মত সেই কিশোরকাল থেকেই গুরুপদে বরণ করেছিলাম আপনাকে।

কিরীটী মৃদু হাস্যে বলে, কিন্তু কেন? হঠাৎ ও দুর্মতি হল কেন?

জানেন দাদা, প্রথমে ছিলেন হিরো—হিরো-ওয়ারশিপ, তারপর হলেন গুরু, পথ-প্রদর্শক—বসুন দাদা, গোবর্ধনকে চায়ের কথা বলে আসি।

সুদর্শন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ সতেরো ॥

বছর সাতেক আগে এক ট্রেনের কামরায় কিরীটীর সঙ্গে সুদর্শনের আকস্মিক ভাবে প্রথম আলাপ হয়।

কিরীটী ও কৃষ্ণা মুসৌরী যাচ্ছিল ট্রেনে।

সেই ট্রেনেই যাত্রী ছিল সুদর্শন। সে তখন সবে বি-এস-সি পাস করে যা হোক কিছু একটা চাকরির ধান্দায় ঘুরছে।

কাগজে বহুবার কিরীটীর ফটো ইতিপূর্বেই দেখেছিল সুদর্শন এবং তাহার রহস্য উদ্ধারের অনেক অত্যাশ্চর্য কীর্তি-কাহিনী পড়ে পড়ে তার এক অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিল।

একটা বড় জংশন স্টেশনে গাড়ি তখন থেমেছে। সবে ভোর হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ফার্স্ট ক্লাস কামরার জানলার ধারে উপবিষ্ট কিরীটীকে দেখতে পায় সুদর্শন।

চমকে ওঠে সুদর্শন। কি আশ্চর্য, কিরীটী রায়!

গাড়ী চলতেই সুদর্শন লাফিয়ে সেই ফার্স্ট ক্লাস কামরাতে উঠে পড়ে। তারপর বলে, আমার কিন্তু স্যার ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট নয়—থার্ড ক্লাসের—

তবে এ গাড়িতে উঠলে কেন? কিরীটী শুধিয়েছিল।

আপনাকে এই জায়গায় দেখে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার লোভটা সামলাতে পারলাম না। তাতে যদি ফাইন দিতে হয় তো দেব।

তুমি আমাকে চেনো?

না চিনলে উঠেছি?

সুদর্শনের গন্তব্যস্থল ছিল হরিদ্বার—তার পিসেমশাইয়ের ওখানে। কিন্তু সে-যাত্রায় সে কিরীটীর সঙ্গে আলাপ হবার পর বেমালুম হরিদ্বারের কথা ভুলে গিয়ে সোজা তাদের সঙ্গে মুসৌরী চলে গিয়েছিল। তারপরই ঘনিষ্ঠতা।

কিরীটীই তার পরিচিত পুলিস-কমিশনারকে ধরে পরে সুদর্শনের চাকরি করে দিয়েছিল।

একটু পরে সুদর্শনের পিছনে পিছনে চা নিয়ে এল গোবর্ধন ট্রেতে করে।

চা পান করতে করতে সুদর্শন একসময় বলে, ভগবান বোধ হয় আপনাকে আজ হঠাৎ এভাবে আমার মুশকিল-আসানের জন্যেই পাঠিয়েছেন দাদা।

তোমার আবার মুশকিলটা কি হল সুদর্শন ! কিরীটী মৃদু হেসে শুধায়।,

বিশ্রী একটা হত্যা-মামলা—

হত্যা-মামলা ?

হ্যাঁ, দাদা। কদিন ধরে যত ভাবছি ততই যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, দাদা। মনে মনে বোধ হয় তাই আপনাকেই খুঁজছিলাম—ডাকছিলাম—

তোমার রহস্যের কথা শুনব, তার আগে আমার কিছু সংবাদ চাই।

কিসের সংবাদ দাদা ?

জান তো, তোমার এই থানা এলাকাতেই অল্প দূরে রেলওয়ে ইয়ার্ডটা আছে—মানে হাওড়ার রেলওয়ে ইয়ার্ড—

হ্যাঁ, জানি তো—আমারই এলাকা।

গত কয়েক বছর ধরে ওয়াগন থেকে হাজার হাজার টাকার মাল চুরি যাচ্ছে। বিশেষ করে ধুতি-শাড়ীর পেটি, কেরোসিন, সরষের তেলের ও ঘিয়ের টিন আর দামী দামী ওষুধপত্রের বড় বড় প্যাকিং। অথচ রেল-পুলিস আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যাপারটার কোন কিনারা করতে পারেনি—

জানি, সব জানি। এখানে পোষ্টিংয়ের সময় বড়কর্তা আমায় সব বলেছিলেন, যদিও আমি কিন্তু দাদা চেষ্টা করে আজ পর্যন্ত কিছু ধরতে পারিনি।

সেই ব্যাপারটারই একটা হদিস খুঁজে বের করবার ভার সেনট্রাল ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে আমার কাঁধে গত মাসে চাপানো হয়েছে।

সত্যি !

হ্যাঁ। তাই এই তল্লাটের একটা খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানলাম, এই থানায় তুমি কিছুদিন হল এসেছ ইনচার্জ হয়ে। ভাবলাম তোমার সঙ্গেই তাহলে সর্বাগ্রে একবার দেখা করা প্রয়োজন।

তাই এসেছেন ?

তাই।

ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে রীতিমত রহস্যজনক দাদা, কারণ আমার আগে চারজন থানা অফিসারকে এক বছর দেড় বছরের মধ্যেই বদলি করা হয়েছে তাদের অপটুতার জন্যে। যদিও আমার ধারণা—

কি ?

আমার পূর্বতন অফিসারদের ওই ব্যাপারে কিছুটা ইচ্ছাকৃত অবহেলা ছিল

কেমন করে বুঝলে ?

অবিশ্যি তারা হয়ত প্রাণের ভয়েই চুপচাপ থেকেছে বা এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা—

প্রাণের ভয় ছিল কিনা জানি না, তবে একটা সংবাদ ওই চারজন অফিসার সম্পর্কেই আমি যোগাড় করেছি ইতিমধ্যে।

কি সংবাদ পেয়েছেন ?

দুজন তাদের মধ্যে কলকাতার বাইরে জমিজমা কিনেছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে খরচপাতি করে ভাল ঘরে, আর একজন জমি কিনেছে ও একজন বাড়ি করছে—

বলেন কি দাদা ! তার মানে—

তার মানে ঠিক যা স্বাভাবিক তাই। তাদের পরোক্ষ প্রশ্রয় ছিল ওই ব্যাপারে। হয়ত প্রাণের ভয়টাও ছিল, একটু আগেই তুমি যা বলছিলে—

॥ আঠারো ॥

সুদর্শন অতঃপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর বলে, জানি না দাদা তারা কতটুকু জানতে পেরেছিল। তবে আমি এই চার মাসে নির্ভরযোগ্য তেমন কিছুই জানতে পারিনি। অবিশ্যি না জানতে পারলেও একটা কথা আমার মনে হয়—

কি ?

কাছেই একটা জায়গা আছে, যাকে এ তল্লাটের লোকেরা দশ নম্বর পল্লী বলে থাকে—

আমিও জেনেছি সেটা।

ঐ পল্লীতে বহু লোকের বাস। অনেকদিন আগে থাকতে ঐ অঞ্চলে লোকের বসবাস ছিল, তারপর বহু-ঘর রিফিউজি এসে আশপাশের পড়ো জমি জবরদস্তি দখল করে ঘরবাড়ি তুলে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। ফলে একটা মিশ্র অথচ যৌথ বিরাট অঞ্চল গড়ে ওঠে ক্রমশঃ গত পনেরো-কুড়ি বছর ধরে। এবং সকলে মিলে নাম দিয়েছে তার দশ নম্বর পল্লী।

কেন, দশ নম্বর পল্লী নাম হল কেন ?

এ তল্লাটে আশেপাশে ওই ধরনের ছোট ছোট আরও ন'টি পল্লী আছে। অবিশ্যি ভেতরে গেলে আপনার মনে হবে বিরাট একটা কলোনী যেন। বেশ কিছু পাকা বাড়ি, ইলেকট্রিক তো আছেই—রাস্তাঘাটও চলাচলের পক্ষে ভাল করা হয়েছে—

আর পল্লীবাসীরা ?

শিক্ষিত অশিক্ষিত নানা শ্রেণীর মানুষ আছে। অফিসের কেরানী থেকে শুরু করে প্রফেসার, স্কুলমাস্টার, মেকানিক, মোটর-ড্রাইভার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, বহু ভদ্র গৃহস্থ পরিবার আছে। এবং আছে সামনের অন্নপূর্ণা জুট মিলের বহু কর্মী। আমার মনে হয়, সামনের ইয়ার্ডের ওয়াগন-ব্রেকের ব্যাপারে যারা জড়িয়ে আছে, তাদের বেশ কিছু ওই দশ নম্বর পল্লীরই বাসিন্দা।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সুদর্শন, তোমার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে।

ও-কথাটা ভাববার অবিশ্যি আমার আরও একটা কারণ আছে দাদা।

কি ?

নিষিদ্ধ অনেক ব্যাপার ওই পল্লীতে চলে। যেমন চোরা কারবার, মদ চোলাই—

মিল ওয়ার্কাররা থাকলে তা তো হবেই।

আরও আছে, সুদর্শন বলে, গত তিন বছরে পাঁচটা খুন হয়েছে এই তল্লাটে।

তাও জানি।

এবং তারা সবই পুরুষ। গত ১৯শে শনিবার শেষ খুন হয়েছে—

তাও জানি—একটি মেয়ে—

হ্যাঁ। একটি মেয়ে তাও আপনি জানেন দেখছি! তা ওই খুনের ব্যাপারটাই আপনাকে আমি বলব ভাবছিলাম। ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই একটা মিস্ট্রি—ধোঁয়াটে—

মেয়েটির বয়স কত ? চব্বিশ-পঁচিশ ছিল না ?

হ্যাঁ। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এক অন্ধ স্কুল-মাস্টারের মেয়ে। আই এ পাস করে শর্টহ্যাণ্ড শিখে একটা অফিসে চাকরি করছিল, আর সেই সঙ্গে—মেয়েটির চমৎকার অভিনয়-প্রতিভা ছিল, অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করেও বেশ উপার্জন করত—

আর কিছু জানতে পারনি মেয়েটির সম্পর্কে ?

না।

স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল ?

বোধ হয় খুব পরিষ্কার ছিল না।

প্রেমঘটিত ব্যাপার ?

তাও তেমন শুনিনি, তবে—

কি ?

ওর প্রতি সকলেরই নজর ছিল।

স্বাভাবিক। মেয়েটি বোধ হয় দেখতে সুন্দর ছিল!

বলতে পারেন সত্যিকারেরই সুন্দরী।

অর্থাৎ সুন্দরী, যুবতী—

হ্যাঁ।

আলাপ হয়েছিল ?

হয়েছিল। একটু যেন ফ্লার্টারিং টাইপের ছিল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা আপনাকে বলি দাদা, সব শুনলে হয়ত আপনি মোটামুটি একটা কিছু আন্দাজ করতে পারবেন মেয়েটি সম্পর্কে।

ইতিমধ্যে শীতের বেলা ঝিমিয়ে এসেছিল। বিষণ্ণ আলোয় চারদিক ম্লান হয়ে উঠেছিল।

কিরীটী বললে, তোমার কাহিনী শুরু করবার আগে আর এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা কর সুদর্শন।

নিশ্চয়ই দাদা, এখুনি ব্যবস্থা করছি।

সুদর্শন উঠে গেল।

খোলা দরজা-পথে বাইরের ম্লান বিষণ্ণ আলোর দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী ধূমপান করতে থাকে।

বেশ শীত-শীত লাগে।

সুদর্শনের কাহিনী শেষ হতে ও সকলের জবানবন্দি পড়তে পড়তে রাত প্রায় ন'টা হয়ে গেল।

কিরীটী মধ্যে মধ্যে দু-একটা প্রশ্ন করেছে—যেমন, ওই পল্লীর যে সব লোকেদের তুমি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছ সুদর্শন, তারা ছাড়াও তো অনেকে আছে ?

তা আছে।

পল্লীর দু-চারজন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ব্যক্তিকেও ডেকে তোমার জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত ছিল।

তা হয়ত ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় দাদা—

বুঝতে পারছি সুদর্শন— ওই হীরু সাহা, খগেন পাঠক, কল্যাণ বসু, হরগোবিন্দ ঘোষ, নরহরি সরকার, অবিনাশ ও অমলেন্দু ব্যানার্জি—ওরাই তোমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত ক[illegible]। তুমি তোমার অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা ওদের ওপরেই ফেলেছ, তাই নয় কি !

কতকট[illegible]ই—

॥ উনিশ ॥

কিরীটী মৃদু হাসল, তারপর হাতের চুরোটে একটা টান দিয়ে বললে, সুদর্শন!

বলুন দাদা?

কথামালার একচক্ষু হরিণের গল্পটা তোমার মনে আছে? সেই যে—যে দিকটা সম্পর্কে সে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিল, অবশেষে সেই দিক থেকেই এল মৃত্যুর আঘাত?

আপনি কি বলতে চান দাদা!

এসব ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করেছ কি পদস্খলন অনিবার্য।

বুঝতে পারলাম না ঠিক দাদা আপনার কথা!

বলছি শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর কথা—

সহসা সুদর্শনের চোখ-মুখ যেন লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, মেয়েটি সত্যিই ভাল, আর মাধবীর আকস্মিক মৃত্যুতে এমন অসহায় হয়ে পড়েছে—

কিরীটী সুদর্শনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে।

ওকে দেখলে আপনারও সিমপ্যাথি হবে—

তা হয়ত হবে—যখন তোমার ইতিপূর্বেই হয়েছে। তবে কি জান—

কি?

ক্ষেত্রবিশেষে সিমপ্যাথি ব্যাপারটা যেমন প্রশংসনীয় ও একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষেই আবার হয় মারাত্মক। যাক, আজ আমি এবার উঠব। রাত অনেক হল।

কিন্তু দাদা, আপনি তো কিছুই বললেন না?

বলব, বলব।

কখন?

দুটো দিন ব্যাপারটা আমায় একটু ধীরে-সুস্থে ভাবতে দাও।

কিন্তু—

কিরীটী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বললে, আজ বুধবার, সামনের শনিবার এই সময় আসব।

আসবেন আবার?

হ্যাঁ, ইয়ার্ডটা রাতের অন্ধকারে একবার ঘুরে দেখা প্রয়োজন। রায়

কিরীটীকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সুদর্শনও উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে।

গাড়িতে ওঠবার পর হীরা সিং গাড়িতে যখন স্টার্ট দিয়েছে, কিরীটী বললে, সুদর্শন, ছোটবেলায় যে যোগ অঙ্ক শিখেছিলে, দুয়ে দুয়ে যোগ করে চার হয়—সে অঙ্কটা ভুলে যেও না !

সুদর্শন প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে।

গাড়ি চলতে শুরু করে। কিরীটীর শেষ কথাটা সুদর্শনের কানে আসে দুয়ে দুয়ে যোগফল চারই হয়—পাঁচও হয় না, তিনও হয় না। কম-বেশী হবার উপায় নেই।

গাড়িটা চোখের সামনে থেকে বের হয়ে গেল।

সুদর্শন ধীর পদক্ষেপে থানায় তার অফিস-ঘরে ফিরে আসে। কিরীটীর শেষের কথাগুলো তখনও তার মনের মধ্যে আনাগোনা করছে।

কিরীটী যে ইঙ্গিতটা দিয়ে গেল, তার অর্থ কি ? তবে কি সে আগাগোড়াই ভুল পথে চলেছে ? হাতের সামনে সব থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ?

হয়ত তাই। দুটো ব্যাপারের সঙ্গে হয়ত সত্যিই একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সেই দিক থেকে অগ্রসর হতে পারলেই মাধবীর হত্যা-রহস্যটা হয়ত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নাঃ, আর একবার দশ নম্বর পল্লীটা তাকে ভাল করে ঘুরে দেখতেই হবে।

সত্যিই হয়ত সে বিশেষ কয়েকটা মানুষ সম্পর্কেই কেবল চিন্তা করছে বলেই আসল কালপ্রিটের কোন সন্ধানই এখনো পর্যন্ত পায়নি।

মাধবীর হত্যা-রহস্যের সঙ্গে হয়ত ওই লোকগুলোর কোন সম্পর্কই সত্যিই নেই।

নতুন করে আবার সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাববার চেষ্টা করে সুদর্শন।

শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে যায় সুদর্শনের। এবং শুতে যখন যায় তখন সে ভাবতেও পারেনি, পরের দিন প্রত্যুষে জটিলতর আর একটি সংবাদ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙে সুদর্শনের গোবর্ধনের ডাকাডাকিতে।

বাবু, বাবু—

কি রে ? ভোরবেলা চেঁচামেচি শুরু করেছিস কেন ?

আজ্ঞে সেপাই রামলোচন আপনাকে ডাকছে

কেন, কি হয়েছে ?

॥ কুড়ি ॥

গরম আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে, চপ্পলের মধ্যে কোনমতে পা দুটো গলিয়ে ঘুম-জড়ানো চোখে শোবার ঘর থেকে বের হয়ে এল সুদর্শন।

সামনেই দাঁড়িয়ে রামলোচন সিকদার। ছোকরা কনস্টেবল। বছর দুই চাকরিতে ঢুকেছে—যেমন চালাক, তেমনি চটপটে।

কি রামলোচন, কি খবর?

হুজুর, এ তল্লাটে আবার একটা খুন হয়েছে।

খুন! হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খায় সুদর্শন। ঘুমের শেষ রেশটুকু যেন সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা থেকে মুছে যায়। বললে, কোথায়? কে খুন হল আবার? পল্লীরই কেউ নাকি?

আজ্ঞে, লোকটা একটা পাঞ্জাবী। দশ পল্লীর কেউ নয়।

পাঞ্জাবী?

হ্যাঁ। লোকটাকে একদিন আমি দিন-পনের আগে ওই যে—যে মেয়েটির বড় ভাইয়ের সঙ্গে বড় রাস্তায় যে কানন রেস্টুরেণ্টটা আছে, সেই রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরোতে দেখেছিলাম।

ডেড বডি কোথায়?

ওই মাঠটার মধ্যে।

সুদর্শন আর দেরি করে না, চটপট জামা-কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে জমাদার রামশরণ সিং, জনা-চারেক কনস্টেবল ও সঙ্গে রামলোচনকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল।

মৃতদেহটা সেই মাঠের বটগাছটারই সামনে পড়েছিল।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহটা। পরনে দামী ক্রিম কালারের ট্রপিক্যাল স্যুট, পায়ে দামী গ্রেসকিডের স্যু, মাথায় পাগড়ি, মুখে দাড়ি। পৃষ্ঠদেশের ঠিক মাঝামাঝি একটা ক্ষতস্থান। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল মনে হয় ক্ষতস্থান থেকে।

পিঠের জামার যে অংশটায় গুলি বিঁধেছিল তার চারপাশ রক্তে ভেজা। লাল হয়ে আছে। মৃতদেহের হাত দুটো ছড়ানো।

দশ নম্বর পল্লীর লোকেরা বোধ হয় ব্যাপারটা জানতেও পারেনি তখনও, কারণ আশপাশে কেউ ছিল না। কাউকেই সেখানে দেখতে পেল না সুদর্শন। আশপাশের ঘাস তখনও শিশিরসিক্ত।

সুদর্শনের বুঝতে কষ্ট হয় না লোকটা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে, এবং পেছন দিক থেকেই তাকে কেউ গুলি করেছিল।

হয়ত এমনও হতে পারে, সুদর্শনের মনে হয়, হত্যাকারী লোকটাকে অনুসরণ করেছে পিছন থেকে, তারপর সুযোগ বুঝে গুলি করেছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, লোকটা এই জায়গায় কেন এসেছিল?

আরও একটা কথা, হত্যাকারী কি জানত যে লোকটা এখানে আসবে কিংবা তাকে হত্যা করার জন্যই ফাঁদ পেতে এই নির্জন জায়গায় ডেকে আনা হয়েছিল যাতে করে হত্যাকারীর সুবিধা হয় হত্যা করতে এবং গুলির শব্দটাও যাতে কেউ শুনতে না পায়!

নানা কথা ভাবতে ভাবতে নিচু হয়ে বসে মৃতদেহটা উল্টে দিল সুদর্শন।

বেশ বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া গঠন লোকটার, যেমন সাধারণতঃ পাঞ্জাবীরা হয়। বাঁ হাতে একটা লোহার বালা, ডান হাতে একটা দামী সোনার রিস্টওয়াচ।

পকেট হাতড়ে একটা দামী সেন্টের গন্ধসিক্ত সিল্কের রুমাল, কিছু চিউয়িংগাম ও একটা দামী চামড়ার পার্স পাওয়া গেল।

পার্সের মধ্যে লোকটার একটা ফটো ও নামধাম পাওয়া গেল।

গুলজার সিং। ১৪নং ক্যামাক স্ট্রীট। গগনচারী ম্যানসন, থার্ড ফ্লোর, রুম নাম্বার ৫৬।

আর পাওয়া গেল পার্সের মধ্যে খান-দুই একশো টাকার ও দশ পাঁচ ও এক টাকার খুচরো নোটে মোট দুইশত আটান্ন টাকা। এ ছাড়াও গোটা দুই পেট্রোলের ভাউচার ও ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের একটা টেলারিং শপের ক্যাশমেমো, দুশো সাতাত্তর টাকা এবং একটা চাবির রিং কোটের পকেটে।

মৃতদেহের ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ ছিল। রাইগার মর্টিস সেট-ইন করায় মুষ্টিটা শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আঙুলে বড় বড় নখ। নখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটা বস্তু সুদর্শনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাদা রঙের খানিকটা পশম।

আঙুলের নখ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পশমটা একটা কাগজের মোড়ক করে সুদর্শন তার পকেটে রেখে দিল।

আরও একটি বস্তু প্যান্টের হিপ পকেটে পাওয়া গেল—ছোট একটি আমেরিকান ছয় চেম্বারের অটোমেটিক পিস্তল। পিস্তলের ছয়টি চেম্বারই গুলি-ভর্তি।

গুলজার সিংয়ের চেহারা ও প্যান্টের হিপ্ পকেটে লোডেড পিস্তল দেখে মনে হয় সুদর্শনের, লোকটা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পায়নি হয়ত।

আততায়ী পেছন থেকে তাকে গুলি করেছে এবং খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, লোকটা আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পায়নি।

ক্ষতস্থানের চারপাশে জামার ওপরে কিছু কার্বন ডিপোজিট দেখা যায়।

পূর্বের সন্দেহটা তার মনে আরও দৃঢ় হয়, নিশ্চয় আততায়ী তার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাকে ফলো করে পেছনে-পেছনেই আসছিল—প্রথম সুযোগেই পেছন দিক থেকে গুলি চালিয়েছে।

আশেপাশে কোন রক্তের চিহ্ন চোখে পড়ে না সুদর্শনের এবং কোন স্ট্রাগলের চিহ্নও কোথাও নজরে পড়ে না তার।

॥ একুশ ॥

মৃতদেহটা দুজন সেপাইয়ের প্রহরায় রেখে সুদর্শন ফিরে এল থানায়।

মৃতদেহটা মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং হেড-কোয়ার্টারে হোমিসাইডাল স্কোয়াডকে একটা সংবাদ পাঠাতে হবে।

সব ব্যবস্থা করতে করতে ঘণ্টা দুই লেগে গেল সুদর্শনের।

ইতিমধ্যে দশের পল্লীর বাসিন্দাদের মধ্যে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই তল্লাটে আবার একজন খুন হয়েছে! মাঠের মধ্যে ক্রমশঃ ভিড় জমে যায়।

রামশরণ সিং অনেককেই প্রশ্ন করে, তাদের মধ্যে কেউ গুলজার সিংকে চিনতে পারছে কিনা, আগে কখনও কেউ তাকে দেখেছে কিনা ঐ তল্লাটে!

ভিড়ের মধ্যে হীরু সাহা, খগেন পাঠক, অমলেন্দু ও হরগোবিন্দ ও ছিল।

তাদেরও রামশরণ ওই একই প্রশ্ন করে। কিন্তু তারা মাথা নাড়ে সকলেই—কেউ তারা ইতিপূর্বে লোকটাকে দেখেওনি, চেনেও না।

কেবল একজন বললে, ওকে বার-দুই দেখেছে কানন রেস্টুরেণ্টে অবিনাশের সঙ্গে। তবে সেও চেনে না লোকটাকে।

যে গুলজার সিংকে দেখেছে বললে, সকলেই তার মুখের দিকে তাকায়।

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক। পরিচয় জানা গেল স্কুল-ফাইন্যাল পাস করে আর পড়াশুনা করেনি। খুরোট রোডে একটা ছাপাখানায় কাজ করে, কম্পোজিটার। বেশ নাদুসনুদুস নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের চেহারা। নাম জয়ন্ত বোস।

ইতিমধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল।

মৃতদেহটা স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে মর্গে রওনা করে দিয়ে জমাদার রামশরণ সিং একজন সেপাইকে অকুস্থলে প্রহরায় রেখে থানায় ফিরে এল।

সুদর্শন তখন ফোনে কিরীটীর সঙ্গে কথা বলছিল।

হ্যাঁ দাদা, আবার একটা খুন হয়েছে কাল রাত্রে।

কিরীটী ফোনে শুধায়, তোমার ঐ দশ নম্বর পল্লীরই কেউ নাকি?

না, পল্লীর কেউ নয়।…হ্যাঁ, আইডেনটি তার পকেটেই পাওয়া গেছে। লোকটা পাঞ্জাবী—নাম গুলজার সিং।

তাহলে গুলজার সিংকে নিয়ে খুনের সংখ্যা হল সাত! কিরীটী বললে।

তাই। তবে ওই পল্লীর একজন মাধবী ছাড়া আর সব বাইরের লোক।

তারপর মোটামুটি মৃতদেহ সম্পর্কে ও যা বুঝতে পেরেছিল সব বলে গেল কিরীটীকে ফোনেই।

তোমার কি মনে হচ্ছে সুদর্শন?

কিরীটী প্রশ্ন করে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে সুদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ শুনে।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে দাদা, সব হত্যা-ব্যাপারগুলোই একই সূত্রে গাঁথা। আপনার কি মনে হয়? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

তাই তো মনে হচ্ছে আপাততঃ। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু একজন ছাড়া কেউ পল্লীর বাসিন্দা নয়।

না হোক, তবু একটা কথা ভুলো না ভায়া, সব ক'টি হত্যাই ওই পল্লীর আশেপাশে সংঘটিত হয়েছে—যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে একজন ছাড়া সবাই বাইরের লোক হলেও ঐ জায়গায় সবারই গতিবিধি হয়ত ছিল—which has got an importance!

সুদর্শন কোন জবাব দেয় না।

কিরীটী আরও বলে,' তাছাড়া ঐ হত্যাকাণ্ডগুলোর আরও একটা দিক আছে—তোমার মনে হয়েছে কিনা জানি না!

কি বলুন তো দাদা?

যদি ধরে নিই, প্রত্যেকটি হত্যার সঙ্গেই তোমার ওই দশ নম্বর পল্লীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং ওই পল্লীরই এক বা একাধিক ব্যক্তির বিশেষ কোন স্বার্থের সঙ্গে ওই হত্যাকাণ্ডগুলো জড়িয়ে—তাহলে—

আপনি কি বলতে চান দাদা?

সুদর্শনকে থামিয়ে দিয়ে কিরীটী বলে, বলতে চাই তা যদি হয় তো ওই পল্লীর মধ্যেই কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই হত্যার বীজ লুকিয়ে আছে।

কিন্তু মাধবীর হত্যার ব্যাপারটা—

তুমি কিন্তু প্রথম থেকেই একটা ভুল করছ সুদর্শন !

ভুল ?

হ্যাঁ। মাধবীর হত্যার ব্যাপারটাকে প্রথম থেকেই আলাদা করে ভাববার বা দেখবার চেষ্টা করছ। প্রেম বা প্রতিহিংসা হয়ত কিছু তার হত্যার ব্যাপারে থাকতে পারে এবং থাকাটা অসম্ভবও নয়, তাহলেও আমার মনে হচ্ছে—কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটা তা নয়, মূলে হয়ত সেই একই কার্যকরণ যা গত তিন বছর ধরে এতগুলো লোকের প্রাণহানি ঘটিয়েছে !

একটু থেমে তারপর কিরীটী বলে, ভাল কথা, সাবিত্রীর সঙ্গে আলাপ কেমন হল ?

কেন বলুন তো ?

Don't neglect her ! বলে কিরীটী ওপাশে ফোনটা নামিয়ে রাখল মৃদু হাসির সঙ্গে।

॥ বাইশ ॥

কিরীটীর শেষ কথাগুলো সুদর্শনকে যেন নতুন করে ভাবিয়ে তোলে।

সে ফোনটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরায়। মনে মনে ভাবে, তবে কি সে সত্যি-সত্যিই আগাগোড়া একটা ভুল পথ ধরে চলেছে ?

কিন্তু তাহলেও মনে হচ্ছে, মাধবী—ওই ওয়াগন ভেঙে চুরি যারা করে এবং দীর্ঘদিন ধরে এ তল্লাটে যারা চোরা কারবার চালিয়ে এসেছে, তাদেরই দলের একজন—এ সম্ভাবনাটায় কেন যেন তার মন সায় দেয় না। ঐ দিক দিয়ে কথাটা যেন সে কিছুতেই ভাবতে পারে না।

মাধবী কিছুটা চঞ্চল-প্রকৃতির ও showy টাইপের মেয়ে ছিল নিঃসন্দেহে এবং অফিসে চাকরি করার বাইরে তার অভিনেত্রী জীবনের মধ্যে হয়ত কিছুটা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাও ছিল।

কিন্তু তাই বলে অমন একটি শিক্ষিত মেয়ে চোরাকারবারীদের দলে যে ভিড়ে যেতে পারে, অতটা নিচে যে নামতে পারে-- ভাবতে মনটা কেন যেন তার কিছুতেই সায় দেয় না।

তবে মনুষ্যচরিত্র নাকি বিচিত্র এবং বিশেষ করে নারীচরিত্র।

তাছাড়া আজও কিরীটীর কথার ভাবে বোঝা গেল সাবিত্রী-সম্পর্কে সে একটু উৎসুক, কিন্তু কেন? তবে কি সাবিত্রীকেই কিরীটী সন্দেহ করে?

কিরীটীর কথায় আরও একটা ব্যাপার স্পষ্টই মনে হল, এ তল্লাটের সব হত্যা-ব্যাপারগুলোই নাকি একই সূত্রে গাঁথা। সব কিছুর মূলে একই কার্যকারণ। এবং হত্যার বীজ ওই পল্লীর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার মতে।

পল্লীর সকলকে সুদর্শন চেনে না। চেনার বা জানবার সুযোগও তার হয়নি আজ পর্যন্ত। তবে মোটামুটি যাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে বা যারা তার মনের মধ্যে আঁচড় কেটেছে, তারাও যে একেবারে সবাই খাঁটি ও নির্দোষ, তাও যেন মন তার মেনে নিতে চায় না।

হীরু সাহা, খগেন পাঠক, কল্যাণ বসু, হরগোবিন্দ, নরহরি সরকার, অমলেন্দু, অবিনাশ···

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অবিনাশ ও জয়ন্ত বোসের কথা এবং মনে পড়ে জমাদার রামশরণ সিং বলছিল, ওই জয়ন্ত বোসই গুলজার সিংকে নাকি দিন-দুই কানন রেস্টুরেণ্টে অবিনাশের সঙ্গে দেখেছিল।

তাতে করে অন্তত এটা প্রমাণিত হচ্ছে, গুলজার সিংয়ের এ তল্লাটে যাতায়াত ছিল। এ তল্লাটে গুলজার সিং লোকটা একেবারে অপরিচিত নয়।

আরও একটা কথা, পূর্বে মাধবী ছাড়া আরো পাঁচজন যে নিহত হয়েছিল গত তিন বছরে, তারাও পল্লীর কেউ নয়—বাইরেরই লোক।

তাদের মধ্যে দুজন ছিল যা পূর্ববর্তীদের থানার ডাইরির রেকর্ড থেকে জানতে পারা গেছে—দুজনেই বাঙালী, নাম সুধাংশু আর গোবিন্দ—দুজনেই লরী-ড্রাইভার।

আরএকজন পাঞ্জাবী মুসলমান আনোয়ার খাঁ—সেও দূরপাল্লার লরী-ড্রাইভার ছিল।

একজন মাদ্রাজী সেলস্‌ম্যান একটা বিলাতি ওষুধ কোম্পানির, নাম থিরুমল ও একজনের পরিচয় যা সংগৃহীত হয়েছিল সে উত্তরপ্রদেশের লোক—মহারাজ চৌধুরী, লোকটার লরীর ব্যবসা ছিল।

গুলজার সিংয়ের অবিশ্যি পুরো পরিচয়টা এখনও পাওয়া যায়নি, তবে আর যাদের পরিচয় ডাইরির রেকর্ডে আছে, তারা সবাই লরী-ড্রাইভার বা লরীর মালিক।

কথাটা ভাবতে থাকে সুদর্শন।

লোকগুলো কেউ ছিল লরী-ড্রাইভার, কেউ ছিল লরীর মালিক।

অবিশ্যি থানার লিখিত ডাইরী ঐ লোকগুলো সম্পর্কে যদি সত্য বলে মেনে

নেওয়া যায় তাহলে কেউই তাদের মধ্যে চোরাকারবারী বলে মনে হয় না।

হয়ত আসল কারবারী যারা তার নেপথ্যেই থেকে গিয়েছে বরাবর পুলিসের সন্দেহ-দৃষ্টি বাঁচিয়ে—ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আচ্ছা এমন কি হতে পারে, তারা এই দশ নম্বর পল্লীরই কেউ!

তাই যদি হয় তো কে হতে পারে?

॥ তেইশ ॥

চকিতে একটা সম্ভাবনার কথা সুদর্শনের মনের মধ্যে উদয় হয়। হয়ত ওয়াগন ভেঙে যেসব মাল চুরি করা হত, সে-সব কলকাতা শহরে বা-অন্যান্য জায়গায় লরী করে পাচার করা হত এবং এখনও হচ্ছে।

ওয়াগন ভেঙে মাল চুরির ব্যাপারটাও গত তিন-চার বছর ধরে চলেছে—যা থানার পূর্ববর্তী অফিসারদের ডাইরির রেকর্ড থেকেই জানা যায়।

দশ নম্বর পল্লী ও তার পেছনেরখোলা মাঠটার ওপাশেই রেলওয়ে ইয়ার্ড, যেখানে সব মালগাড়ি সান্টিং করা থাকে, অনেক সময় বাইরে থেকে লোডেড হয়ে আসবার পর ও এখান থেকে মাল লোডিংয়ের পরেও।

সব চাইতে বড় কথা, হত্যাগুলোও সব দশ নম্বর পল্লীরই আশেপাশে সংঘটিত হয়েছে।

সব কিছু পর পর চিন্তা করলে স্বভাবতই মনে হয় একের সঙ্গে অন্যের একটা ঘনিষ্ঠ যেন যোগসূত্র কোথাও আছে। আর থাকাটাও কিছু বিচিত্র নয়।

সব গিঁটগুলোই সম্ভবতঃ একটা দড়ির মধ্যেই রয়েছে।

রামশরণ জয়ন্ত বোসকে মাঠ থেকে আসার সময় সঙ্গে করেই এনেছিল, যদি সুদর্শন তাকে কোন প্রশ্ন করতে চায় এই ভেবে। জয়ন্তকে রামশরণ থানার বাইরের ঘরেই বসিয়ে রেখেছিল।

থানার ছোটবাবু সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী সুদর্শনের সামনে এসে দাঁড়াল।—স্যার?

অ্যাঁ! কিছু বলছিলেন মিস্টার চক্রবর্তী?

বলছিলাম স্যার, জয়ন্ত বোসকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন?

কে জয়ন্ত বোস?

ওই দশ নম্বর পল্লীতেই থাকে, একজন কম্পোজিটার। যে রামশরণকে বলেছে, ওই মৃত ব্যক্তি গুলজার সিংকে নাকি দিন-দুই কানন রেস্টুরেণ্টে দেখেছে।

হ্যাঁ, ডাকুন তো লোকটিকে।

জয়ন্ত এসে সুদর্শনের কামরায় ঢুকল।

সুদর্শন মুখ তুলে তাকাল লোকটার দিকে। বেশ নাদুসনুদুস নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের চেহারা। দু-চোখে শশকের ভীত-চকিত দৃষ্টি।

বসুন। আপনার নাম জয়ন্ত বোস? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে স্যার।

দশ নম্বর পল্লীতেই থাকেন?

আজ্ঞে না, খুরোট রোডে থাকি।

এখানকার দশ নম্বর পল্লীতে আপনার যাতায়াত আছে শুনলাম?

হ্যাঁ স্যার, এখানে আমার দু-চারজন জানা লোক থাকে।

হুঁ, তা আপনি কোথায় কাজ করেন?

সুধাকর প্রিন্টিং ওয়ার্কসের আমি একজন কম্পোজিটার স্যার।

গুলজার সিং—মানে ওই মৃত লোকটাকে আপনি দেখেছিলেন কানন রেস্টুরেণ্টে?

হ্যাঁ স্যার, দিন-দুই দেখেছি অবিনাশবাবুর সঙ্গে।

কি করছিল?

আজ্ঞে চা-টা খাচ্ছিল ওরা।

সঙ্গে অবিনাশ ছাড়া আর কেউ ছিল?

আজ্ঞে আর কাউকে দেখিনি। একাই ছিল।

কোন্ সময় ওদের রেস্টুরেণ্টে দেখেছিলেন।

দু'দিনই সন্ধ্যার পর—মানে তখন সাড়ে সাতটা-আটটা হবে।

ওই সময় আপনি রেস্টুরেণ্টে গিয়েছিলেন কেন?

আজ্ঞে প্রেস থেকে ফেরার পথে ঐ সময় রোজই আমি ওখানে এক কাপ চা খেয়ে আসি।

ওখানে বুঝি খুব ভাল চা হয়?

হ্যাঁ স্যার। এলাচদানা-টানা কি সব মিশিয়ে একরকম স্পেশাল চা করে। চমৎকার খেতে।

স্পেশাল চা!

আজ্ঞে স্যার। ওই পথ দিয়ে মিলের সব পাঞ্জাবী লেবাররা যায়, তারা ওখানে চায়ের জন্য ভিড় করে। খুব বিক্রী।

হুঁ। রেস্টুরেণ্টটার মালিক কে?

আজ্ঞে স্যার, গুলাব সিং।

পাঞ্জাবী ?

হ্যাঁ। তবে অনেক দিন—প্রায় জন্ম থেকেই বাংলাদেশে আছে তো—ঠিক আমাদের মতই বাংলা বলতে পারে, পড়তেও পারে।

দশ নম্বর পল্লীর অনেকেই ওখানে চা খেতে যায় বোধ হয় ?

তা ঠিক জানি না স্যার। তবে—

তবে ?

দু-চারজন ছাড়া অন্য কেউ আমার নজরে বড় একটা পড়েনি। তবে আমি তো খানিকটা বে-টাইমে যাই—

আর কাকে কাকে দেখেছেন ?

আজ্ঞে আমাদের হীরু সাহা, অবিনাশ-অমলেন্দু দুই ভাই, আর একদিন দেখেছিলাম সুবোধবাবুকেও।

মানে ওই সুবোধ মিত্র ?

আজ্ঞে স্যার।

ওদের প্রত্যেককেই আপনি চেনেন ?

চিনি।

রেস্টুরেণ্টটা কেমন, পরিষ্কার ?

হ্যাঁ স্যার। রেডিও আছে, রেডিওগ্রাম আছে, লেডিজদের জন্য স্পেশাল বন্দোবস্তও আছে দোতলায়।

দোতলা তো নয় রেস্টুরেণ্টটা !

আজ্ঞে ঠিক তা নয়—তবে ভিতরে কাঠের আর একটা ফ্লোর আছে মাথার ওপরে, তাই বলছিলাম আর কি—

মেয়েছেলেরাও যায় তাহলে বলুন সেখানে ?

নিশ্চয়ই, স্যার, যায় বৈকি। তাদের বসবার জন্য স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে কানন রেস্টুরেণ্টে।

॥ চব্বিশ ॥

সুদর্শন অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করে।

জয়ন্তবাবু !

আজ্ঞে ?

কয়েক দিন আগে এই পল্লীর যে মেয়েটি খুন হয়েছে, তাকে চিনতেন না ?

কে, মাধবীদি তো স্যার ? নিশ্চয়ই। ভাল চাকরি করত, সুন্দর থিয়েটারও করত। একবার দেখেছিলাম মাধবীদির থিয়েটার। কি ফাস্ট ক্লাস যে অ্যাকটিং করত স্যার মাধবীদি ! আহা, আমি তো কেঁদেই ফেলেছিবাম।

তাই বুঝি ?

আজ্ঞে ভারি প্যাথেটিক সিনটা ছিল কিনা।

কোথায় দেখেছিলেন থিয়েটার তার ?

কলকাতার রঙমহল থিয়েটারে। আমাকে হীরু একটা কার্ড দিয়েছিল।

কে দিয়েছিল কার্ড ! সুদর্শন যেন চমকে প্রশ্নটা করে।

আজ্ঞে স্যার, হীরু সাহা। খুব গায়ে জোর, দশ পল্লীর শ্রী।

পল্লীর শ্রী !

আজ্ঞে স্যার, গত বছর সবাই ওকে ওই টাইটেল আর রূপোর মেডেল দিয়েছিল।

সুদর্শন বুঝতে পারে, মানুষটা এবং সরল কিছুটা বোকা টাইপের। নচেৎ থানায় বসে অমন করে থানা-অফিসারের সামনে মন খুলে কথা বলতে পারত না।

জয়ন্তবাবু !

বলুন স্যার ?

আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছেন ?

স্কুল-ফাইনাল পাস করেছিলাম স্যার, কিন্তু মামা আর পড়াল না। বললে, এবার নিজের রাস্তা দেখ। কি আর করি, ঢুকে পড়লাম ছাপাখানায়।

মামা কে ? কি নাম তাঁর ?

আজ্ঞে ওই যে দশ নম্বর পল্লীতেই থাকে—রাধেশ্যাম—

রাধেশ্যাম !

কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্নটা করে সুদর্শন তাকাল জয়ন্তর মুখের দিকে।

হ্যাঁ স্যার। দেখেননি তাঁকে ? ওই যে নরহরি সরকার—দিনরাত মুখে রাধেশ্যাম বুলি—

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় নরহরি সরকারকে সুদর্শনের। বলে, আপনি তাঁরই ভাগ্নে নাকি ?

আজ্ঞে সম্পর্কে তাই, তবে রাধেশ্যাম স্বীকার করে না।

স্বীকার করে না !

না।

কেন ?

গরীব বিধবা বোনের ছেলে। স্কুল-ফাইন্যাল পর্যন্ত পড়িয়েছে, খেতে দিয়েছে তাই যথেষ্ট—

কিন্তু ওঁর তো শুনেছি বেশ টাকা-পয়সা আছে ?

হ্যাঁ স্যার, ঠিক শুনেছেন। অমন ন্যালাখ্যাপার মত থাকলে কি হবে, একটি ঘুঘু।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। আর টাকার কুমীর।

অনেক টাকা বুঝি ?

অনেক।

ওই তো ছোট্ট একটা সোনা-রূপোর দোকান। সেই দোকান থেকে কত আর ইনকাম হয় !

তা জানি না স্যার। রাধেশ্যাম যে কোথা থেকে টাকা আনে তা সে-ই জানে—তবে তার অনেক টাকা। সত্যি কথা বলতে কি, সেই কথাটা জানতে পেরেছি আমি জেনেই সে আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

নরহরির তো শুনেছি বৌ নেই—এক ছেলে, এক মেয়ে !

মামীমা ছিল লক্ষ্মী স্যার। মামী মারা যাবার পরই তো রাধেশ্যাম আমাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে।

তা নরহরির ছেলে কি করে ?

কি আর করবে ! রাধেশ্যামের যাত্রার দলে সখী সাজে। লেখাপড়া তো করল না !

আর মেয়ে ?

রাধা মেয়েটা বড় ভাল স্যার। লেখাপড়াতেও ভাল ছিল খুব, কিন্তু রাধেশ্যাম তাকে পড়াল না। স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে এনে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছে। বলে বিয়ে দেব। বিয়ে দেবে না ছাই দেবে ! বেটা চামার, কেবল টাকাই চেনে। স্যার, অনেক কথা রাধেশ্যাম সম্পর্কে আপনাকে বললাম, ও যেন না জানতে পারে। জানলে আমায় ঠিক একদিন খুন করে ফেলবে।

না না, জানতে পারবে না। আপনার ভয় নেই।

দেখবেন স্যার—লোকটা কিন্তু ডেঞ্জারাস। মুখে কেবলই রাধেশ্যাম বুলি আওড়ালে কি হবে, তলে তলে কেবল শয়তানী মতলব।

আচ্ছা আমি শুনেছিলাম আপনার মামা নাকি মাধবীকে বিয়ে করবার জন্য এক-সময় ক্ষেপে উঠেছিল!

কার কাছে শুনলেন স্যার কথাটা?

শুনেছি। সত্যি নাকি কথাটা?

সত্যি। তেমন খেয়েছিলও মাধবীদির কাছেপটাপট্!

কি খেয়েছিল?

কেন, ছাতার বাড়ি!

তাই নাকি? সুদর্শন হেসে ফেলে। যাঃ, আপনি বাড়িয়ে বলছেন!

হ্যা, স্যার। সত্যি বলছি, গড প্রমিস।

কিন্তু আমি তো শুনেছি, আপনার মামার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল মাধবী দেবীর! যাতায়াত ছিল তার ওই দোকানে!

কার কাছে কথাটা শুনলেন স্যার?

শুনেছি আমি।

না স্যার, যে বলেছে স্রেফ গুল দিয়েছে। এক-আধবার হয়ত গিয়ে থাকবে রাধে-শ্যামের দোকানে মাধবীদি গয়না-টয়না গড়াতে। রাধেশ্যামকে তো জানি, ওই সময়ই হয়ত হাত-টাত ধরবার চেষ্টা করেছিল মাধবীদির, সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ছাতার বাড়ি!

আচ্ছা জয়ন্তবাবু?

বলুন স্যার!

আপনার মামা বন্ধকী কারবারও করেন, তাই না?

রাধেশ্যাম যে কি করে আর কি না করে ভগবানও জানেন না। বললাম তো স্যার, ও একটি বাস্তুঘুঘু। কিন্তু এবারে আমি উঠতে পারি স্যার?

উঠবেন!

হ্যাঁ স্যার, প্রেসে যেতে হবে।

আচ্ছা আপনি আসুন।

জয়ন্ত যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং যাবার আগে আবার বলে, দেখবেন স্যার, রাধেশ্যামের কানে যেন এসব কথা না যায়।

না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জয়ন্তকে সুদর্শন বিদায় দিল।

॥ পঁচিশ ॥

বাইরে জীপের শব্দ শোনা গেল ঐ সময়।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সুদর্শন।

লালবাজার থেকে বোধ হয় হোমিসাইডাল স্কোয়াডের কেউ এল।

সুদর্শনের অনুমান মিথ্যা নয়। হোমিসাইডাল স্কোয়াডের রাজেন বোস ইন্সপেক্টার জীপ থেকে নামলেন।

নমস্কার মিস্টার মল্লিক।

আসুন মিস্টার বোস।

চলুন, একবার স্পটটা ঘুরে আসি তাহলে?

চলুন।

রাজেন বোসের জীপেই উঠে বসে সুদর্শন। জীপে যেতে যেতে দুজনের মধ্যে কথা হয়।

আপনার কি মনে হয় মিস্টার মল্লিক? রাজেন বোস প্রশ্ন করেন।

খুনটা এই তল্লাটেই গত রাত্রে কোথাও কোন এক সময় হয়েছে, তারপর হয়ত ডেড বডিটা ওইখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে এসেছে হত্যাকারী ও তার দলবল। সুদর্শন বললে।

আপনার তাহলে মনে হয় এর পেছনে একটা গ্যাং আছে?

আমার তো অন্ততঃ ধারণা তাই। সুদর্শন বলে।

ডি-এস-ও সব শুনে তাই বলছিলেন। তিন বছরের মধ্যে এই তল্লাটে এতগুলো খুন, অথচ আজ পর্যন্ত খুনগুলোর কোন একটা হদিস পাওয়া গেল না।

আমার মনে হয় মিস্টার বোস, খুনগুলো সব একই সূত্রে গাঁথা—

কি রকম?

ওই ওয়াগন ভেঙে ইয়ার্ড থেকে মাল সরাবার ব্যাপারে যে গ্যাংটা কাজ করছে, এ তাদেরই কীর্তি।

আশ্চর্য নয় কিছু। তাছাড়া দেখুন না, ইয়ার্ডে এত পুলিস-প্রহরা রেখেও আজ পর্যন্ত ওই ওয়াগন থেকে মাল সরাবার ব্যাপারের কোন হদিস পাওয়া গেল না।

বেটারা যে কি করে আগে থাকতেই টের পায়! চটপট হাওয়া হয়ে যায়!

সুদর্শন প্রত্যুত্তরে বললে, হয়ত যারা মাল খালাস করে বা মাল লোড করে, তাদেরই কেউ সন্ধান দেয় ওদের কিংবা রেলওয়ের কোন অফিসার বা ক্লার্ক। দলের মধ্যে হয়ত তারাও আছে।

সে সন্দেহ যে আমাদেরও মনে আসেনি মিস্টার মল্লিক, তাও নয়। যথেষ্ট সাবধানতাও নেওয়া হয়েছে সেজন্য।

ইতিমধ্যে জীপ মাঠের মধ্যে এসে গেল।

বটতলায় গাড়িটা রেখে ওরা হেঁটে এগিয়ে গেল স্পটে। যে সেপাইটা প্রহরা দিচ্ছিল সে সেলাম করল।

সুদর্শন আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বললে, there you are, exactly—এইখানেই ছিল ডেড বডি পড়ে!

রাজেন বোস সুদর্শন-প্রদর্শিত জায়গাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে জায়গাটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে কি সব দেখলেন।

তারপর বললেন, আগের বারে সেই মেয়েটির ডেড বডিটা ওই বটগাছতলাতেই পড়েছিল মিস্টার মল্লিক, তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে মিস্টার মল্লিক, এখানেই গুলজার সিংকে হত্যা করা হয়েছিল?

পিস্তলের গুলিতে যখন মারা হয়েছে তখন কি আশেপাশে তাহলে রক্তচিহ্ন থাকত না?

কিন্তু ডেড বডি টেনেহিঁচড়ে এখানে আনার তো কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে না আশেপাশের মাটিতে! রাজেন বোস বলেন।

কিন্তু একটা কথা ভুল করছেন কেন মিঃ বোস, ডেড বডি ক্যারি করে এখানে নিয়ে আসা হলে সেরকম কোন চিহ্ন কি থাকত না? আর তাই আমার মনে হয়, ওই হত্যার ব্যাপারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিশ্চয়ই জড়িত ছিল। সুদর্শন বলে।

তা অবিশ্যি হতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, ডেড বডিটা রাস্তায় কোথাও না ফেলে এই মাঠের মধ্যেই বা হত্যাকারীরা বয়ে আনতে গেল কেন?

সেটা হয়ত যেখানে হত্যা করা হয়েছে, ঠিক তার আশেপাশে কোথাও ডেড বডিটা পড়ে থাকলে পুলিসের ওই জায়গাটার ওপর নজর পড়তে পারে বলেই হত্যার পর বেশ কিছুটা দূরে ডেড বডিটা এনে ফেলে দিয়েছে যাতে করে অকুস্থান সম্পর্কে

আমরা সচেতন হতে না পারি।

অস্বীকার করছি না, কিন্তু এই মাঠেই বা কেন ফেলা হল? যাকগে, চলুন ফেরা যাক।

ওরা আবার জীপে গিয়ে উঠল।

পরের দিন বিকেলের দিকে।

কিরীটী সুদর্শনকে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছিল। সুদর্শন হাওড়ায় এসে একটা বালিগঞ্জ অভিমুখী বাসে উঠতেই সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সাবিত্রী একটা সীটে বসেছিল।

সুদর্শনই প্রথমে সাবিত্রীকে দেখতে পেয়ে বলে, সাবিত্রী, তুমি!

সবিত্রী সুদর্শনের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসে।

সুদর্শনের বসবার জায়গা ছিল না। কিন্তু সাবিত্রীর পাশের সিটটা তখনও খালিই ছিল।

সাবিত্রী ডাকে, এখানে এসে বসুন না।

সুদর্শন এগিয়ে গিয়ে সাবিত্রীর পাশেই বসে পড়ে।

কোথায় যাচ্ছ? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

দিদির এক বন্ধু অরুণাদি মীর্জাপুর স্ট্রীটে থাকে, তার কাছে যাচ্ছি। অরুণাদি একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। দেখি তাকে বলে একটা চাকরি যদি করে দিতে পারে তার স্কুলে।

কেন, সত্যিই কি তুমি পরীক্ষা দেবে না?

ফিস যোগাড় হলে দেব। কিন্তু সে কথা তো পরে ভাবলেও চলবে। আপনি তো সবই জানেন। আপাততঃ সংসারটা তো চালাতে হবে।

কেন, অবিনাশবাবু আর অমলেন্দুবাবু কি সত্যিই কোন সাহায্য করবেন না?

দাদা তো গতকালই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে মিলের কোয়ার্টারে—

চলে গেছেন?

হ্যাঁ।

আর অমলেন্দুবাবু?

ছোড়দা অবিশ্যি বাড়ি ছেড়ে যায়নি, তবে—

কি তবে?

তাকেও তো আর একটা সংসার টানতে হয়।—

তার মানে?

প্রশ্নটা করে সুদর্শন সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

সাবিত্রীও মনে হয় যেন হঠাৎ ঐ কথাটা বলে থমকে গিয়েছে, কেমন যেন একটু বিব্রত।

সুদর্শন আবার প্রশ্ন করল, আর একটা সংসার টানতে হয়—কি বলছিলে সাবিত্রী! কথাটা তো ঠিক বুঝলাম না!

॥ ছাব্বিশ ॥

আমাদের পাড়ার হরগোবিন্দকে চেনেন?

কে? যার ওই লেদ মেশিনের কারখানা আছে?

হ্যাঁ। তার মেয়ে সবিতা। তার সঙ্গে ছোড়দার খুব ভাব। বিয়ে করবে তাকে। মাতাল হরগোবিন্দ সংসারে বিশেষ কিছুই দেয় না। ছোড়দাই তো সবিতাদের সংসারটা বলতে গেলে চালায়।

তাই নাকি! তা কই, অবিনাশবাবু—তোমার দাদা তো সেকথা বললেন না?

দাদা বা দিদি কেউই ব্যাপারটা জানত না। একমাত্র আমিই জানি।

তা এক কাজ করলেই তো পারেন অমলেন্দুবাবু, মেয়েটিকে বিয়ে করে নিয়ে এলেই তো হয়। দুটো সংসার আর টানতে হয় না।

বিয়ে ছোড়দা করবে না।

কেন?

ছোড়দাও ভীষণ মদ খায়।

জানি।

কিন্তু সবিতা সেকথা জানে না।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তাছাড়া সবিতা মাতালকে ভয়ানক ঘৃণা করে। মদ তো ছোড়দা ছাড়তে পারবে না—অথচ বিয়ে করে সবিতাকে বাড়ি নিয়ে এলে হয়ত সব একদিন-না-একদিন জানাজানি হয়ে যাবে, তাই হয়তো—

বিচিত্র ব্যাপার দেখছি!

আরও একটা ব্যাপার আছে।

কি?

সবিতাকে ছোড়দা অনেকবার বলেছে, সে নাকি মদ স্পর্শও করে না!

জনবহুল রাস্তা ধরে বাস ছুটে চলেছিল। শীতের আলো ইতিমধ্যেই ম্লান হয়ে এসেছিল। রাস্তার আলো জ্বলতে শুরু করেছিল একটি দুটি করে।

সুদর্শন একসময়ে ডাকে, সাবিত্রী!

সাবিত্রী সুদর্শনের দিকে তাকাল।

বলছিলাম, আমি যদি তোমার একটা একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিই?

দেবেন! সত্যিই? সাবিত্রীর চোখের মণি দুটো প্রত্যাশার আনন্দে যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দেব। তবে আগে পরীক্ষাটা দিতে হবে তোমায়—তারপর।

কিন্তু—

সাবিত্রী কি বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে একপ্রকার স্মিতহাস্যে থামিয়ে দিয়েই মুখের দিকে তাকিয়ে সুদর্শন বলে, কোন কিন্তু না, পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। তোমার পরীক্ষার ফিস আমিই দেব। তুমি অমত করতে পারবে না।

সাবিত্রী যেন কেমন মনে হল থতমত খেয়ে গিয়েছে সুদর্শনের কথায়।

একটু মৃদু কণ্ঠে বলে, আপনি দেবেন?

তাই যদি দিই!

না না, তা হয় না।

কেন হয় না সাবিত্রী?

না, আপনার টাকা আমি নিতে পারি না।

বেশ তো, মনে কর না, এমনি নিচ্ছ না—তুমি টাকাটা ধার নিচ্ছ আমার কাছ থেকে। তারপর চাকরি হলে শোধ করে দিও না হয়।

না। কথাটা বলে সাবিত্রী মুখটা ঘুরিয়ে নিল রাস্তার দিকে।

সাবিত্রী, আমি ওই কথাটা বলায় কি তুমি রাগ করলে?

সাবিত্রী কোন জবাব দেয় না, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর সাবিত্রী, আমি তোমাকে কোনরকম অপমান করতে চাইনি। বন্ধু হিসেবে—

আমরা গরীব বলেই তো—, সাবিত্রী ওর মুখের দিকে তাকাল। তার দু-চোখে জল, গলার স্বরটা যেন বুজে আসে কান্নায়।

ছি ছি সাবিত্রী, একবারও ওকথা আমার মনে হয়নি। তুমি এত করে পড়াশোনা করলে, পরীক্ষার জন্য বছর দুই ধরে নিজেকে তৈরি করলে, অথচ কয়েকটা টাকার অভাবে পরীক্ষাটা তোমার দেওয়া হবে না—তাই বলেছিলাম কথাটা।

ইতিমধ্যে বাস কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের জংসনে পৌঁছে গিয়েছিল।

সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল।—আমি এখানে নামব।

সাবিত্রী নেমে গেল।

বাস আবার গন্তব্যপথে ছুটে চলে।

সুদর্শন যখন কিরীটীর গড়িয়াহাটার বাড়িতে পৌছল, তখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বেশ—শহরের সর্বত্র আলো জ্বলে উঠেছে।

গড়িয়াহাটার নম্বরগুলো কেমন যেন এলোমেলো ভাবে এদিক-ওদিক ছড়ানো। নম্বরটা খুঁজে পেতে বেশ একটু সময়ই লাগে সুদর্শনের।

দরজার বেল টিপতেই জংলী এসে দরজা খুলে দিল।

বাবু আছেন ?

জংলী বললে, বাবু একটু বের হয়েছেন, এলে আপনাকে বসতে বলে গিয়েছেন। সিঁড়ির ঘরে যান।

দোতলার ও একতলার মাঝামাঝি মেজোনিন ফ্লোর। ঘরে আলো জ্বলছিল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই কৃষ্ণাকে দেখতে পেল সুদর্শন। কৃষ্ণা ঘরের মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে সেতার বাজাচ্ছিল। সুদর্শন কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই বাজনা থামিয়ে সেতারটা নামিয়ে রাখল কৃষ্ণা।

আসুন সুদর্শনবাবু!

আপনি বাজনা থামালেন কেন বৌদি ?

কৃষ্ণা মৃদু হাসে। আপনার দাদা একটু বেরিয়েছে। আপনাকে বসতে বলে গেছে। বসুন, চা করে আনি।

আপনি ব্যস্ত হবেন না বৌদি, বসুন।

ব্যস্ত কি! আমারও চায়ের পিপাসা পেয়েছে। বসুন, আসছি আমি।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ সাতাশ ॥

কিরীটীর নতুন বাড়িতে আগে আর আসেনি সুদর্শন।

মেজোনিন ফ্লোরের ঘরটা নেহাৎ ছোট নয়, আকারে বেশ বড়ই হবে। একধারে সোফা সেট ও একধারে সোফা-কাম-বেড একটি।

এক কোণে পাশাপাশি দুটো আলমারি। একটাতে ঠাসা বই, অন্যটায় নানা

ধরণের সব কিউরিও।

ছোট আলমারিটার মাথায় একটি মাটির বুদ্ধের ধ্যানস্থ মুখ। কৃষ্ণনগরের তৈরি। আলমারির মাথায় একটি দামী জার্মান ক্যাণ্ডেল ঘড়ি। সোফার একপাশে ফোন। বিদেশী ফোন—সাদা রঙের।

মাঝখানে ডিম্বাকৃতি সেণ্টার টেবিল—ওপরে কাচ বসানো। টেবিলের ওপরে ফ্লাওয়ার ভাসে একগোছা টাটকা রজনীগন্ধা। ঘরের মধ্যে ধূপ ও ফুলের মিশ্র একটা গন্ধ বাতাসে।

ফোনের পাশে কিছু স্প্যান, সোভিয়েৎ ল্যাণ্ড, নবকল্লোল ইত্যাদি মাসিক ও পাক্ষিক পত্র। একটা নবকল্লোল টেনে নিয়ে সুদর্শন পাতা ওল্টাতে থাকে। মিনিট পনের বাদেই কৃষ্ণা ভৃত্যের হাতে চায়ের ট্রে ও প্লেটে কিছু মিষ্টি নিয়ে কাচের দরজা ঠেলে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

ও কি বৌদি, প্লেটে অত কি খাবার এনেছেন? ও কথা তো ছিল না! বলেছিলেন তো কেবল চায়ের কথা!

আপনার দাদার হুকুম।

তার মানে?

হ্যাঁ। আমাকে বলে গিয়েছে, আজ যেন আপনাকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

হঠাৎ দাদার অমন নির্দেশ দেবার হেতু?

তা তো জানি না। বলে গিয়েছে মিষ্টিমুখ করাতে আপনাকে, তাই নিয়ে এলাম।

কথাগুলো বলে মৃদু হাসে কৃষ্ণা।

ঠিক আছে, তাহলে আগে দাদা আসুন, শুনি আগে কেন তিনি আমাকে মিষ্টিমুখ করাতে চান—তারপর না হয় দেখা যাবে। বলতে বলতে একটা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল সুদর্শন।

কৃষ্ণাও একটা কাপ তুলে নিয়েছিল। সে তখনও মৃদু মৃদু হাসছে।

হঠাৎই যেন একটা সম্ভাবনার কথা চকিতে সুদর্শনের মনের পাতায় উঁকি দিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণা তখনও হাসছে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি।

সুদর্শন মুখটা নামিয়ে নেয়। নিজেকে সুদর্শন কেমন যেন বিব্রত বোধ করে—কেমন একটা অস্বস্তি।

কৃষ্ণার চোখের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত যেন তাকাতে পারে না সুদর্শন।

তারপর আপনার খবর কি বলুন? কৃষ্ণা স্মিতকণ্ঠে শুধায় একসময়।

ওই একরকম চলে যাচ্ছে।

ওই একরকম কেন ? ও যে বলছিল—

কি বলছিলেন দাদা ?

নতুন যেখানে পোস্টিং হয়েছেন, আপনার থানা এলাকাটা বেশ ভালই !

ভাল না ছাই ! চোরাকারবারির আড্ডা একটা। তিন বছরে সাত-সাতটা খুন !

আহা, সে-সব তো সব থানাতেই থাকে। নচেৎ আপনাদের প্রয়োজনটাই বা কি ? তাছাড়া ওই সঙ্গে কোন আনন্দের উৎসও তো থাকতে পারে ?

কৃষ্ণার কথা এবার আর অস্পষ্ট নয়—এবং কৃষ্ণার আলোচনার গতিটা যে কোন্ দিকে চলেছে সুদর্শনের বুঝতে কষ্ট হয় না।

তবু সুদর্শন বলে, থানা-অফিসারদের জীবনে, বিশেষ করে আজকালকার দিনে, কোন আনন্দই আর নেই বৌদি। হাজারটা ঝামেলা—প্রবলেম—

আরে ভাই, প্রবলেম না হলে জীবন কি ?

সুদর্শন হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরে দরজার দিকে ফিরে তাকায়।

ইতিমধ্যে কখন যে কিরীটী ঘরের কাচের দরজা ঠেলে জাপানী রবারের চপ্পল পায়ে নিঃশব্দে ভেতরে পা দিয়েছে, ও জানতেও পারেনি।

কিরীটী একটা সোফার ওপর বসতে বসতে বললে, তারপর সুদর্শনবাবু, তোমার সেই তিনির খবর কি বল ?

সুদর্শনের মুখটা সহসা আবার লাল হয়ে ওঠে।

কিগো সুদর্শনবাবু ?

কি যে যা-তা বলেন দাদা !

আহা, যা-তা নয় হে, যা-তা নয়। আমি জিজ্ঞাসা করছি সব চাইতে বেশ ইম্পর্টেণ্ট নিউজ যেটা—অর্থাৎ তোমার সাবিত্রী দেবীর খবর কি ?

দাদা, আপনি যদি ওই রকম করেন তো আমি উঠে যাব বলছি !

আরে বস বস। তুমি জান না কিন্তু তাকে আমি না দেখে তোমার মুখ থেকে শুনেই বুঝতে পেরেছি সাবিত্রী মেয়েটি সত্যিই ভাল। অপাত্রে তুমি মন দাওনি।

সবটাই আগাগোড়া আপনার একটা কল্পনা। ক্ষীণকণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে সুদর্শন আবার।

কল্পনা কেন হবে, চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে।

মানে ? সাবিত্রীকে আপনি দেখলেনই বা কখন—পরিচয়ই বা হল কি করে তার সঙ্গে আপনার ?

হয়েছে হে ভায়া' হয়েছে। তারপরই কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, জান কৃষ্ণা, সত্যিই সাবিত্রী মেয়েটি বড় ভাল। অবিশ্যি তারও লাক আছে বলব, নচেৎ সুদর্শনের নজরে সে পড়ে ?

দাদা, থামবেন আপনি !

থামতে আমি রাজি আছি ভায়া, কিন্তু সেটা তো আর কিছু তোমার মনের সত্যিকারের কথা নয়।

আপনি কি ওই সব আজেবাজে কথা বলবার জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দাদা !

আজেবাজে কি হে ? এর চাইতে প্রয়োজনীয় কথা—

সম্পূর্ণ আজেবাজে।

না হে না। সাবিত্রীর বোন মাধবী নিহত না হলে সাবিত্রী যেমন এত তাড়াতাড়ি তোমার অত কাছে আসত না, তেমনি মাধবী নিহত না হলেও বোধ করি এত তাড়াতাড়ি তোমার দশ নম্বর পল্লীর হত্যারহস্যগুলির মূল সূত্রটিও আমি খুঁজে পেতাম না।

কিরীটীর কথায় যেন হঠাৎ চমকে ওঠে সুদর্শন।

কি বলছেন দাদা ?

ঠিকই বলছি ভায়া। হত্যাকারী মাধবীকে হত্যা করেই কেবল যে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ব্লাণ্ডার করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে ইতিপূর্বে ওই অঞ্চলে যে সব হত্যা-ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, সেই রহস্যের অন্ধকারেও আলোকসম্পাত করেছে নিজের অজ্ঞাতেই।

কিছু বুঝতে পারছি না দাদা ! মাধবীকে হত্যা করে হত্যাকারী ভুল করছে কেন বলছেন—

আরে ভায়া, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি নারী-হৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হয়েছ !

আঃ দাদা, প্লীজ—

শোন সুদর্শন, আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো—যে প্রেম মানুষকে ক্ষেত্র-বিশেষে নিঃস্ব বৈরাগী করে তোলে, সেই প্রেমই আবার ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যে কি নিষ্ঠুর, নৃশংস, প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে, মাধবীর মৃত্যুই তার জাজ্বল্য-মান দৃষ্টান্ত। তবে এও আমি বলব, সেটা হয়ত ঠিক প্রেম নয়—বলতে পার মানুষের আদিম রিপুর দহন অথবা একটা অত্যন্ত রূঢ় যৌন-আকর্ষণ—

যৌন-আকর্ষণ !

কিরীটী সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, হ্যাঁ। যা তোমার মাধবী দেবীর সারাটা দেহ জুড়ে ছিল এবং পুরুষ মাত্রেরই বুকে যা মারাত্মক লোভের আগুন জ্বালিয়ে তুলত সর্বদা।

আপনি তাহলে বলতে চাইছেন—

সুদর্শনকে বাধা দিয়ে কিরীটী বলে, সেই মারাত্মকযৌন-আকর্ষণের অতৃপ্তিরই শেষ পরিণতি এবং যা স্বাভাবিক ওই সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেই রিভেঞ্জ নিতে গিয়েই মাধবীর হত্যাকারী নিজেই আমার চোখে কেবল যে এক্সপোজডই হয়ে গিয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে ইতিপূর্বে যে সব হত্যা-ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, সেই রহস্যের অন্ধকারেও নিজের অজ্ঞাতে আলোকসম্পাত করেছে—যা তোমাকে একটু আগেই আমি বলছিলাম।

॥ আটাশ ॥

কিরীটীর শেষের কথায় সুদর্শন যেন উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে। বলে, সত্যি-সত্যিই আপনি জানতে পেরেছেন দাদা, মাধবীর হত্যাকারী কে?

কেবল মাধবীরই বা কেন? গুলজার সিংয়েরও! কিরীটী বলে।

জানতে পেরেছেন?

এটা তো স্বীকার করবে ভায়া, ঐ সবগুলো হত্যার সঙ্গেই ঐ তল্লাটের ওয়াগন ভেঙে মালচুরির ব্যাপারটার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে! আর তাতেই আমার মনে হয়—

তাহলে কি দাদা আপনি—

কিরীটী মৃদু হেসে বাধা দিয়ে বলে, সঠিক একেবারে জানতে না পারলেও অনুমান করতে কিছুটা পেরেছি বৈকি। এবং এও বুঝতে পেরেছি একই ব্যক্তি উভয়ের হত্যাকারী—হ্যাঁ, অন্ততঃ সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি।

কে? কে সে দাদা?

মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই তুমিও জানতে পারবে।

তাহলে আপনি কি বলতে চান, গত তিন বছর ধরে যে সব হত্যা ওই অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে, সব একজনেরই কীর্তি?

তা হয়ত হতেও পারে, নাও হতে পারে।

তবে?

তবে এটা ঠিক, হত্যাকারীও ওই ওয়াগন থেকে মাল চুরির ব্যাপারে কোন-না

কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।

অর্থাৎ তাদেরই একজন ছিল ?

নিঃসন্দেহে।

তবে কি মাধবীও—

জোর গলায় কিছু বলা যায় না সুদর্শন। কারণ একটা ব্যাপার তুমি সহজ ভাবে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, মাধবী ওই অঞ্চলেই বসবাস করত এবং থিয়েটারের ব্যাপারে তাকে প্রায়ই অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতে হত। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে আকস্মিক ভাবে কিছু দেখে ফেলা বা জানতে পারাটা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার যেমন ছিল না, তেমনি পরে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাদের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়াটাও কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

আচ্ছা আপনার কি ধারণা দাদা, ওই ওয়াগন ভেঙে মাল সরাবার ব্যাপারটা এই অঞ্চলেরই কোন এক বিশেষ ব্যক্তির কীর্তি ?

ঐ অঞ্চলেরই অবিশ্যি—তবে—

তবে ?

ব্রেন নিঃসন্দেহে একজনের। বাকি সব ছিল হয়ত তার হাতে দড়ি-বাঁধা পুতুল-নাচের পুতুল মাত্র। কিন্তু আর ভয় নেই ভায়া—আজ এই পর্যন্ত, কাল বাদে পরশু তুমি এস—আশা করছি তোমার দশ নম্বর পল্লীর রহস্যের যবনিকা উত্তোলন করতে পারব। হ্যাঁ, তুমি বরং তোমার বৌদির সঙ্গে গল্প কর।

কিরীটী বের হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ সুদর্শন বসে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করল।

পরের দিনই সন্ধ্যার দিকে সুদর্শন কিরীটীর একটা জরুরী কল পেয়ে তার গড়িয়া-হাটার বাড়িতে এসে হাজির হল।

কি ব্যাপার দাদা, হঠাৎ জরুরী তলব ?

হ্যাঁ, চল।

কোথায় ?

তোমারই তল্লাটে। তোমার সঙ্গে আজ রাত্রে একবার ঘুরে দেখব—

বেশ তো চলুন। কিন্তু হঠাৎ সেখানে ?

কিরীটী বলে, একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে। বাঘ হয়ত সে ফাঁদে পড়লেও পড়তে পারে, যদি অবিশ্যি লাক আমাদের ফেভার করে !

কৃষ্ণা বলে, এখুনি বেরুবে নাকি ?

হ্যাঁ।

ফিরবে কখন? তাহলে তো তার কোন ঠিক নেই!

তা নেই।

তবে কিছু খেয়ে যাও।

না। পেটে কিছু পড়লেই ঘুম পাবে। তুমি বরং এক কাজ কর কৃষ্ণা।

কি?

কিছু স্যাণ্ডউইচ তৈরি করে দাও, আর ফ্লাস্কে কফি তিনজনের মত।

কৃষ্ণা উঠে গেল।

সুদর্শন, তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও না?

না দাদা, আমার ক্ষিধে নেই।

আহা, এখন না থাকলেও একটু পরে পেতেও তো পারে?

না, পাবে না।

বাইরে ওই সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

কিরীটী মুহূর্তকাল কান পেতে সিঁড়িতে জুতোর শব্দটা শুনে বলে, সুব্রত এসে গেল বোধ হচ্ছে!

সত্যিই সুব্রতই এসে পরক্ষণে ঘরে ঢুকল।

সুব্রতর পরিধানে গরম লংস ও গায়ে বাদামী একটা গলাবন্ধ গ্রেট কোট।

পায়ে ভারি রবার সোলের জুতো।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, দ্যাটস গুড। তুই বস্ সুব্রত, আমি চট করে জামা-কাপড়টা পাল্টে আসি। কথাগুলো বলে কিরীটী উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুব্রত বসতে বসতে বলে, তারপর সুদর্শনবাবু, কতক্ষণ?

এই কিছুক্ষণ। আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ। কারণ ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট রিস্ক আছে। দলে আমরা যতটা ভারি থাকি, ততই সেফ।

তাই যদি তো—দাদা আমাকে আগে বললেই তো পারতেন, থানা থেকে কিছু পুলিস-ফোর্সের ব্যবস্থা করা যেত।

কিরীটী ওই সময় পাশের ঘর থেকে সাড়া দেয়, না হে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়—আমাদের দেশের একটা প্রবাদ আছে, জান না? তাছাড়া রক্তলোভী বাঘ চতুর, চট করে ফাঁদে পা বাড়ায় না!

॥ উনত্রিশ ॥

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

দেখা গেল কিরীটী খুব দ্রুত তার বেশ পরিবর্তন করেছে ইতিমধ্যেই।

মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, পরিধানে কালো গরম স্যুট। হঠাৎ দেখলে কোন পাঞ্জাবী বলে ভুল হয়।

এ কি দাদা, এই বেশে যাবেন নাকি? সুদর্শন শুধায়।

যস্মিন দেশে যদাচার ভায়া! বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিরীটী। দশটা বাজতে বাজতে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যেতে পারব বোধ হয়, এখন নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে তার একটা প্যাকেট আর ফ্লাস্ক ঝোলানো।

ওগুলো সুব্রতকে দাও কৃষ্ণা।

সুব্রত হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে পকেটে ভরে নিল আর ফ্লাস্কটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে।

সুব্রত, তোর গাড়ি এনেছিস তো?

হ্যাঁ।

চল, তাহলে আর দেরি নয়—বের হয়ে পড়া যাক। চল সুদর্শন।

সুদর্শন উঠে দাঁড়াল।

গাড়িতে যেতে যেতে কিরীটী বলে, মোকা একটা হঠাৎ এসে গেল সুদর্শন। দুপুরেই ট্র্যাফিক সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছ থেকে ফোন পেয়ে ভাবলাম, এক ঢিলে যদি দুই পাখি মারা যায় তো মন্দ কি! ভাল কথা সুদর্শন—

বলুন দাদা?

তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?

অস্ত্র!

হ্যাঁ, তোমার আগ্নেয়াস্ত্রটি?

না। আনিনি তো সঙ্গে।

তাহলে এক কাজ কর—

বলুন?

তোমাকে বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিচ্ছি। তুমি থানায় গিয়ে অস্ত্রটি লোড করে

নিয়ে ঠিক রাত এগারোটা নাগাদ বের হয়ে পড়বে।

তারপর ?

সোজা চলে যাবে রেলওয়ে ইয়ার্ডে।

কিন্তু আপনারা ?

আমরা তোমাকে খুঁজে নেব।

কেমন করে ? যা অন্ধকার রাত আজ—

সঙ্গে তোমার সিগারেট-লাইটারটা থাকবে তো ?

সব সময়ই তো পকেটে থাকে।

সেটা পর পর তিনবার জ্বেলো। তাহলেই তোমাকে আমরা স্পট করতে পারব।

বেশ, তাই হবে।

সুব্রত আর কিরীটী পাশাপাশি পিছনের সীটে বসেছিল, সুদর্শন সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল।

মিশির !

ড্রাইভার কিরীটীর ডাকে সাড়া দেয়, জী সাব !

তুমি আমাদের নামিয়ে দিয়ে সোজা থানায় চলে যাবে।

থানায় ?

হ্যাঁ। যেখানে আমরা নামব তারই বাঁ দিক দিয়ে যে পুবমুখো রাস্তাটা চলে গেছে, সেটা ধরে সোজা গেলেই থানায় পৌঁছে যাবে। থানা সেখান থেকে খুব বেশি দূর নয়।

বহুৎ আচ্ছা সাব।

হঠাৎ ওই সময় সুব্রত প্রশ্ন করে, গুলজার সিংয়ের ব্যাপারটা কিছু জানতে পারলি কিরীটী ?

হাঁ। তোর ধারণাটাই ঠিক। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে ওর একটা ইলেকট্রিক্যাল গুডস, রেডিও, রেডিওগ্রাম, ফ্রিজ প্রভৃতি ঝকঝকে সাজানো-গোছানো দোকান আছে—ইস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পনি। আর খুব সম্ভবত ঐ দোকানটি ও ব্যবসাই ছিল গুলজার সিংয়ের কামোফ্লাজ—

দোকানে কর্মচারী নেই ?

আছে জনা-পাঁচেক। দুটি অল্পবয়সী ছোকরা পাঞ্জাবী, দুটি বাঙালী আর একটি অ্যাংলো মেয়ে—বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সেই অ্যাংলো মেয়েটিকে আমি আগে থাকতেই চিনতাম, মিসেস শেয়েল—

তাই নাকি !

হ্যাঁ। একসময় ক্রিজার কর্পোরেশনে ও সেলস-গার্ল ছিল। আমাকে দেখেই চিনতে পারল। ইশারায় তাকে বাইরে ডেকে সোজা গিয়ে উঠলাম একটা রেস্তোরাঁয়। তার কাছেই সিংয়ের অনেক কিছু জানতে পারলাম।

কি রকম?

বম্বের ফিল্ম মার্কেটে ও একজন ফিনান্সিয়ার। হুণ্ডিতে টাকা ধার দেয়। বুঝলাম সেটা দশ-পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়—হিন্দি ফিল্ম মানেই লাখ নিয়ে কারবার! কাজেই বুঝতে কষ্ট হল না ইস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে ওই টাকা আসে না—আসতে পারে না। ওই টাকা অন্য খাতে আসে তার পকেটে।

তাহলে তো দেখতে পাচ্ছি, লোকটাকে হত্যা করবার কারণ ছিল! সুব্রত বললে।

তা ছিল বৈকি। বিনা কারণে কেউ কি কাউকে হত্যা করে? কিরীটী বললে।

সুদর্শন ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারে, ও যখন থানার মধ্যে বসে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, তখন কিরীটী অনেকটা এগিয়ে গেছে।

কিরীটী ওই সময় বলে, তবে এটাও ঠিক সুব্রত, গুলজার সিং নিহত না হলে হয়ত এত তাড়াতাড়ি ঐ গোলকধাঁধার সহজ রাস্তাটা আমি খুঁজে পেতাম না।

কিরীটী পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বলে আবার, কিন্তু এখনও একটা ব্যাপার আমার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে, গুলজার সিংয়ের মত ধূর্ত লোক অমন করে ফাঁদে পা দিয়েছিল কি করে? সে যে মাধবীর ব্যাপারটা জানতে পারেনি তাও তো মনে হয় না!

সুদর্শনই ওই সময় প্রশ্ন করে, মাধবী? মাধবীর সঙ্গে গুলজার সিংয়ের কোন সম্পর্ক ছিল নাকি?

নিঃসন্দেহে। কিন্তু কতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল জানি না।

কি করে বুঝলেন?

পুলিস গুলজারের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তার ফ্ল্যাট সার্চ করতে গিয়ে তার শোবার ঘরে ড্রয়ারের মধ্যে মাধবীর একটা ফটো পেয়েছে—

সে কি! সুদর্শন বলে ওঠে।

শুনে খুব শকড্ হলে সুদর্শন, তাই না? জান না চলতি প্রবাদটা! নারীর চরিত্র দেবতারই অগম্য—তা মানুষ কি কথা!

আমার কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে দাদা। সুদর্শন বলে।

যাবে ভায়া—আরও যাবে। যখন মাধবীর হত্যাকারীকে তুমি চিনতে পারবে!

মাধবীর হত্যাকারী কি ওই গুলজার সিংই নাকি?

না। মৃদু হেসে কিরীটী বলে।

তবে ?

তবে যদি অনুমানটা আমার মিথ্যা না হয় তো গুলজার সিং পূর্বাহ্নেই মাধবীর মৃত্যুর ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিল। অর্থাৎ সে জানতে পেরেছিল মাধবীর হত্যাকারী কে আর সেই কারণেই সে হত্যাকারীর সঙ্গে একটা মোকাবিলা করবার জন্য সে-রাত্রে ওইখানে এসেছিল এবং কথাটা সম্পূর্ণ না জেনেই যে হত্যাকারী সে আসতে পারে অনুমান করে তার জন্য পূর্বাহ্নেই ফাঁদ পেতে রেখেছিল—

কিরীটী বলতে বলতে একবার হাতের চুরুটের ছাইটা গাড়ির মধ্যস্থিত অ্যাসট্রেতে ঝেড়ে ফেলে তার অর্ধসমাপ্ত কথার মধ্যে ফিরে যায়।

বলে, অবিশ্যি গুলজার সিংয়ের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাবার আক্রোশ ও সেই সঙ্গে তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসও তাকে মৃত্যু-ফাঁদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল সে রাত্রে। এবং যার ফলে দুটো ব্যাপার হল—

দুটো ব্যাপার ? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। প্রথমতঃ, গুলজার সিং দিল প্রাণ, আর দ্বিতীয়তঃ, হত্যাকারী আবার ভুল করল আর একটা—এবং সেটাই হল তার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল।

আবার কি ভুল করল ?

কতকটা যেন ছেলেমানুষের মতই সুদর্শন প্রশ্ন করে। সে যেন গল্প শুনছে আর কিরীটী যেন গল্প বলে চলেছে।

প্রথম ভুল করেছিল সে মাধবীকে হত্যা করে, দ্বিতীয় ভুল করল সে গুলজার সিংকে হত্যা করে—

কেন, ভুল করল কেন ?

ভুল করল এই কারণে যে গুলজার সিং যে মাধবীর অন্যতম প্রেমিক বা প্রণয়প্রার্থী, এবং যে ব্যাপারটা কারও জানবার কথা নয়, সেটাই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্ধ আক্রোশে হত্যাকারী আমার চোখে স্পষ্ট করে দিল—and I also got my clue! অর্থাৎ গুলজার সিং নিহত না হলে আমরা বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি রহস্যের দোর-গোড়ায় পৌছতে পারতাম না। আরও বেশ কিছুদিন অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াতে হত। কিন্তু আর নয়, আমরা বোধ হয় এসে গেলাম—মিশির ?

জী সাব!

আউর থোড়া যাকে ডাইনা তরফ গাড়ি রোখো, সুদর্শন সাব উতার যায়গা। সুদর্শন, তোমাকে যা বলেছি মনে থাকে যেন। রাত এগারোটার আগে বেরোবে না,

তাড়াহুড়ো করবে না।

সুদর্শন মৃদু কণ্ঠে বলে, না দাদা, যেমন বলছেন তাই করব।

॥ ত্রিশ ॥

সুদর্শনকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি আরও কিছুটা এগোতেই কিরীটী মিশিরকে বলল, এই-খানেই গাড়ি রাখ মিশির।

মিশির গাড়ি থামায়।

কিরীটী ও সুব্রত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মিশির ওদের নামিয়ে দিয়ে তার প্রতি কিরীটীর পূর্ব নির্দেশমত থানার দিকেই গাড়ি চালায়। গাড়িটা ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

কিরীটী হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দশটা বাজতে আর মিনিট তিনেক আছে।

রাস্তায় মানুষের, বাস, মোটর, সাইকেল ও সাইকেল-রিক্সার চলাচল তখনও বেশ আছে—যদিও শীতের রাত। তবে অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেকটা কম। ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে। ক্রমশঃ পাতলা হচ্ছে আরও। তা প্রায় দোকানপাট বন্ধ বললেই চলে।

কিছুটা এগিয়ে এসে বাজারের পরে যে রাস্তাটা পূর্বদিকে চলে গেছে, কিরীটী ও সুব্রত সেই রাস্তা ধরেই চলতে থাকে।

আগে একদিন কিরীটী ওই রাস্তাটা ধরে হেঁটে হেঁটে যতটা সম্ভব দেখে গিয়েছিল, কাজেই রাস্তাটা তার অপরিচিত নয়। সে স্বচ্ছন্দ গতিতেই এগিয়ে চলছিল।

প্রায় আধ মাইলটাক হাঁটার পর বাঁয়ে মোড় নিল কিরীটী। একটা পুকুরের ধার দিয়ে সরু পায়ে-চলা আর একটা রাস্তা, এবারে সেই রাস্তাটাই ধরল কিরীটী। সুব্রত নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে।

এদিকটায় তেমন আলোর ব্যবস্থা না থাকায় বেশ অন্ধকার। কিরীটী পকেট থেকে টর্চটা বের করে সাবধানে সেই টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে অগ্রসর হয়।

সাবধানে আয় সুব্রত—বেকায়দায় এদিকে-ওদিকে পা পড়লেই কিন্তু এই শীতের রাতে সোজা হয় পানাপুকুরের জলে, না হয় কাঁচা নর্দমার পঙ্করাশির মধ্যে পপাত হবি। কারণ একদিকে পানাপুকুর, অন্যদিকে কাঁচা ড্রেন। কিরীটী চাপা গলায় বলল।

ড্রেনের দুর্গন্ধে ও কচুরিপানার একটা আঁশটে গন্ধে সুব্রত আগেই বুঝতে পেরেছিল,

আশেপাশে কোথাও কাঁচা ড্রেন আছে। সেটা যে একেবারে পাশেই জানতে পেরে সুব্রত আরো সাবধানে হাঁটিতে লাগল আবছা অন্ধকারে।

পুকুরটা শেষ হল একসময়। তারপর কিছু বস্তি-বাড়ি। রাস্তা সেখানেও রীতিমত সঙ্কীর্ণ। আলোর কোন ব্যবস্থাই নেই। প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটবার পর একটা ভাঙা প্রাচীরের ভেতর দিয়ে ওরা পড়ল এসে রেলওয়ে ইয়ার্ডে।

অন্ধকার এখন আর অত মনে হয় না, কারণ ইয়ার্ডের আলোয় খুব স্পষ্ট না হলেও ওরা দেখতে পাচ্ছে এখন চারদিক আবছা-আবছা।

এদিকে-ওদিকে সিগন্যালের লাল ও সবুজ-আলো আকাশের অন্ধকারে চোখে পড়ে।

অসংখ্য ইস্পাতের লাইন এঁকেবেঁকে সাপের মত চলে গেছে।

ইঞ্জিনের শব্দ। একটা বোধ হয় মেল ট্রেন চলে গেল পশ্চিমগামী।

এখানে-ওখানে সারা ইয়ার্ড ছড়িয়ে আবছা আলো-অন্ধকারে মালগাড়ি ও প্যাসেঞ্জার বগিগুলো দাঁড়িয়ে।

॥ একত্রিশ ॥

সন্তর্পণে কিরীটী এগিয়ে চলে।

ওরা স্টেশনের দিকেই এগিয়ে চলে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা মালগাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

আর ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ ওদের কানে এল একটা যান্ত্রিক শব্দ। লোহা জাতীয় কোন কিছুর মেটালিক শব্দ বলে যেন সেটা মনে হল।

কিরীটী হাতের টর্চটা আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে কিরীটী তীক্ষ্ন সন্ধানী দৃষ্টিতে। কোথা থেকে ঐ শব্দটা আসছে জানবার বুঝবার চেষ্টা করে। শব্দটা এক-একবার হচ্ছিল। আবার একটুক্ষণের জন্যে থামছিল।

ক্রমশঃ বুঝতে পারে কিরীটী. শব্দটা মালগাড়ির অন্য দিক থেকে আসছে।

শব্দটা অনুসরণ করে এবারে এগোয় কিরীটী। কয়েক পা সন্তর্পণে এগুতেই ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকারে কিরীটীর নজরে পড়ে, দুজন লোক কি একটা ভারী মত বস্তু অন্ধকারে মাথায় করে বয়ে রেল-লাইন দিয়ে প্রাচীরের দিকে এগিয়ে চলেছে সতর্ক ভাবে।

তারপরই ওদের কানে এল সতর্ক একটা গলার স্বর, কটা হল রে?

দশটা। অন্য কে একজন জবাব দিল।

সবই মনে হচ্ছে কাপড়ের পেটি! প্রথম জনের গলার স্বর আবার শোনা গেল।

আরও একজনের—অর্থাৎ এবার তৃতীয় ব্যক্তির গলার স্বর শোনা গেল, আসল মালটা বোধ হয় এই কাপড়ের পেটির মধ্যেই আছে।

ঠিক শুনেছিস তো? এটাই ষোল নম্বর ওয়াগন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। না শুনে ওয়াগন ভেঙেছি নাকি? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দেয়।

তৃতীয় ব্যক্তি বলে, এবারে শালা ওই বুড়ো শকুনিটা যদি মোটা মত লাভের অঙ্ক থেকে না দেয় তো আমারই একদিন কি ওরই একদিন!

অন্য একজন বলে, শালা একের নম্বরের কঞ্জুষ, স্বার্থপর। কেবল নিজের কোলের দিকেই ঝোল টানে।

ও শালার মরণের পাখনা গজিয়েছে। ওকেও দেখ, না গুলজার সিংয়ের পথেই পা বাড়াতে হবে একদিন। ক'টা মাল নামালি রে? দ্বিতীয়ের গলা।

দশটা পেটি। তৃতীয় বক্তা বলে।

দূরে ঐ সময় সুব্রতর নজরে পড়ে লাইটারের আলো—তিনবার জ্বলল, আবার নিভে গেল।

সুব্রত! চাপা গলায় ডাকে কিরীটী, চট করে যা—সুদর্শনকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

সুব্রত শিকারী বিড়ালের মতই সতর্ক ও ক্ষিপ্র গতিতে যেন কিরীটীর নির্দেশমত সুদর্শনের দিকে চলে গেল।

সুব্রত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির চাপা গলার স্বর কিরীটী আবার শুনতে পায়, ওহে, ভাল মনে হচ্ছে না—

তৃতীয় ব্যক্তি শুধোয়, কেন? কি হল আবার?

দ্বিতীয় ব্যক্তির গলার স্বর শোনা যায়, দূরে একটা কিসের আলো যেন তিনবার জ্বলে নিভে গেল!

প্রথম ব্যক্তির গলার স্বর আবার শোনা গেল, তখুনি বলেছিলাম, গুলজার সিংয়ের মরার পর এত তাড়াতাড়ি আবার এদিকে না আসতে! শুনলে না তো আমার কথা!

চতুর্থ ব্যক্তির গলার স্বর শোনা গেল, থাম্, থাম্, আর উপদেশ ছড়াসনি।

সে তুমি যাই বল—আমার কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ ভাল মনে হচ্ছে না। প্রথম ব্যক্তির গলার স্বর আবার শোনা গেল।

পঞ্চম ব্যক্তির গলার স্বর, আবে যানে দো ইয়ার—এই ঠাণ্ডিকো রাতমে কৌন তুমারা পিছে পড়েগী। চল, জলদি মাল উঠাও!

প্রথম ব্যক্তির গলার স্বর, আর দুটো বাকি আছে—

সুদর্শন ততক্ষণে ওইখানে পৌঁছে গেছে।

প্রথম ব্যক্তির গলার স্বর আবার শোনা যায়, কি ব্যাপার, ওরা যে লরিতে মাল তুলে দিতে গেল তো গেলই! ফেরার আর নাম নেই!

স্পষ্ট গলার স্বর।

মনে হয় যেন সুদর্শনও গলার স্বরটা শুনতে পেয়েছিল। পরিচিত গলার স্বরটা শুনে সে যেন হঠাৎ চমকে ওঠে।

হয়ত তার মুখ দিয়ে নামটা বের হয়েই আসত, কিন্তু তার আগেই কিরীটী ওর মুখে হাত চাপা দেয় এবং হিস্‌হিস্ করে বলে, উঁহু, উত্তেজিত হয়ো না ভায়া।

ঐ সময় কিরীটীর নজর পড়ল, বোধ হয় ওদের মধ্যে যে লোক দুটো মাল নিয়ে গিয়েছিল—তারা লাইন টপকে টপকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঐদিকেই ছুটে আসছে।

লোক দুটো ওয়াগনগুলোর ওদিকে চলে গেল। দ্রুত পায়ের শব্দ।

কি রে, কি ব্যাপার? প্রথম ব্যক্তি শুধোয়।

পুলিস।

পুলিস! কোথায়?

লরি ঘিরে ফেলেছে। ভোলা আর হোঁৎকা সটকেছে—

শালা কুত্তার বাচ্চা! প্রথম ব্যক্তি বলে।

দূর থেকে একটা মালগাড়ি আসছে মনে হয়—তারই শব্দ। শব্দ তুলে মালগাড়িটা ওদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল।

সুদর্শন, রেডি—চল ওদিকে! কিরীটী বললে এবারে।

কিন্তু দুটো ওয়াগনের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে অন্যদিকে আসবার পর দেখা গেল কেউ সেখানে নেই। গোটা দুই পেটি কেবল পড়ে আছে রেল লাইনের ওপরে আর একটা ওয়াগনের দরজার লক ভাঙা, কপাট খোলা।

রেল লাইন ধরে দুটো লোক ছুটছিল, হঠাৎ কানে এল পর পর কটা ফায়ারিংয়ের আওয়াজ। ফায়ারিংয়ের আওয়াজ ইয়ার্ডের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

কিরীটী হুইসেল বাজাল একটা।

দেখতে দেখতে কয়েকজন আর্মড পুলিস ঘটনাস্থলে খোলা ওয়াগনটার সামনে এসে পড়ে ছুটতে ছুটতে।

ইন্সপেক্টার কল্যাণ মিত্র বলেন, কি ব্যাপার! ওয়াগন ভেঙেছে দেখছি!

কিরীটী বললে, হ্যাঁ মিস্টার মিত্র—ইউ আর লেট!

আমরা কাছেই ছিলাম—শেষ ওয়াগনটার ধারে !

দেখতে পেলেন না তবু? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না।

অন্তত: ঘণ্টাখানেক হবে ওরা এসে ওয়াগন ভেঙেছে। কিরীটী বললে।

আমি ভেবেছিলাম, হয়ত রাত আরও বেশি হলে—

ঠিক আছে, এখানে দুজন আর্মড পুলিস পাহারা রেখে আপনারা থানায় যান, আমরা থানায় আসছি একটু পরে।

কিরীটী কথাগুলো কল্যাণ মিত্রকে বলে সুদর্শনের দিকে তাকাল, চল সুদর্শন, তোমার দশ নম্বর পল্লীতে যাওয়া যাক।

কিন্তু সেখানে কি আর এখন তাকে পাওয়া যাবে দাদা ?

চলই না হে, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতিটা কি !

ইয়ার্ড থেকে মাঠের ভেতর দিয়ে দশ নম্বর পল্লীতে পৌছতে মিনিট কুড়ি লাগে হেঁটে।

পল্লীর মধ্যে পৌছে সুদর্শন নিজের মনেই এগোচ্ছিল, কিন্তু কিরীটী তাকে হঠাৎ বাধা দিল, ওদিকে কোথায় চলেছ ভায়া ?

ওকে অ্যারেস্ট করবেন না !

আরে ব্যস্ত কি—আগে অন্য একটা জায়গা একটিবার ঘুরে আসি চল।

কোথায় যাবেন ?

তোমার সাবিত্রী দেবীর কুঞ্জে—

কোথায় ?

বললাম তো। তোমার সাবিত্রী দেবীর কুঞ্জের কাছে। চল।

সুদর্শন যেন ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই কতকটা যেন হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে অনড় অবস্থায়।

কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—চল ?

কিন্তু দাদা, সাবিত্রী—

আহা, চলই না হে। তোমার সেই একচক্ষু হরিণের মত নির্বুদ্ধিতা না করে ফিরে না হয় একবার তাকালেই অন্য দিকে। চল চল, hurry up !

সুদর্শন অতঃপর যেন কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই কিরীটীর নির্দেশমত সাবিত্রীদের গৃহের দিকে অগ্রসর হয়।

সুব্রত তখন মিটিমিটি হাসছিল।

ওরা বুঝতে পারেনি যে ব্যাপারটা তখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

॥ বত্রিশ ॥

সাবিত্রীদের গৃহের কাছাকাছি পৌছতেই একটা বেহালার সুর ওদের কানে এল।

কে যেন বেহালায় দরবারী কানাড়া আলাপ করছে।

বাঃ, ভারি মিষ্টি হাত! কিরীটি বলে, কে বেহালায় দরবারী কানাড়া বাজাচ্ছে কে সুদর্শন?

জানি না তো!

তোমার সাবিত্রী দেবী নয় তো?

জানি না।

বল কি! সে বেহালা বাজাতে পারে কিনা সে খবরটি এখনও অজ্ঞাত তোমার? তবে কি ছাই ভালবাস!

আঃ, দাদা—

যাই বল ভায়া, চমৎকার দরবারী কানাড়া আলাপ জমিয়েছে। কিরীটী আবার বললে।

হঠাৎ ওই সময় ওদের নজরে পড়ল সামনেরই একটা বাড়ির সামনের ঘরেরই ঈষৎ খোলা জানালা-পথে মৃদু আলোর আভাস আসছে এবং মনে হল বেহালার সুর সেই আলোকিত কক্ষ হতেই ভেসে আসছে।

কিরীটী দাঁড়াল, সুদর্শন!

দাদা?

ওইটিই তোমার মিত্র মশাই—অর্থাৎ আমাদের সুবোধ মিত্র মশাইয়ের বাড়ি না?

সুদর্শন মৃদু গলায় বলে, হ্যাঁ।

মিত্র মশাই-ই মনে হচ্ছে আমাদের এই মধ্যরাত্রের সুরকার!

হ্যাঁ। ওঁর ঘরে বেহালা দেখেছিলাম মনে পড়ছে, প্রথম দিন আলাপের সময়।

অমন ভাল সুরকার একজন, অথচ তুমি তাকে অবহেলাই করেছ! প্রথম দিন মাত্র আলাপের পর আর তার সঙ্গে আলাপ জমাবারই চেষ্টা করনি—কে—কে ওখানে?

আজ্ঞে স্যার আমি—

অন্ধকারে কিরীটীর প্রশ্নে দুটো বাড়ির মধ্যবর্তী স্থান থেকে কে একজন আত্মগোপন-কারী বের হয়ে এল আলো-আঁধারি থেকে নিঃশব্দে।

সুদর্শন চমকে ওঠে আগন্তুককে চিনতে পেরে যেন।

মানুষটি আর কেউ নয়, ব্যায়ামপুষ্ট তাগড়াই চেহারার অন্নপূর্ণা জুট মিলের লেবারার হীরু সাহা—যাকে ঘিরে প্রথম দর্শন থেকেই সুদর্শন একটু বেশি মাত্রায় সন্দিগ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু অতঃপর সব যেন কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে সুদর্শনের।

সুদর্শন যেন বোবা।

হারু সাহা তখন কিরীটীকে বলছে চাপা গলায়, দেখলেন স্যার, আমি আপনাকে বলিনি!

হ্যাঁ। এখন দেখছি, তুমি ঠিকই বলেছিলে হীরুবাবু। তা কোন পথে ফিরল? এই পথেই নাকি? কিরীটী শুধায়।

বলতে পারি না স্যার। ফিরতে আমি দেখিনি।

ওই বাড়িতে পিছন দিয়ে ঢোকবার আর কোন রাস্তা আছে?

তা একটা আছে স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর হীরুবাবু। চল হে সুদর্শন!

কোথায়? সাবিত্রীদের বাড়িতে এই রাত্রে হানা দেবেন নাকি এখন?

সেটা কি ভাল দেখাবে হে! তার চাইতে চল দেখি, মিত্র মশাইকে দিয়ে যদি সাবিত্রী দেবীকে তার ওখানেই ডেকে আনানো যায় একবার! এস।

সুদর্শন এগিয়ে গেল কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই।

সুবোধ মিত্রের বাড়ির সামনে এসে ওরা তিনজনে দাঁড়ালে।

সদর দরজা বন্ধ। কিরীটী এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা দিল। কিন্তু দুবার ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও দরজা খুলল না। বেহালার বাজনাও থামল না।

সুদর্শন এবারে কিরীটীর ইঙ্গিতে বেশ জোরেই দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে সুবোধবাবু—ও মশাই সুবোধবাবু, দরজাটা খুলুন!

এবারে বাজনা থেমে গেল। একটু পরে দরজাও খুলে গেল।

আলোকিত কক্ষের খোলা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে সুবোধ মিত্র। পরনে একটা লুঙ্গি, গায়ে একটা শাল জড়ানো।

কে?

আমি সুদর্শন মল্লিক, থানা ও-সি—

আসুন, আসুন। কি ব্যাপার মল্লিক মশাই—এত রাত্রে ?

একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। চলুন ভেতরে।

সুবোধ মিত্র দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, সকলে ভেতরে প্রবেশ করল। প্রথমে সুদর্শন, তার পশ্চাতে কিরীটী ও সুব্রত।

সুদর্শনের সঙ্গে আরও দুজন অপরিচিত ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সুবোধ মিত্র হঠাৎ যেন কেমন একটু বিস্মিতই হয়েছে, তার মুখের চেহারা দেখে মনে হল।

সুদর্শনবাবু, এঁরা ? সুবোধ মিত্র প্রশ্ন করে।

সুদর্শন বলে, এঁকে দেখেননি হয়ত, তবে নাম নিশ্চয়ই এঁর শুনেছেন সুবোধবাবু ! কিরীটী রায়—আর উনি সুব্রত রায়।

নমস্কার। সুবোধ মিত্র হাত তুলে নমস্কার জানায়।

কিরীটীও প্রতিনমস্কার জানায়।

কিরীটী হঠাৎ প্রশ্ন করে সুবোধ মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে, বাইরে তো বেশ ঠাণ্ডা, আপনার কপালে দেখছি ঘাম ! এত শীতেও ঘামছেন আপনি ?

সুবোধ মিত্র তাড়াতাড়ি কম্পিত হাতে কপালের ঘামটা মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে করতে বলে, ওই মানে—আমার বরাবরই একটু গরমটা বেশি—

তাই দেখছি। কিরীটী কথাটা বলে মৃদু হাসল।

॥ তেত্রিশ ॥

কিরীটীর দুটি চোখের সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু কথার মধ্যেও ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আবার সুবোধ মিত্রের খালি পায়ের দিকে তাকিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনি বুঝি বাড়িতে খালি পায়েই থাকেন সাধারণত কোন চটি বা চপ্পল দেখছি না ঘরে ?

চপ্পল—মানে, ওই বাইরের বারান্দাতেই আছে।

সুব্রত আর সুদর্শন দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিরীটীই আবার প্রশ্ন করে, কিন্তু হাতে আপনার অত তেল-ময়লা লেগে আছে কেন সুবোধবাবু ?

কিরীটীর কথায় সকলেরই নজর পড়ে, সুবোধ মিত্রের হাত দুটো—দুই হাতের পাতা ও আঙুলেই তেল-কালি-ময়লা লেগে আছে।

সুবোধ মিত্র যেন হঠাৎ কেমন বোবা হয়ে গেছে।

ফ্যালফ্যাল করে প্রশ্নকারী কিরীটীর মুখের দিকে একবার তাকায়, তারপরই নিজের কালি-তেল-ময়লা মাখা হাত দুটোর দিকে তাকায়।

এত রাত্রে হাতে আপনার তেল-কালি-ময়লা লাগল কি করে সুবোধবাবু?

ঐ মানে—ফিরে এসে একটা মেসিন সারাচ্ছিলাম—

মেসিন, কিসের মেসিন?

ঐ—

কিরীটীর স্বর হঠাৎ গম্ভীর শোনাল এরপরে যখন সে বললে, তাড়াতাড়িতে হাত দুটোও সাফ করবার সময় পাননি মনে হচ্ছে!

না না, তা নয়—

তবে?

কিরীটীর দুটি শ্যেন চক্ষুর দৃষ্টি সুবোধ মিত্রের ওপরে স্থিরনিবদ্ধ—মিত্র মশাই, একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন যে?

কি বলছেন?

আমি যে কি বলছি, শান্ত কঠিন গলায় কিরীটী বলে, আপনার না বোঝবার কথা নয়। বুঝতে পারছেন না—হাতে ঝুল-কালি, কপালে ঘাম! বেহালার হাতটি আপনার সত্যিই মিষ্টি মিত্র মশাই, কিন্তু সুরসৃষ্টি করে নিজেকে আপনি আড়াল করতে পারেন নি, কারণ সুরের মধ্যে তাল কেটে যাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে—

কি বলছেন, তাল কেটে যাচ্ছিল—

হ্যাঁ, বুঝতে পারেননি! কিন্তু কেন বলুন তো? অবিশ্যি অশান্ত মনে, উদ্বেগে সুর সৃষ্টি হয় না, তালও কাটতে পারে—

আজ্ঞে—

তা হলেও আই মাস্ট প্রেজ ইয়োর নার্ভ সুবোধবাবু!

সুদর্শনবাবু, এসবের মানে কি—আমি জানতে পারি কি? রুক্ষ গলায় সুবোধ মিত্র প্রশ্ন করে, কেন এভাবে আপনারা মাঝরাতে আমার বাড়িতে ঢুকে—

জবাব দিল কিরীটী। তীক্ষ্ণ শাণিত কণ্ঠস্বরে বললে, শুনুন মিত্র মশাই, অকারণে উনি আসেননি এই মধ্যরাত্রে এখানে—আপনার নামে গুরুতর অভিযোগ আছে—

অভিযোগ! হোয়াট ডু ইউ মীন? কিসের অভিযোগ?

গত তিন বছর ধরে এ তল্লাটে ওয়াগন ভেঙে যে সব মালপত্র চুরি যাচ্ছে ইয়ার্ড থেকে—সেই দলেরই রিং-লিডার হিসেবে আপনাকে উনি গ্রেপ্তার করতে এসেছেন।

কি পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছেন মশাই? ওয়াগন ভেঙে মাল চুরি করেছি আমি?

সুবোধবাবু! কিরীটী আবার বলে, আপনি যদি জানতেন কার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করছেন গলা চড়িয়ে, তার সত্য পরিচয়টা—

থামুন মশাই, থামুন।

সুদর্শন ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল। ব্যাপারটা তখনও যেন তার স্বপ্নেরও অতীত।

শেষ পর্যন্ত ওই সুবোধ মিত্র!

কিরীটী বলতে থাকে, শুধু তাই নয় মিত্র মশাই, ওইটি ছাড়াও আর একটি গুরুতর অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আছে, মাধবীকে হত্যা করেছেন আপনিই।

থামবেন মশাই! এটা আমার বাড়ি—পাগলা গারদ নয়!

কিন্তু সুবোধ মিত্রের কথাটা শেষ হল না সহসা খোলা দরজার ওদিক থেকে এক নারী-কণ্ঠস্বর ভেসে এল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন। ও-ই দিদিকে খুন করেছে।

কে? এ কি, সাবিত্রী!

বিস্মিত হতভম্ব সুদর্শনের কণ্ঠ থেকে একটা অস্ফুট শব্দের মত কথাগুলো স্বতঃ উচ্চারিত হল যেন।

সাবিত্রী তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে।

সাবিত্রী? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সুবোধ মিত্র।

করুন—করুন সুদর্শনবাবু, ওকে গ্রেপ্তার করুন। সাবিত্রী বলে, ও-ই আমার দিদিকে হত্যা করেছে। একসঙ্গে দুজনে সে-রাত্রে দিদির নেশা ভাঙবার পর ফিরেছে জানি, আমি সব জানি—শয়তান, খুনী! তোমার—তোমার ফাঁসি হোক, এই আমি চাই।

তবে রে হারামজাদী—

সহসা বাঘের মত সুবোধ মিত্র সাবিত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা দু'হাতে চেপে ধরে।—খুন করব তোকে আজ।

সুব্রত প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় একটু হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সুবোধ মিত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা জুজুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে তাকে ফেলে দেয়।

সাবিত্রীও পড়ে যায় ওই সঙ্গে।

কিন্তু সুবোধ মিত্র তখন যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে এবং সুব্রত বুঝতে পারে সুবোধ মিত্র লোকটা গায়ে যথেষ্ট শক্তি ধরে। সুব্রত তাকে জাপটে ধরেছিল, কিন্তু সুবোধ

মিত্র সুব্রতর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় এবং খোঁচা খাওয়া হিংস্র বাঘের মত সুবোধ মিত্র সুব্রতর কবলমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের কোণে যে বড় ফ্লাওয়ার ভাসে একগোছা রজনীগন্ধা ছিল, সেটার মধ্যে চকিতে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা অটোমেটিক পিস্তল বের করে সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে পর পর দুটো গুলি চালায়।

একটা গুলি মিস করে, কিন্তু অন্যটা সাবিত্রীর ডান হাতে বিদ্ধ হয়।

চিৎকার করে ওঠে সাবিত্রী।

ইতিমধ্যে সুদর্শনও তার পকেট থেকে পিস্তল বের করেছিল, কিন্তু মাঝখানে সাবিত্রী থাকায় সে গুলি চালাতে পারে না। সাবিত্রী টলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুদর্শন সুবোধ মিত্রের হাত লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

সুবোধ মিত্রের হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়।

সেই অবসরে সুব্রত ঝাঁপিয়ে পড়ে সুবোধ-মিত্রকে দু'হাতে সবলে জাপটে ধরে।

॥ চৌত্রিশ ॥

এবারে আর সুবোধ মিত্র সুব্রতর কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও সফল হয় না।

সুদর্শনও ইতিমধ্যে এগিয়ে আসে সুব্রতর সাহায্যে।

বাইরে দুজন প্রহরী পূর্ব হতেই কাছে মোতায়েন ছিল। কিরীটীর নির্দেশে তাকে ডেকে তাদের সাহায্যে সুবোধ মিত্রের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল সুব্রত।

সুবোধ মিত্র এতক্ষণে চুপচাপ হয়ে যায়।

সুদর্শন সাবিত্রীর ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করছিল।

কিরীটী বললে, তুমি ডাক্তার নও ভায়া, চটপট ওকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

আমার জীপটা নিয়ে আসি। সুদর্শন বলে।

তাই যাও।

আহত সাবিত্রীকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে সুদর্শনের সঙ্গেই কিরীটী পাঠিয়ে দেয় পুলিসের জীপে।

রাত তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে। দশ নম্বর পল্লীতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অনেকেরই ইতিমধ্যে গোলমালে ও গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সবাই ছুটে আসে সুবোধ মিত্রের বাড়ির আশেপাশে।

কিরীটী বললে, এখানে আর নয়—চল সব থানায় যাওয়া যাক।

সকলে অতঃপর হাতকড়া-পরা সুবোধ মিত্রকে নিয়ে থানার দিকে অগ্রসর হল।

বহু লোক থানার আশেপাশে এসে ভিড় করে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

কিরীটী আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

সেই ব্যবস্থা মতই খগেন পাঠক, কল্যাণ বোস অবিনাশ ও নরহরি সরকারকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

একটা বেঞ্চে সবাই পাশাপাশি বসে সশস্ত্র পুলিস প্রহরায়। সুবোধ মিত্রকে থানায় কয়েদ-ঘরে হাতকড়া পরিয়ে আর্মড পুলিস প্রহরায় রাখার ব্যবস্থা হল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সুদর্শন হাসপাতাল থেকে ফিরে এল।

ব্যবস্থা করে এলে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ দাদা। সাবিত্রীকে ও, টি-তে নিয়ে গিয়েছে, খুব ব্লিডিং হচ্ছে।

ভয় নেই। মনে হয় মারাত্মক কিছু নয়। দেখ তো ভায়া, একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

এখুনি ব্যবস্থা করছি।

সুদর্শন ভিতরে চলে গেল।

আরও আধ ঘণ্টা পরে থানায় সুদর্শনের অফিস ঘরের মধ্যে।

রাত তখন সোয়া বারোটা হবে।

কিরীটী, সুব্রত, কল্যাণ মিত্র ও সুদর্শন বসেছিল থানায় সুদর্শনের অফিস ঘরে।

কিরীটী একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে গোটা দুই টান দিয়ে বলে, এখন তো বুঝতে পারছ সুদর্শন, তোমারও ঠিক সেই কথামালার একচক্ষু-হরিণের দশা হয়েছিল! সব দিকেই তুমি নজর দিয়েছিলে—দাওনি কেবল মিত্র মশাইয়ের দিকে!

আমি সত্যি বলছি, কল্পনাও করতে পারিনি দাদা যে ওই সুবোধ মিত্রের মত একজন ভদ্রলোক, মিষ্টভাষী, শিক্ষিত শিষ্টাচারী—

সুদর্শনকে বাধা দিয়ে কিরীটী বলে, প্রজাপতির রঙটা দেখেই তুমি ভুলেছিলে ভায়া, কিন্তু সেই মন-মাতানো রূপের পেছনে যে কাঁটাওলা শুঁয়োপোকার একটা ইতিহাস থাকে, সেটা একবারও মনে পড়ল না কেন তা তুমিই জান।

মাথা নিচু করে সুদর্শন।

কিরীটী বলে, অবশ্য এও সত্যি, আমি আশা করিনি, মিত্র মশাই আমার পাতা ফাঁদে অত সহজে অমন করে এসে আজ পা বাড়াবেন! ভাবছিলাম পর পর দুটো

খুন হয়ে গেল, এখন কিছুদিন হয়ত মিত্র মশাই একটু সাবধানে পা ফেলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু লোভ বড় সাংঘাতিক বস্তু। বুকের মধ্যে লোভের আগুন একবার জ্বললে সহজে নিভতে চায় না। আর লোভের ধর্মই হচ্ছে হাত সে বাড়িয়েই চলে।

কিন্তু দাদা—,সুদর্শন যেন কি বলবার চেষ্টা করে।

কিরীটী তাকে বাধা দিয়ে বলে, অবিশ্যি শুধু লোভই নয়, তার পরম আত্মম্ভরিতাও সুবোধ মিত্রকে আজ রাত্রে চরম সর্বনাশের মধ্যে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

আপনি কি দাদা, সুদর্শন আবার বলে, প্রথম থেকেই সুবোধ মিত্রকে সন্দেহ করেছিলেন?

হ্যাঁ, কতকটা বলতে পার। তবে অবশ্যি আমার মনের সিক্সথ সেন্স কাজ করেছিল— একটু থেমে কিরীটী আবার বলে, তুমি জান না, তোমাকে বলিওনি— এ অঞ্চলের ওয়াগন থেকে মাল চুরি যাবার রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারটা তোমাদের উপরওয়ালার একান্ত অনুরোধে হাতে নেওয়ার পরই এখানে এসে আমি ছদ্মবেশে দশ-বারো দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

আশ্চর্য! সুদর্শন বলে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ, কেন জানাইনি—জানতে তোমাকে দিইনি কেন জান? কারণ তুমি জানা মানেই সুবোধ মিত্র ও তার দলবলও জানতে পারা।

কিন্তু—

বুঝতে পারছ না, কেন? আমার এ তল্লাটে আনাগোনা শুরু হয়েছে আর কেউ না জানুক সুবোধ মিত্র জানতে পারতই। তার ফলে যা হবার তাই হত—অর্থাৎ দশ-জোড়া চোখ সর্বক্ষণ তোমাকে পাহারা দিত এবং তার দলবল সতর্ক হয়ে যেত। যেটা আমি আদৌ চাইনি—আর তাতে করে অনুসন্ধানের ব্যাপারটাও চালানো এত সহজে যেত না। কিন্তু যা বলছিলাম, একা তো আমার পক্ষে সব সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এবং এ তল্লাটে অনুসন্ধানের কাজ গোপনে চালাতে হলে এমন একজনকে চাই যে এ তল্লাটেরই একজন। অথচ বিশ্বাসী কে এমন আছে—কাকে পাই? খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম গোপনে গোপনে। এখানকার রেস্টুরেন্টের গোলাব সিং আমার দীর্ঘ-দিনের পরিচিত, তাকেই ধরলাম ঐ ব্যাপারে। সে-ই আলাপ করিয়ে দিল আমায় হীরু সাহার সঙ্গে। বললে, সাচ্চা আদমী, বিশ্বাসী। হীরু সাহাকেই দলে নিলাম।

আশ্চর্য! অথচ হীরুর প্রতি আমার—

বরাবরই একটা সন্দেহ ছিল, তাই না ভায়া? না হে, গোলাব সিং মিথ্যা বলেনি —লোকটা শুধু সৎ-ই নয় সরল। তবে হ্যাঁ, একটু রাগী গোঁয়ারগোবিন্দ টাইপের—

অবিশ্যি সেইখানেই হীরুর চরিত্র সম্পর্কে তোমার ভুল হয়েছিল।

তারপর ?

তার পর থেকে হীরুই সব সংবাদ আমাকে সরবরাহ করত—এতে একটা সুবিধা হয়েছিল আমার—

কি ?

হীরু দশ পল্লীরই একজন ও গুণ্ডাপ্রকৃতির বলে তার উপরে কারও সন্দেহ পড়েনি।

তারপর ?

হীরু সাহাকে দলে পাওয়ায় আমার আরও একটা সুবিধা হয়েছিল।

কি ?

হীরুকে পল্লীর কেউ চট্ করে ঘাঁটাবার সাহস পেত না। সে-ই আমাকে একটা বিশেষ সংবাদ দেয়—

বিশেষ সংবাদ ?

হ্যাঁ, মাধবী-হত্যার রাত্রে সে মাধবী ও একজনকে মাঠের দিকে যেতে দেখেছিল গোটা বারোর সময়। মাধবীকে সে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু অন্যজনকে পারেনি—

থামলেন কেন, বলুন দাদা। সুদর্শন বলে।

ইতিমধ্যে সব ব্যাপারটা আগাগোড়া পর্যালোচনা করে একটা কথা আমার মনে হয়েছিল—

কি ? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

কিরীটী বলতে থাকে সুদর্শনের প্রশ্নের জবাবে।

প্রথমতঃ, ইয়ার্ড থেকে ওয়াগন ভেঙে মাল সরানোর ব্যাপারে যারা জড়িত, তাদের সঙ্গে হয় ওই দশ নম্বর পল্লীর কারো-না-কারোর সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে; নয়ত দশ নম্বর পল্লীরই লোক তারা।

এবং দ্বিতীয়তঃ, পর পর যে হত্যাগুলো এ তল্লাটে সংঘটিত হয়েছে, সে হত্যা-ব্যাপারগুলো পৃথক কিছু নয়—ওই ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারেরই খণ্ডাংশ বা ওরই সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

কাজেই সর্বাগ্রে তখন যে কথাটা আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে ওই দশ নম্বর পল্লী

থেকেই আমায় অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। করলামও তাই। এবং ভাগ্যক্রমে, আগেই বলেছি, হীরু সাহাকে সাহায্যকারী পেয়ে গিয়েছিলাম—

কিন্তু সুবোধ মিত্রকে সন্দেহ করলেন কেন?

প্রথমে তার ওপর আমার সন্দেহ হয়নি। সন্দেহটা প্রথম জাগে মাধবীর মৃত্যুর পর।

কেন?

কারণ হারু সাহার মুখে যে কথাটা আগে শুনেছিলাম, তাছাড়াও আরও দুটো সংবাদ তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম—

কি সংবাদ?

প্রথমতঃ, বাইরে দশ নম্বর পল্লীর সবাই যদিও জানত, সুবোধ মিত্রের সঙ্গে মাধবীর কোন যোগাযোগ ছিল না সেটা সত্য নয়, আসলে মাধবীই ছিল সুবোধ মিত্রের দক্ষিণ বাহু। এবং শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে ভায়া—

কি?

আসলে সুবোধ মিত্রের রক্ষিতা ছিল মাধবী—

সে কি! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে সুদর্শন।

জানতাম কথাটা শুনে তুমি বিস্ময়ের প্রচণ্ড এক ধাক্কা খাবে। কিন্তু কথাটা নির্মম সত্য। বাইরে সে দেখাত বটে সুবোধ মিত্রকে ঘৃণা করে, এবং সুবোধ মিত্রও তার সঙ্গে যে কোন যোগাযোগ আছে হাবেভাবে আদৌ তা প্রকাশ করত না। কিন্তু হলে কি হবে, সকলের চোখে তারা ধুলো দিলেও একজনের চোখে তারা ধুলো দিতে পারেনি—সে সবই জানত—বলতে পার জানতে পেরেছিল—

কে?

বল তো কে?

কে?

তোমার সাবিত্রী।

বলেন কি দাদা! সাবিত্রী জানত?

হ্যাঁ ভায়া, জানত। ভুলে যাচ্ছ কেন, একঘরে তারা শুতো। দুই বোন। আর সুবোধ মিত্র ছিল তাদের ঠিক নেক্সট-ডোর নেবার। মাধবীর হত্যার রাত্রে তাই সাবিত্রী জেগে ছটফট করছিল তার দিদির প্রতীক্ষায়। কারণ সে তো জানতই যে মধ্যে মধ্যে তার দিদির বাড়ি ফিরতে রাত হয় এবং তার কারণ থিয়েটার বা রিহার্সাল নয়—সুবোধ মিত্র—

আশ্চর্য!

এখনও তোমার বয়স অল্প, অভিজ্ঞতাও তোমার সামান্যই ভায়া। তাই তুমি জান না নারীচরিত্র কি দুর্জ্ঞেয়, কি বিচিত্র!

সুদর্শন আবার তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে, আশ্চর্য! সাবিত্রী জানত, অথচ—

অথচ তোমাকে সে বলেনি। আরে গর্দভ, এটা বুঝতে পারছ না কেন, কিরীটী সুদর্শনকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে, প্রথম প্রেমের মুহূর্তে কোন মেয়ে কখনও তাদের সংসারের লজ্জার কথা মুখ ফুটে প্রেমাস্পদের কাছে বলে না—বলতে পারে না।

কিন্তু দাদা—

ভয় নেই ভায়া, সাবিত্রী খাঁটি হীরে। অপাত্রে তুমি হৃদয় দান করোনি। কিরীটী হাসতে হাসতে বলে।

সুদর্শনের মুখটা সহসা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সে আর কিরীটীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না।

কিরীটী বলে, মনে আছে তোমার, মাধবী হত্যার রাত্রে সাবিত্রী তার দিদির অপেক্ষায় জেগে থাকতে থাকতে নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হ্যাঁ।

আসলে তা নয়।

তবে?

ইদানীং পতিতবাবুর স্ত্রী—ওদের মা, মাধবীর গতিবিধি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই সাবিত্রী ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল—এবং সম্ভবতঃ সুবোধ ও সাবিত্রীকে একত্রে দেখেছিল।

কিরীটী আবার বলতে শুরু করে, থাক্ যা বলছিলাম, সাবিত্রী ভয়েও খানিকটা মুখ খুলতে পারেনি। মিত্র মশাইটি তো আমাদের সহজ চীজ নন!

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে শুরু করে, মাধবীর সঙ্গে মিত্র মশাইয়ের যোগাযোগের ব্যাপারটা যেমন আমাকে চমকে দেয়, ঠিক তেমনি নরহরি সরকারের ওখানে মাধবীর যাতায়াতটাও দুইয়ে দুইয়ে চারের মত মিত্র মশাইয়ের প্রতি মনটা আমার আরও সন্দেহযুক্ত করে তোলে। আর ওই শেষোক্ত কারণেই মিত্র মশাইয়ের ওপর আমার সমস্ত সন্দেহটা গিয়ে পড়ে। তারপরই আমি মিত্র মশাইয়ের ওপর কড়া নজর রাখি।

॥ ছত্রিশ ॥

কিন্তু সুবোধ মিত্রই যে দোষী, সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হল কখন ? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

গুলজার সিংয়ের মৃত্যুর পর। কিরীটী জবাব দেয়।

কেন ? প্রশ্নটা করে সুদর্শন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

তোমার হয়ত মনে আছে সুদর্শন, মৃত গুলজার সিংয়ের মুঠির মধ্যে একটুকরে সাদা পশম পেয়েছিলে—পরে যেটা তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে !

হ্যাঁ।

সেই পশমটুকুই আমার দৃষ্টির সামনে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিল।

কি রকম ?

মিত্র মশাইকে তুমি ভাল করে স্টাডি করতে—বিশেষ তার বেশভূষা, তাহলেই নজরে পড়ত তোমার, সাদা রঙের ওপর তার একটা স্বাভাবিক প্রশ্রয় আছে। সাদা ভয়েল পাঞ্জাবি, সাদা শাল, সাদা উলের সোয়েটার। ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

ওই সাদা পশমটুকু গুলজার সিংয়ের হাতের বড় বড় নখে আটকে গিয়েছিল হয়ত ধস্তাধস্তির সময় এবং পশমটুকু মিত্র মশাইয়ের সে-রাত্রে যে গরম হাতে-বোনা সোয়েটারটা ছিল তা থেকেই ছিঁড়ে এসেছিল।

হয়ত গুলজার সিংয়ের সঙ্গে সে-রাত্রে মিত্র মশাইয়ের মারামারির মত কিছু একটা হয়েছিল প্রথমে, তারপরই হয়ত প্রথম সুযোগেই ক্লোজ রেঞ্জ থেকে মিত্র মশাই গুলজারকে গুলি করে হত্যা করে। অবিশ্যি তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি উণ্ডের গায়ে কার্ব ডিপজিট থেকে।

গুলজার সিংও তাহলে ওই দলের ?

নিঃসন্দেহে। নচেৎ বোম্বাই ফিল্মে ফাইনান্স করবার মত অত টাকা সে কোথায় পেত ?

গুলজার সিংকে মিত্র মশাই কেন মেরেছেন বলতে পারেন দাদা ?

মনে নেই তোমার, গাড়িতে আসতে আসতে আজ রাত্রেই তোমাকে বলেছিলাম, গুলজার সিংয়ের ফ্ল্যাট সার্চ করতে গিয়ে তার ঘরে মাধবীর একটা ফটো পাওয়া গিয়েছে।

হ্যাঁ।

হয়ত সেই ফটোই হয়েছিল তারপর কাল। মাধবী ছিল মিত্র মশাইয়ের রক্ষিতা, কাজেই গুলজার সিংয়ের ঘরে যদি মাধবীর ফটো থাকে আর মিত্র মশাই কোনমতে

সেটা জানতে পারেন, ব্যাপারটা তিনি ভাল চোখে অবশ্যই দেখবেন না—দেখতে পারেন না। হয়ত ওই রকম কিছু হয়েছিল, যদিও সেটা আমার অনুমান—আর তাতেই হতভাগ্য গুলজার সিংকে প্রাণ দিতে হল। এবং সেটাই হল মিত্র মশাইয়ের সর্বাপেক্ষা বড় ভুল, সব চেয়ে বেশি অবিবেচনার কাজ।

কেন ?

কারণ গুলজার সিং নিহত না হলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত সমস্ত রহস্যটা চোখের সামনে আমার পরিষ্কার হয়ে যেত না। মিত্র মশাইয়ের ঝাপসা চেহারাটাও এত সহজে স্পষ্ট হয়ে উঠত না। এমনিই হয় সুদর্শন কোন গ্যাংয়ের মধ্যে কোন নারী থাকলে শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই নারীর সমস্ত গ্যাংটার মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। মিত্র মশাইয়েরও হল তাই।

আচ্ছা চোরাই মালের বেচা-কেনাটা কোথায় হল বলে আপনার মনে হয় দাদা ?

তা অবিশ্যি সঠিক জানি না, তবে এটা ঠিক একটা লভ্যাংশ নিয়ে মাল সব পাচার করত তোমার ঐ রাধেশ্যাম অর্থাৎ নরহরি সরকার। এবং মালের দাম হিসেবে টাকাকড়ি নয়, তাকে দিতে হত সোনার বার বা গিনি—গুনে গুনে। আর গিনিগুলো আসত ঐ মাধবীর হাত দিয়ে।

ক্রমশঃ এখন সব বুঝতে পারছি দাদা—

অথচ নরহরি জানত না, মাধবী কার হাতে গিনি বা সোনার বার পৌঁছে দেয়! সব কিছুর মূলে যে আছেন আমাদের মিত্র মশাই, সভ্যভব্য শিক্ষিত সুরকার শান্ত মানুষটি—নরহরি সেটা কল্পনাতেও কখনো আসেনি।

কিন্তু—

কেন আসেনি, তাই না ?

হ্যাঁ।

সে-কথা ভাববার তার সময় কোথায় ছিল! সে তো সর্বক্ষণ মাধবীকে পাওয়ার স্বপ্নেই মশগুল ছিল।

মাধবীরও তাহলে লুঠের মালের ভাগ ছিল ?

নিঃসন্দেহে। আর তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

কি প্রমাণ ?

কিরীটী বলে, তোমাকে সে-কথা বলা হয়নি, তার অফিসের ডেস্কে সেভিংস ডিপজিটের পাস বই পাওয়া গিয়েছে।

পাস বই !

হাঁা, আর সেই পাস বইয়ের মধ্যে কত জমা আছে জান ?

কত ?

তাতে জমা আছে ত্রিশ হাজার টাকা !

সত্যি ? বলেন কি দাদা ? কথাটা বলে সুদর্শন তাকায় বিস্ময়ে কিরীটীর দিকে।

খুব বিস্ময় লাগছে, তাই না ? হাসতে হাসতে কিরীটী বলে, পাখি হয়ত একদিন অকস্মাৎ ডানা মেলে তোমার ওই দশ নম্বর পল্লীর ছোট ঘর থেকে উড়ে যেত, তখন তুমি হয়ত কেবল ভাবতে মাধবী কারও সঙ্গে ভেগেছে। কিন্তু তুমি কল্পনাও করতে পারতে না, তার পশ্চাতে ফেলে যাওয়া তার সত্যকারের ইতিহাসটা।

তারপর ক্রমশঃ সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত একদিন কেবলমাত্র একটি মেয়ের গৃহত্যাগের ব্যাপারেই পর্যবসিত হত। কিন্তু বিধি হল বাম। বেচারী জানতেও পারেনি ইতিমধ্যে কখন তার ভাগ্যাকাশে ঘন কালো মেঘ সঞ্চারিত হয়েছে।

যাক, ভোর হয়ে এসেছে, আর এক প্রস্থ চায়ের যোগাড় কর, তারপর শুরু করা যাবে মিত্র মশাইকে জিজ্ঞাসাবাদ। দেখা যাক, ভদ্রমহোদয় মুখ তাঁর খোলেন কিনা।

সত্যিই ইতিমধ্যে কখন রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠেছে একটু একটু করে চারধারে।

সুদর্শন উঠে গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

চা-পানের পর আবার যখন সকলে একত্রিত হল, সকাল তখন ছটা প্রায়।

সকলে এসে পাশের ঘরে ঢুকল।

চারজন তখনো পাশাপাশি বেঞ্চের ওপরে বসে। কেবল তাদের মধ্যে একজন ছিল না ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে।

সুবোধ মিত্রের হাতে হাতকড়া লাগানো পুলিস-প্রহরায় তাকে ওদের চোখের আড়ালে থানার কয়েদঘরে রাখা হয়েছিল।

ওদের সকলকে ঘরে ঢুকতে দেখে নরহরি সরকারই প্রথমে বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বলে ওঠে, রাধেশ্যাম ! আমাদের এভাবে এনে থানায় আটক করে রাখবার কারণটা কি মল্লিক সাহেব ?

নরহরি সুদর্শনকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলে।

এখনও বুঝতে পারেননি, সরকার মশাই ! ব্যঙ্গভরা স্বরে সুদর্শন জবাব দেয়।

রাধেশ্যাম! আজ্ঞে না।

বোঝেননি?

না।

এখন বলুন তো সরকার মশাই, ওয়াগান ভেঙে যেসব মাল রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে চুরি যেত তার কি ব্যবস্থা আপনি করতেন?

রাধেশ্যাম! এসব কি বলছেন? ছি ছি, শোনাও পাপ। রাধেশ্যাম!

তাহলে তাই করবেন—সবাইকে তো চালান দিচ্ছি, গাওনা যা গাইবার আদালত কক্ষেই জজ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে করবেন সকলে মিলে। জমবে ভাল, যাত্রার দল তো আপনার তৈরী আছেই। সুদর্শন আবার বলে।

রাধেশ্যাম! সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিদের এইভাবে ধরে হেনস্থা করা—

অকস্মাৎ যেন সুদর্শন খিঁচিয়ে ওঠে নরহরির মুখের দিকে তাকিয়ে, থামুন চোর-চূড়ামণি! লজ্জা করছে না আপনার, এখনও মুখে রাধেশ্যাম বুলি কপচাচ্ছেন! আপনাকে গুলি করে মারা উচিত!

পিপীলিকা পাখা ধরে মরিবার আশাতেই। হঠাৎ খগেন পাঠক বলে ওঠে পাশ থেকে।

কিরীটীই এবারে কথা বলে, পাঠক মশাই এখনও হয়ত জানেন না আপনি, আপনার সাঙ্গপাঙ্গোরাই শুধু নন—আপনাদের দলপতিও ধরা পড়েছেন!

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদর্শনের যেন মনে হল, নরহরি ও কল্যাণ বোস চমকে উঠল।

কি কল্যাণবাবু, একেবারে যে চুপচাপ! সুদর্শন আবার বলে, সেদিন চোখে আমার খুব ধুলো দিয়েছিলেন!

আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন স্যার, এসবের মধ্যে আমি আদৌ নেই, বিন্দুবিসর্গও এসবের আমি জানি না। কল্যাণ বলে ওঠে।

কিছুই জানেন না!

আজ্ঞে বিশ্বাস করুন স্যার—

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি আসে-যায়! আদালতে হাকিম সাহেবকে যদি বিশ্বাস করাতে পারেন, তাহলেই হবে।

খগেন পাঠক অনুচ্চ কণ্ঠে ওই সময় বলে, শালা!

সুদর্শন হেসে ফেলে।

কিরীটী আবার বলে, এখনও সবাই আপনারা যে যতটুকু জানেন স্বীকার করুন

আইনের হাত থেকে—গুরুদণ্ড থেকে বাঁচতে চান !

অবিনাশ ওই সময় বলে ওঠে, ওই—ওই শালা পাঠকই যত নাটের গুরু। ওই-ই টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে ওদের দলে টেনেছিল।

আর আপনিও সুবোধ বালকের মত ভ্যান লুঠ করবার ব্যাপারে লেগে গেলেন, তাই না অবিনাশবাবু। এবং শুধু তাই নয়, নিজের মায়ের পেটের বোনটিও যে ওই দলে ভিড়েছে, জেনেও চুপ করে রইলেন ! বলে ওঠে সুদর্শন।

হঠাৎ যেন খগেন, অবিনাশ ও নরহরির মুখটা চুপসে গেল সুদর্শনের শেষ কথায়।

কি, মুখ শুকিয়ে গেল যে একেবারে অবিনাশবাবু আপনাদের ?

সুদর্শন ! কিরীটী ডাকল।

দাদা—

যাও, ওদের দলপতিকে ওদের সামনে এনে একবার দাঁড় করাতে বল।

সুদর্শন বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

ওরা সকলেই উপস্থিত পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

একটু পরে হাতকড়া পরা অবস্থায় সুবোধ মিত্রকে দুজন আর্মড কনস্টেবল ঘরে এনে ঢোকাতেই সকলের গলা থেকেই বিস্ময়ভরা স্বর নির্গত হয় একত্রে যেন।

নরহরি বলে, সুবোধ !

খগেন পাঠক বলে, সুবোধবাবু !

অবিনাশ বলে, সুবোধ !

কল্যাণ বসু বলে, সুবোধবাবু !

আর সুবোধ ওদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী বলে, কি হল সরকার মশাই, আপনার তো আজ অত চমকাবার কথা নয়। আপনি তো বোধ হয় দু-একদিন আগেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন !

রাধেশ্যাম ! তাহলে সত্যিই ডুবলাম ?

হ্যাঁ, একেবারে অগাধ জলে !

বুঝতে কারোরই আর কষ্ট হয় না, হাতকড়াবদ্ধ অবস্থায় ঐভাবে সুবোধ মিত্রকে সামনে দেখে ও কিরীটীর কথা শুনে সকলেরই মনোবল যেন ভেঙে গিয়েছে তখন।

কি, এবারে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আপনারা যে যা জানেন ! কিরীটী বলে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে।

সকলেই পর্যায়ক্রমে একে একে তখন নরহরির মুখের দিকে তাকাচ্ছে হন্তেদৃষ্টিতে।

কিরীটী ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বলে, মনে হচ্ছে আপনারা ঐ রাধেশ্যামকেই চিনতেন!

একে একে সকলেই স্বীকার করে, তারা নরহরিকেই চিনত। ওয়াগন ভেঙে মাল চুরি করে নরহরির নির্দেশমতই ট্রাকে মাল চালান করে দিত, তারপর নরহরিই সকলকে যা টাকা-পয়সা দেবার দিত।

নরহরি বললে, দোহাই ধর্মের, আমি বিশেষ কিছুই জানি না। মাল শুধু পাচার করে দিতাম মাধবীর নির্দেশমত এবং মাধবী যেমন যেমন বলে যেত তেমনিই করা হত। দোহাই হুজুরের। রাধেশ্যাম। আমি কখনও মাল চুরিও করিনি—মালে হাতও দিইনি।

হ্যাঁ, কেবল বেচা-কেনাটা করেছেন। কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

সুবোধ মিত্র কিন্তু একটি কথাও বললে না। মুখ বন্ধ করেই রইল আগাগোড়া।

বেলা দশটা নাগাদ পুলিস ভ্যানে চাপিয়ে হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি—সকলকে কলকাতায় লালবাজারে চালান করে দিল সুদর্শন।

দশ নম্বর পল্লীর ঘরে ঘরে তখন গুঞ্জন। সমস্ত পল্লীতে যেন সাড়া পড়ে গেছে।

আর একপ্রস্থ চা-পানের পর কিরীটী ও সুব্রত অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিল।

কল্যাণ মিত্র পুলিস ভ্যানের ইনচার্জ হয়ে গেল।

॥ আটত্রিশ ॥

দশ নম্বর পল্লীতে সুবোধ মিত্রের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে রীতিমত যেন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যেন সত্যিই কল্পনারও অতীত। সুবোধ মিত্রের মত একজন শিক্ষিত নির্বিরোধী ভদ্র যুবক—সে যে মালগাড়ির দরজা ভেঙে মাল পাচার করতে পারে ও মাধবী ও গুলজার সিংকে হত্যা করতে পারে অমন নৃশংসভাবে, ব্যাপারটা যেন পল্লীর সকলকে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। সকলের মুখেই এক কথা, শেষে ঐ সুবোধ—সুবোধের কাজ। তাও তো ভিতরের আসল ব্যাপারটা—মাধবীর সঙ্গে সুবোধ মিত্রের সত্যিকারের কি সম্পর্ক ছিল, সেটা কেউ জানতে পারেনি!

অবিশ্যি আর কেউ না জানতে পারলেও মাধবীর মা-বাবা জানতে পেরেছিলেন। দুজনেই যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। তার উপর বড় ছেলে অবিনাশ, সেও ঐ দলে ছিল—সে সংবাদটাও তাঁদের পক্ষে কম মর্মান্তিক ছিল না।

ঐ ঘটনার দিন-দুই পরে।

দুটো দিন সুদর্শন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল রিপোর্ট তৈরী করার ব্যাপার নিয়ে।

তৃতীয় দিন সকালের দিকে সুদর্শন কিরীটীর ফোন পেল।

কিরীটী বলে গিয়েছিল সুদর্শনকে, সন্ধ্যার দিকে যেন সে একবার তার ওখানে যায় তার এদিককার কাজকর্ম সেরে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সুদর্শন বের হল।

প্রত্যহই সাবিত্রীর খোঁজ নিয়েছে সে হাসপাতালে। সাবিত্রী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে। কিরীটীর ওখানে যাবার জন্য বের হয়ে প্রথমেই সুদর্শন গেল হাসপাতালে।

হাসপাতালের কেবিনেই কিরীটীর নির্দেশমতই সাবিত্রীকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিস-প্রহরার মধ্যে রাখা হয়েছিল।

বাইরের কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছিল না।

হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সাবিত্রী চোখ বুজে শয্যার ওপর শুয়ে ছিল।

সুদর্শন কেবিনে এসে প্রবেশ করল।

পদশব্দে সাবিত্রী চোখ খুলে সুদর্শনের দিকে তাকাল।

সাবিত্রী!

মৃদু গলায় ডাকল সুদর্শন শয্যার কাছে গিয়ে।

সাবিত্রী মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

কাছে গিয়ে পাশের টুলটায় বসে সুদর্শন সাবিত্রীর রুক্ষ চুলে একখানি হাত রেখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলে, কেমন আছ সাবিত্রী?

সাবিত্রী কোন সাড়া দেয় না। মুখটা ঘুরিয়েই থাকে।

কথা বলবে না সাবিত্রী! আমার দিকে তাকাও সাবিত্রী!

সাবিত্রী সাড়া দেয় না, মুখ ঘুরিয়েই থাকে।

সাবিত্রী, লক্ষ্মীটি শোন!

তবু সাবিত্রী সাড়া দেয় না।

তাকাও সাবিত্রী আমার দিকে। আবার বলে।

সাবিত্রী তথাপি নীরব, নিশ্চল।

এতক্ষণে সাবিত্রী মুখ ফিরিয়ে তাকাল সুদর্শনের দিকে। তার দু'চোখে জল।

সাবিত্রী।

কেন এসেছেন আপনি? ছি ছি, লোকে কি ভাববে—একজন স্মাগলারের বোন—

তার জন্যে তো তোমার কোন অপরাধ সাবিত্রী

না না। সাবিত্রী দু'হাতে মুখ ঢাকে।

সাবিত্রী, শোন—

না, না। আপনি যান—যান।

কিরীটী রায় বলেছেন, তুমি খাঁটি হীরে, নিষ্পাপ।

না না, আমি হীরে নই, নিষ্পাপও নই। আমারও দোষ ছিল।

কি দোষ ছিল তোমার ?

সব কথা আপনাকেও বলিনি—বলতে পারিনি—

বলনি ঠিকই, কিন্তু তাতে তোমার অপরাধটা কোথায় ?

অপরাধ নেই।

না।

আপনি বিশ্বাস করেন সে-কথা ?

করি।

সত্যি বলছেন ?

সত্যি বলছি।

কিন্তু কেউ তো সে-কথা বিশ্বাস করবে না। বলবে আমার বোন—আমার ভাই—

তোমার দিদি—তোমার দাদা যদি কোন অপরাধে অপরাধী হয়, তার জন্য তোমাকে কেন অযশ কুড়োতে হবে ?

হবে, আপনি জানেন না—

কিছু হবে না।

এ আপনি কি বলছেন ?

ঠিকই বলছি।

সাবিত্রীর দু'চোখে জল।

কান্নাঝরা গলায় বলে, কিন্তু এরপর কেমন করে আবার আমি ঐ পল্লীতে সবার সামনে ফিরে যাব !

ফিরবেই বা কেন সেখানে আবার তুমি ?

তবে কোথায় যাব ?

যদি তোমার আপত্তি না থাকে—

কি ?

আমার কাছে তুমি যাবে।

আপনার কাছে ?

হ্যাঁ, আমার ঘরে।

সাবিত্রীর দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটার ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

শোন সাবিত্রী, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলব। কালই ডি-সি'কে আমি আমাকে নতুন থানায় পোস্টিং করবার জন্য বলব। সেখানে নতুন কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি তুলব।

মা, বাবা—

অবশ্য তাঁদের মত নেব বৈকি। কি, রাজী তো?

সাবিত্রী কোন জবাব দেয় না, চোখ বুজিয়ে ফেলে।

সাবি।

ছোড়দা এসেছিল, কিন্তু তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি এরা—

দেয়নি?

না।

সুদর্শন বলে, যা ঘটে গিয়েছে তার জন্য তুমি নিজেকে বিব্রত বা অপরাধীই বা বোধ করছ কেন সাবিত্রী!

সাবিত্রী বললে, কেমন করে ভুলব বলুন তারা আমারই দিদি, আমারই দাদা—

তা হলেই বা। , ওসব চিন্তা তুমি মন থেকে তোমার মুছে ফেলে দাও। যা হয়ে গিয়েছে গিয়েছে, সামনে তোমার নতুন জীবন।

সাবিত্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, একটা কথা বলব?

বল।

বাবা সব জানেন? জানতে পেরেছেন?

যতটা শুনেছি বোধ হয় সব না হলেও কিছু কিছু জানতে পেরেছেন। সংসারে দুঃসংবাদ দেবারও লোকের অভাব হয় না সাবিত্রী। তাছাড়া দুঃসংবাদ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আর এখনও যদি নাও জানতে পেরে থাকেন সব কথা—কিন্তু আর চাপাও থাকতে পারে না, কানে যাবেই তাঁর।

জানি। আমি যদি হাসপাতালে না আসতাম হয়ত একটা ব্যবস্থা হত। আরও বাড়িতে এখন কেউ নেই—

কেন, তোমার ছোড়দা তো আছেন!

তা আছেন।

তবে?

ছোড়দা অত বুঝেসুঝে চলতে পারে না কোনদিনই, তাই ভাবছি—

কি?

বাবা হয়ত সব শুনলে আর বাঁচবেন না। দিদিকে যে তিনি কি ভালবাসতেন আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি। আর বাবা জানতে পারবেন বলেই এতদিন সব কিছু দিদির ব্যাপার জেনেও মুখ বুজে থেকেছি।

তোমার দিদি জানত যে তুমি সব জান?

বোধ হয় না।

আচ্ছা একটা কথার জবাব দেবে সাবিত্রী?

কি?

কেমন করে প্রথম তুমি জানতে পেরেছিলে সব?

হঠাৎ একদিন রাত্রে—

বল, থামলে কেন?

মধ্যে মধ্যে ফিরতে দিদির রাত হত, এমন কি কখনও কখনও রাত সাড়েবারোটা একটা। কেউ জানত না। আমিই সদর দরজা খুলে দিতাম দিদি ডাকলে। আমি যে তার পথ চেয়ে জেগে বসে আছি তা দিদি জানত না। সে জানত ঘুম আমার পাতলা, এক ডাকেই উঠে পড়ি। তাই যে রাত্রে ফিরতে দেরি হত, আমাকে বলে যেত। আর আমি এদিকে দিদি কখন ফিরবে সে আশায়—পাছে তার অত রাত্রে আসার কথা কেউ না জানতে পারে, পাছে দিদির ডাকাডাকিতে মা-বাবার ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে—জেগে বসে থাকতাম।

॥ উনচল্লিশ ॥

সুদর্শন একটু থেমে প্রশ্ন করে, তোমার দিদির সঙ্গে যে সুবোধবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল জানলে কি করে প্রথম?

সন্দেহ যে আমার ওদের হাবভাব দেখে হয়নি তা নয় তবে এতটা যে ভাবতে পারিনি কখনও।

তারপর?

এক রাত্রে, আমি জেগেই ছিলাম দিদির অপেক্ষায়, হঠাৎ দিদি ও সুবোধদার গলার স্বর আমার কানে এল। আমাদের দরজার বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে কথা বলছে—

তোমার দিদি আর সুবোধবাবু?

হ্যাঁ।

কি কথা বলছিল তারা ?

দিদি বলছিল, এবার যাও, সাবি জানতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে।

সুবোধদা হেসে জবাব দিল, কি আর কেলেঙ্কারি হবে! দু'চারটে সোনার গয়না দিলেই চুপ করে যাবে। তোমাদের মেয়েদের চরিত্র তো আমার কিছু জানতে বাকি নেই!

সবাই ভাবো মাধবী, তাই না সুবোধ? দিদি জবাব দিল।

ভাবি বৈকি। সুবোধদা বললে।

তারপর সুবোধদা চলে গেল, দিদিও এসে দরজায় টোকা দিল। আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম। তা সত্ত্বেও ওদের মধ্যে যে অতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বুঝতে পারিনি—সাবিত্রী চুপ করল।

বল, থামলে কেন ?

সাবিত্রী বলতে লাগল, দিন কয়েক বাদে অমনি এক রাত্রে দিদির অপেক্ষায় জেগে আছি, হঠাৎ ওদের দুজনের গলার স্বর কানে এল। কি খেয়াল হল, জানলা দিয়ে উঁকি দিলাম—জ্যোৎস্না ছিল অল্প অল্প সে-রাত্রে, রাত বারোটা বেজে গিয়েছে, দেখলাম—

কি ?

সুবোধদা—

বল, বল !

সুবোধদা দিদিকে দু'হাতে বুকে জাপটে ধরে—, সাবিত্রী আর বলতে পারে না, থেমে গেল। একটু থেমে আবার সাবিত্রী বলতে শুরু করে, আর এক রাত্রে—

কি ?

অমনি জেগে ছিলাম, হঠাৎ দিদি আর সুবোধদার গলা শোনা গেল। শুনলাম দিদিকে সুবোধদা বলছে, কাল একবার রাত্রে রাধেশ্যামের সঙ্গে দেখা করো, গতবারের মালের টাকা এখনও দেয়নি—

এবারে কি মাল ও পাচার করেছে ? দিদি শুধায়।

সুবোধদা জবাব দেয়, দশ পেটি টোরসিন ও সিল্ক—বেশ মোটা দাও—

ব্যাপারটা কিন্তু খুব risky সুবোধ—

ধ্যাৎ, no risk—no gain! বেঁচে থাক railway yard—যাক যা বললাম মনে থাকে যেন, বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার মাল হবে—অনেক টাকা পাব শালার কাছে—

দিদি তারপরই বললে, যাই বল সুবোধ, আমার বড্ড কেন যেন ভয় করে ওর কাছে যেতে রাত্রে—

কেন ?

ও এমন শকুনের মত আমার দিকে তাকায় !

দোব হারামজাদার চোখ দুটো একদিন লোহার শলা দিয়ে গেলে। দিতামও—কেবল লোকটা বিশ্বাসী, তাই চুপ করে আছি।

তারপরই দিদি বললে, গতবার তুমি আমাকে কিছুই দাওনি—

দোব। এবারে এক থোকে দু'হাজার দোব। সুবোধদা হাসতে হাসতে দিদিকে বললে।

শুনতে শুনতে আমি তখন যেন পাথর হয়ে গেছি। বলতে লাগল সাবিত্রী।

তারপর ?

ঐ ঘটনারই দিন দুই বাদে হঠাৎ একদিন দিদির ব্যাগে দেখি দুটো সোনার বার আর আশিটা গিনি। আমার কিছুই আর তখন জানতে বাকি থাকে না।

আশ্চর্য ! সুদর্শন বলে।

কি ?

কিরীটী কিন্তু একেবারে ঠিক ঠিক অনুমান করেছিল !

কিরীটী কে ?

আমার দাদা—কিরীটী রায়, বিখ্যাত সত্যসন্ধানী। সেদিন রাত্রে সুবোধের বাড়ি রেড করবার সময় যাকে আমার পাশে দেখেছিলে—লম্বা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা—

হঠাৎ সাবিত্রী বলে, একটা কথা বলব ?

কি ?

আমাকেও বোধ হয় বিচারের সময় আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে ?

কেন ?

আমারই তো ভাই-বোন ছিল তারা। তাছাড়া—

তা কেন হবে ?

সুবোধদা যদি আদালতে দিদির কথা তোলে ?

মনে হয় তুলবে না। তবে যদি তোলেই, তোমাকে যাতে না যেতে হয় সেই চেষ্টাই করা হবে। তাছাড়া তোমার নাম রিপোর্টে কোথাও নেই—থাকবেও না।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

সত্যি বলছ ? আদালতে আমাকে যেতে হবে না ?

না।

কিন্তু—

বল।

মা-বাবা—

না, তাঁদেরও যাতে না যেতে হয় সেই ব্যবস্থাই করা হবে। তবে—

তবে কি?

তোমার ছোড়দাকে হয়ত একবার যেতে হতে পারে।

সাবিত্রী হাত বাড়িয়ে সুদর্শনের একটা হাত চেপে ধরে।

আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে। আদালতের কথা ভাবতে ভাবতে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল এ কদিন।

এখন আর ভয় নেই তো? সুদর্শন মৃদু হেসে সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

না।

সত্যি বলছ?

সত্যি।

একটু পরে আবার সুদর্শন মৃদু গলায় ডাকে, সাবিত্রী!

সাবিত্রীর একটা হাত তখনও সুদর্শনের হাতের মধ্যে ধরা।

সাবিত্রী!

বল।

এবারে তাহলে আমি উঠি আজকের মত?

যাবে!

হ্যাঁ।

কাল আসবে না?

আসব বৈকি।

কখন?

বিকেলে।

॥ চল্লিশ ॥

হাসপাতাল থেকে যখন বের হল সুদর্শন, বিকেলের আলো মিলিয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে যেন একটা খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছিল।

সাবিত্রী—তার সাবিত্রী—আজ বুঝতে কষ্ট হয়নি তার সাবিত্রী তার প্রতি আসক্তা। তাই কেবল নয়—এক-একবার মনে হয় সুদর্শনের, কিরীটীর ওখানে আজ আর যাবে না, এখানে-ওখানে খানিকটা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—

তারপরই আবার মনে হয়, কিরীটী তাকে যেতে বলেছে—না গেলে সে অসন্তুষ্ট হবে।

মনের মধ্যে যেন একটা সুর গুনগুনিয়ে চলেছে।

কিরীটীর গৃহে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল সুদর্শনের।

সুদর্শন কিরীটীর মেজোনিন ফ্লোরের ঘরের কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিতেই স্মিতকণ্ঠে কিরীটী আহ্বান জানাল, এস, এস ভায়া! তারপর সংবাদ সব শুভ তো?

কিসের সংবাদ দাদা?

যে সংবাদের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় আছি! কিরীটী বলে হাসতে হাসতে।

তা না বললে বুঝব কি করে?

বুঝতে পারছ না? কোন্ সংবাদের জন্য অধীর হয়ে আছেন?

না।

কৃষ্ণা!

কিরীটী কৃষ্ণার মুখের দিকে এবারে তাকাল।

তুমিই তাহলে সংবাদটা নাও।

কৃষ্ণাও ঘরে ছিল। সে বললে, হাসপাতালে গিয়েছিলেন সুদর্শনবাবু?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। অসতর্ক ভাবেই যেন কথাটা বলে ফেলে সুদর্শন।

কিরীটী হো হো করে হেসে ওঠে।

এবারে কৃষ্ণাই বলে, সাবিত্রী কেমন আছে?

ভাল।

কিরীটী ঐ সময় বলে ওঠে, তাহলে ভায়া, এক প্রজাপতি তার রঙের খেলায় তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও অন্য প্রজাপতি সত্যিই তোমার জীবনে রঙ নিয়ে এল।

দাদা, আপনি যদি কেবলই ওই সব কথা বলেন তো আমি উঠে যাব।

আরে না না—বসো। আরও একটা সুখবর আছে হে।

সুখবর!

হ্যাঁ। কিরীটী বললে, তোমার কর্তার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল আজই দুপুরে।

তাই নাকি?

হ্যা, বললেন, তোমার প্রমোশনের জন্য তিনি রেকমেণ্ড করবেন—

কৃষ্ণা বললে, বসো তোমরা, আমি চা নিয়ে আসি।

কিরীটী বললে, সুদর্শনের জন্য মিষ্টিও এনো কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তারপর ? সাবিত্রী কি বললে ? কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়।

আপনার ধারণাই ঠিক দাদা।

সুদর্শন বলতে শুরু করে সাবিত্রীর মুখ থেকে শোনা কাহিনী।

চারের অঙ্ক

বছর দশ-বারো আগেকার কথা।

তখন ভোরবেলা সংবাদপত্রের পাতা খুললেই প্রথম পৃষ্ঠাতে শহরের এখানে-ওখানে নিত্য আট-দশটা খুনখারাপির কথা দেখা যেত না।

এ অশান্তি আর অস্থিরতা ছিল না এ শহরের জনজীবনে। এত আতঙ্ক আর খুনোখুনি রক্তপাতও ছিল না।

সেই সময়ই দু'মাসের মধ্যে পর পর দুটি খুনের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। নিহত ব্যক্তিরা শহরের গণ্যমান্য কোন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি না হলেও, প্রত্যেকেই তারা যাকে বলে ধনী এবং নামী জুয়েলার্স। এবং জুয়েলারীর ব্যবসা ছাড়াও কলকাতা শহরে তাদের গাড়ি বাড়ি ও প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স প্রত্যেকেরই ছিল। এবং তাদের হত্যার ব্যাপারে বিশেষ যে ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকেরই গলায় একটা নীল রেশমী রুমাল জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ নানা ভাবে অনুসন্ধান করেও তিন-তিনটে নিষ্ঠুর হত্যা-ব্যাপারের কোন হদিস করতে পারেনি।

শীতের এক সকালে কিরীটী তার বসবার ঘরে বসে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে আরাম করে চা পান করছে, এমন সময় জংলী ওইদিনকার সংবাদপত্রটা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণা পাশেই বসেছিল। সে-ই প্রথমে জংলীর হাত থেকে সংবাদপত্রটা নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাটা খুলে তার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, দেখেছ, আবার সেই নীল রুমাল! আবার একজন জুয়েলার—

কিরীটী মুখ তুলে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললে, মানে?

আবার আর একজন জুয়েলারকে গলায় নীল রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণা বললে।

তাই নাকি! কিরীটীর কণ্ঠে যেন একটা ব্যগ্রতার সুর।

হ্যাঁ। ভদ্রলোকের নাম শশধর সরকার। বৌবাজারে মস্ত বড় জুয়েলারী শপ 'সরকার জুয়েলার্স'-এর প্রোপাইটার ছিলেন।

দেখি! কিরীটী হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে।

আবার সেই নীল রুমাল। আবার একজন জুয়েলার। এই নিয়ে হল তিনজন।

এবারে নিহত হয়েছেন বিখ্যাত জুয়েলারী শপ 'সরকার জুয়েলার্স'-এর প্রোপ্রাইটার শশধর সরকার। ভদ্রলোকের বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ হবে। তাঁর দোকানের মধ্যেই তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিস-তদন্তে প্রকাশ, শনিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ দোকান বন্ধ হয়ে যায়। দোকান বন্ধ করে সকলের সঙ্গে শশধর সরকার বের হয়ে যান। রাত্রি আটটা পর্যন্ত তিনি বালিগঞ্জে যতীন দাস রোডে তাঁর বাড়িতেই ছিলেন। রাত আটটা নাগাদ একটা ফোন-কল পেয়ে তিনি বের হয়ে যান। বাড়ির কেউ বলতে পারেনি কোথা থেকে ফোন-কলটা এসেছিল এবং কে করেছিল. বা কোথায় তিনি গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে কেবল বেরুবার সময় বলে যান একটা বিশেষ কাজে বেরুচ্ছেন, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কিন্তু রাত বারোটা বেজে গেল—যখন তিনি ফিরলেন না, তখন শশধর সরকারের স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। চারদিকে জানাশোনা জায়গায় ফোন করতে থাকেন, কিন্তু কেউ তাঁর কোন সংবাদ দিতে পারে না। একসময় রাত শেষ হয়ে গেল, কিন্তু শশধর সরকার ফিরলেন না। পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ দোকান থেকে ফোন এল।

দোকানের একজন কর্মচারী—বিনয়ভূষণ ফোন করেছে। রবিবার দোকান বন্ধ। সে বাসায়ই ছিল। বৌবাজার অঞ্চলেই তার বাসা। একটি ছোকরা এসে তার বাসায় তাকে জানায়। ছেলেটি ওই পাড়ারই, বিনয়ভূষণকে চিনত।

বিনয়বাবু, শীগগিরই একবার দোকানে যান!

দোকানে? আজ তো রবিবার, দোকান বন্ধ?

তা তো জানি। ছোকরাটি বলে, দেখলাম আপনাদের দোকানের কোলাপসিবল গেটটা খোলা।

খোলা! সে কি!

হ্যাঁ। ব্যাপার কি দেখবার জন্য ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি, দোকানের ভেতরে সব আলো জ্বলছে, আর—

কি?

কে একটা লোক মেঝেতে পড়ে আছে আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি আপনাকে খবরটা দিতে।

বলাই বাহুল্য, অতঃপর বিনয়ভূষণ উঠি-কি-পড়ি করে সঙ্গে সঙ্গে দোকানে ছুটে যায় এবং দেখে ছোকরাটির দেওয়া সংবাদ সত্য। শুধু তাই নয়, মৃত ব্যক্তি আর কেউ নয়—তাদেরই মালিক শশধর সরকার। তার গলায় একটা নীল রুমাল বাঁধা। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। চোখ দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে। প্রথমটায় ওই

বীভৎস দৃশ্য দেখে বিনয়ভূষণ আতঙ্কে যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সে-ই পুলিসে ফোন করে সংবাদটা দেয়।

পুলিস আসে। ঘরের মধ্যে শো-কেসগুলো যেমন ছিল তেমনিই আছে। প্রত্যেক শো-কেসে নানা ধরনের অলঙ্কার সাজানো যেমন ছিল, ঠিক তেমনই আছে। কোনটার তালা বা চাবি ভাঙা হয়নি। এমন কি দোকানের চাবির গোছাটা শশধর সরকারের জামার পকেটেই পাওয়া গেছে। দোকানের যে দারোয়ান হনুমানপ্রসাদ দোকানের প্রহরায় থাকত রাত্রে, তাকে দোকানের পেছনদিককার একটা ঘরে খাটিয়ার ওপর নিদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বেলা দশটার সময়ও সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে তার ঘুম ভাঙানো হয়, কিন্তু সে কোন কিছুই জানে না। সন্ধ্যার দিকে তার এক দেশওয়ালী পরিচিত ব্যক্তি এসেছিল, দুজনে মিলে লোটা-দুই সিদ্ধির শরবৎ খেয়েছিল। তারপর তার সেই লোকটা চলে যায়, আর হনুমানপ্রসাদও খাটিয়ায় শুয়ে নিদ যায়। সে কিছু জানে না—রামজীর কসম। দোকানের অন্যান্য কর্মচারীদের শুধিয়ে ও খাতাপত্র দেখে যতদূর জানা গেছে, দোকান থেকে কোন অলঙ্কারাদি বা সিন্দুকের টাকাকড়ি কিছুই চুরি যায়নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা শুধু হত্যাই—স্রেফ হত্যার উদ্দেশ্যেই হত্যা করা হয়েছে, কোন চুরিচামারির ব্যাপার নেই এই হত্যার সঙ্গে।

কৃষ্ণা বললে, পড়লে?

কিরীটী বললে মৃদু কণ্ঠে, হুঁ।

মনে হল কিরীটী যেন কি ভাবছে।

সত্যিই কিরীটী ভাবছিল। হঠাৎ কাগজটা রেখে কিরীটী উঠে সোজা গিয়ে ঘরের কোণে রক্ষিত ফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে লাগল বৌবাজার থানায়।

থানা-অফিসার বিকাশ সেন তার পরিচিত।

বিকাশ থানাতেই ছিল, সে-ই ফোন ধরে অপর প্রান্তে। ও সি বৌবাজার থানা স্পিকিং—

কে, বিকাশ? আমি কিরীটী।

আরে, মিস্টার রায়! কি খবর? হঠাৎ?

কাগজে দেখলাম, তোমার এলাকায় কে একজন শশধর সরকার পরশু রাত্রে খুন হয়েছে!

হ্যাঁ, আবার সেই নীল রুমাল মিস্টার রায়—

জানি। তা কোন-কিছুর কিনারা করতে পারলে বা হদিস করতে পারলে?

না। তবে—

কি ?

তার গলায় পেঁচানো ছিল যে নীল রুমালটা, যার সাহায্যে বেচারীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, সেই রুমালটা পরীক্ষা করতে করতে একটা জিনিস নজরে পড়েছে জানেন মিস্টার রায়—

কি বল তো ?

ছোট্ট করে লাল সুতোয় লেখা একটা সাঙ্কেতিক ইংরাজি অক্ষর '3'-অর্থাৎ তিন।

আমিও ঠিক ওই কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম বিকাশ। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

মানে ?

টেলিফোনে সব কথা হতে পারে না। তোমার হাতে যদি সময় থাকে তো চলে এস একবার আমার বাড়ি।

যাবার কথা যখন আপনি বলছেন, তখন হাতে হাজার কাজ এবং সময় না থাকলেও যেতে হবে। আমি এখুনি আসছি। বলে বিকাশ টেলিফোনটা রেখে দিল অপর প্রান্তে।

কিরীটীও রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পুনরায় সোফায় এসে বসল।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার ? কাকে আসবার জন্য জরুরী তাগিদ দিলে গো ফোনে ?

বৌবাজার থানার ও-সি আমাদের বিকাশ সেনকে।

আমাদের বিকাশবাবু!

হ্যাঁ। ও হয়ত এখুনি এসে পড়বে। তুমি বরং কিছু ভালমত জলখাবারের ব্যবস্থা কর কৃষ্ণা। জান তো, বিকাশ সেন কিরকম পেটুক মানুষ।

কৃষ্ণা হেসে বলে, জানি, সে ব্যবস্থা হবে'খন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো ? হঠাৎ এত জোর তলব কেন ভদ্রলোকটিকে ?

আজকের সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট—বিজ্ঞাপনের পাতাটা দেখ। একটা বিজ্ঞাপন আছে নিশ্চয়ই, যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয় তো!

বিজ্ঞাপন ? কিসের বিজ্ঞাপন ? কৃষ্ণা যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই শুধোয়।

বেদ পাঠের। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

মানে ?

আহা, দেখই না আগে বিজ্ঞাপনটা আছে কিনা!

কৃষ্ণা বিনা বাক্যব্যয়ে অতঃপর সংবাদপত্রটা তুলে নিয়ে দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটা খুলে চোখ

বুলোতে শুরু করে।—এ তো দেখছি বিবাহ হারানো প্রাপ্তি ও নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনেই পাতা ভর্তি! দেখতে দেখতে বলে কৃষ্ণা।

তোমার চোখে দেখছি চালসে পড়েছে কৃষ্ণা! ডাঃ জিতেন চক্রবর্তীর কাছে একদিন তোমাকে না নিয়ে গেলে চলছে না। কাগজটা দাও, দেখাচ্ছি। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো—নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনটা আছে আজকের কাগজেও।

কৃষ্ণার হাত থেকে কিরীটী হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিল।

কয়েক মুহূর্ত চোখ বুলিয়েই কিরীটী বলে উঠল, বলছিলাম না—নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনটা বের হয়েছে, এই দেখ—

দেখি! বলে কৃষ্ণা কাগজটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

পৃষ্ঠার মাঝামাঝি কলমে সত্যিই একটা বক্স-করা বিচিত্র বিজ্ঞাপনের প্রতি কিরীটী অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, পড়।

কৃষ্ণা ঝুঁকে পড়ল।

একটা বক্স-করা বিজ্ঞাপন পাইকা টাইপে ছাপা হয়েছে ছোট কবিতার মত।

এ যে দেখছি একটা কবিতা!

আহা, পড়ই না।

> একে চন্দ্র অস্তমিত
> দুইয়ে পক্ষ কর্তিত
> তিনে নেত্র উৎপাটিত
> চারে বেদ পঠন-পাঠন
> যা হলেই সমাধান।
> নতুন কিতাবে নতুন ছড়া
> শীঘ্রই প্রকাশ হচ্ছে—

কৃষ্ণা বার-দুই পড়ল বিচিত্র বিজ্ঞাপনটা। তারপর বললে, নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ। কিরীটী মৃদু হেসে বলে, নতুন এক কিতাবই বটে! রক্তের হরফে লেখা হচ্ছে। শেষ পরিচ্ছেদটি কেবল এখন বাকি। সেটি লেখা হলেই অর্থাৎ সমাপ্ত হলেই পুস্তকটি শেষ।

কৃষ্ণা বুঝতে পারে বিজ্ঞাপনের মর্মার্থটা সে ঠিক উদ্ধার করতে পারেনি। তাই বলে, মনে হচ্ছে ওই বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোন রহস্যের গন্ধ তুমি পেয়েছ!

রহস্য বলে রহস্য—মারাত্মক রহস্য! তবে বেচারী এখনও বুঝতে পারেনি—

কি ?

অতি দম্ভে যেমন লঙ্কাধিপতি হত হয়েছিল, তেমনি তারও মৃত্যুবাণ তার অতি দম্ভের ছিদ্রপথে বের হয়ে এসেছে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, কিছুদিন ধরেই ওই বিজ্ঞাপনটা বেরোচ্ছিল, তবে শেষ দুটি লাইন আজই যোগ করা হয়েছে এবং সমাপ্তির রেখা টানার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

কার কথা বলছ ?

মেঘের আড়ালে থেকে যিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই মেঘনাদের কথা !

ঠিক আছে, তুমি হেঁয়ালিই গাও, আমি চললাম। কৃষ্ণা রাগত ভাবে উঠে দাঁড়ায়।

আরে, বসো বসো, চটছ কেন ?

না, যাই—বিকাশবাবুর খাবারের ব্যবস্থা করি গে।

সে হবে'খন। বসো না।

কৃষ্ণা আবার সোফায় বসে পড়ে।

কিরীটী বলে, সংবাদপত্রে তোমার নজর পড়েছে কিনা জানি না, গত দু'মাসে আরও দুজন জুয়েলার এই শহরে খুন হয়েছে—

সে তো হচ্ছেই কত !

তা হচ্ছে, তবে এই পূর্বের দুটি খুন ও গতকালের খুনের মধ্যে দুটো বিশেষত্ব আছে এবং বিশেষত্ব একটা অঙ্কের মত—

কি রকম ?

এক নম্বর হচ্ছে, যে দুজন গত দু'মাসে নিহত হয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই ধনী ব্যক্তি শহরের মধ্যে এবং প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী : শুধু ব্যবসায়ীই নয়, সোনা-রূপার ব্যবসায়ী, অর্থাৎ জুয়েলার্স ছিল। দু নম্বর, একটু থেমে মৃদু হেসে বলে, দু নম্বর—বল তো কি ? স্মিত হাস্যে স্ত্রীর মুখে দিকে তাকাল কিরীটী।

প্রত্যেককেই গলায় একটি করে নীল রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, তাই তো ?

চমৎকার ! আর কিছু ? কিরীটী সহাস্যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তখনও।

আর !

হ্যাঁ, আর—, কিরীটীর কথা শেষ হল না, বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল ওই সময়। কিরীটী বললে, ওই বোধ হয় আমাদের সেন সাহেব এল !

বাইরের কলিংবেলও বেজে উঠল ওই সঙ্গে। শোনা গেল তার শব্দ।

জংলী! কিরীটী ডাকে।

বলুন। জংলী সাড়া দিল।

দরজাটা খুলে দাও, বোধ হয় বিকাশবাবু এলেন।

॥ দুই ॥

যাই, চা-জলখাবার নিয়ে আসি।

কৃষ্ণা সোফা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়, একটু পরেই সিঁড়িতে একটা ভারি জুতোর মচমচ শব্দ শোনা গেল।

মোটা মানুষ বিকাশ সেন, বৌবাজার থানার ও-সি—সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকল।

এস বিকাশ!

বিকাশ ধপ করে একটা সোফার উপরে বসতে বসতে বললে, বাপস্! বলুন এবারে রায় সাহেব, ঊর্ধ্বশ্বাসে একেবারে ছুটে আসছি জীপ নিয়ে!'

কিরীটী হাসল।

হাসছেন আপনি! আর এদিকে—

দেহের ওজনটা একটু কমাতে পার না? তাহলে আর হাঁপাতে হয় না!

আপনিও ওই কথা বলবেন রায় সাহেব! ঘরে-বাইরে যদি ওই একই কথা শুনতে হয়—

কেন হে, ঘরে আবার তাগিদ দিচ্ছে কে?

কে আবার! সখেদে বললে বিকাশ, তাগিদ দেবার যার ক্ষমতা বা অধিকার আছে!

বল কি, ভদ্রমহিলাও তোমার পেছনে লেগেছেন?

অথচ জানেন, গত আট মাসে আমার বিশ সের ওয়েট কমে গেছে! এভাবে ওয়েট কমতে থাকলে—

তাই নাকি? তা আট মাস পূর্বে কত ছিল—কত?

আড়াই মণও নয়—ছ'সের কম।

কিরীটী গম্ভীর হবার চেষ্টা করে কোনমতে হাসি চেপে বলে, তাহলে তো সত্যিই যথেষ্ট কমে গেছে!

বলুন তাহলে—আরও কমলে হাঁপ ধরবে না? স্রেফ ব্যাঙাচিতে—নির্ঘাত পরিণত হবে।

আমার পরিবারটিকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, মোটা না হয় একটু আমি সামান্যই, তাহলেও আমার মত অ্যাকটিভ অফিসার কজন আছে উপরওয়ালারা বলুন তো!

তা কথাটা মিথ্যা নয়, মোটাসোটা হলে কি হবে, বিকাশ সেন সত্যিই খুব কর্মঠ অফিসার, সরকারী মহলে যথেষ্ট নামও আছে, কিরীটীর সেটা অজানা নয়।

যাকগে ওসব কথা, বলুন এখন—হঠাৎ আসতে বললেন কেন ফোন করে?

বসো বসো, আগে চা-জলখাবার খেয়ে সুস্থ হও।

কৃষ্ণা ওই সময় একপ্লেট সন্দেশ ও চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

কেমন আছেন বিকাশবাবু? কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

নমস্কার বৌদি! ভাল, চমৎকার। কেবল চারদিকে বদমাশ শয়তানগুলো জ্বালাতন করে মারছে। এই দেখুন না, গত পরশু একজন আবার নীল রুমালের ফাঁসে খতম হয়েছেন—আর হবি তো হ আমারই চৌহদ্দির মধ্যে!

ভাল কথা বিকাশ, সেই নীল রুমালটা এনেছ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, এই যে—বলতে বলতে পকেট থেকে ছোট একটা কাগজের প্যাকেট বের করল বিকাশ সেন।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল। নাও, শুরু কর বিকাশ।

বিকাশকে বলবার আগেই সে প্লেটটা টেনে নিয়েছিল।

কিরীটী কাগজের মোড়কটা খুলতেই একটা দামী বিলাতী সেন্টের গন্ধের ঝাপটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের নাকে এসে লাগল। নীল রঙের—আকাশ-নীল রঙের একটা বড় সাইজের রেশমী রুমাল।

কিরীটী রুমালটা মেলে ধরে দেখতে দেখতে বললে, হুঁ, হত্যাকারী মহাশয় দেখছি রীতিমত সৌখীন ব্যক্তি! বন্দুক, রিভলবার, ছোরাছুরি নয়—একেবারে একটি সেন্ট-নিষিক্ত আকাশ নীল রঙের রেশমী রুমালকেই হাতিয়ার করেছেন! জেমুইনটি আছে বলতে হবে, কি বল বিকাশ?

একটা বড় আমসন্দেশ গালে পুরে চিবুতে চিবুতে বিকাশ বললে, তা যা বলেছেন। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা, যে রেটে এ শহরে নীল রুমালের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে, শেষ পর্যন্ত না আমাদের পুলিস মহলের কণ্ঠদেশেই তা চেপে বসে!

কিরীটী হো-হো করে হেসে ওঠে বিকাশের কথায়।

বিকাশ আর একটা সন্দেশ মুখে পুরতে পুরতে বলে, অতি উপাদেয়, কোথাকার সন্দেশ বৌদি ? কোন্ দোকানের ?

কৃষ্ণা জবাব দেয়, দোকানের নয়।

তবে ?

আমার হাতে তৈরি।

আঃ! কি ইচ্ছা করছে জানেন বৌদি ?

কি ? সহাস্য মুখে তাকাল কৃষ্ণা বিকাশ সেনের দিকে।

হাত দুটো আপনার সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই।

কিরীটী আর কৃষ্ণা দুজনেই হাসে।

সন্দেশের রেকাবিটা নিঃশেষ করে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিতে নিতে বিকাশ বললে, কি কিরীটীবাবু, রুমালটা থেকে কিছু হদিস পেলেন ?

আপাততঃ যা মনে হচ্ছে, তা হচ্ছে রুমালের সাধারণত যা সাইজ হয়ে থাকে, তার থেকে কিছু বড়। সাধারণ সিল্কের রুমাল আর এক কোণে রুমালটার সাঙ্কেতিক ইংরাজি অক্ষর '3' লেখা ছাড়া বিশেষ কোন হদিস মিলছে না, তবে—

তবে ?

ওই '3' সাঙ্কেতিক অক্ষরটিকে যদি বিশেষ একটা ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া যায় তো বলতে হবে—

বিকাশ সাগ্রহে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল, কি মিস্টার রায় ?

পরশুর হত্যাটি নিয়ে তিনটি হত্যাকাণ্ড এই দু মাসে এই শহরে সংঘটিত হয়েছে এই ধরনেরই নীল রুমালের সাহায্যে, সেগুলির মধ্যে অর্থাৎ সেই হত্যাকাণ্ডগুলির মধ্যে একটা বিশেষ যোগাযোগ বা যোগসূত্র হয়ত আছে।

ঠিক। আমারও তাই মনে হয়েছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা সব কটি হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হয়েছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

অর্থাৎ হত্যাকারী একই ব্যক্তি এই তো বলতে চান আপনি ? বিকাশ বললে।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, মনে হচ্ছে তো সেই রকমই।

কিন্তু একটা কথা—, বিকাশ বলে।

কি বল তো ? কিরীটী বিকাশের মুখের দিকে তাকাল।

ওটা যদি ইংরাজি '3' না হয়ে বাংলার '৩' হয় ?

না।

কি না?

ওটা ইংরাজির '3'-ই।

কি করে স্থিরনিশ্চয় হলেন?

একটা বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিনা জানি না বিকাশ—

বিজ্ঞাপন!

হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনটা কিছুদিন থেকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে—

কি বিজ্ঞাপন বলুন তো?

কিরীটী তখন দৈনিক 'প্রত্যহে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপন—যেটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং যে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছুক্ষণ পূর্বে তার কৃষ্ণার সঙ্গে আলোচনা চলছিল সেটা সম্পর্কে বললে।

সত্যি? দেখি বিজ্ঞাপনটা!

কিরীটী কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিকাশ বিজ্ঞাপনটা বারকয়েক পড়ল। তারপর বললে, হুঁ। বিজ্ঞাপনটা সত্যিই বিচিত্র তো! তাহলে—

ঠিক তাই বিকাশ, পর পর তিনটি হত্যাকাণ্ডই বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা যদি সংঘটিত হয়েও থাকে, তাহলেও pre-planned—premeditated, পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে হয়—

তা তো বুঝলাম, কিন্তু—

কি বল?

উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে!

তা আছে বৈকি। হত্যাকারী কিছুটা maniac হলেও হত্যাগুলোর পেছনে তার একটা উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত আছে। হয়ত প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ—কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পূর্বে তোমাকে কতকগুলো ব্যাপারের ভাল করে অনুসন্ধান নিতে হবে।

কিন্তু কি অনুসন্ধান করি বলুন তো? ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে আর কেউ ছিল বলেই তো এখনও জানা যায়নি। পেছনের গ্যারাজে যে ব্যাটা দারোয়ান ছিল, সে ব্যাটা তো সিদ্ধির নেশায় সে রাত্রে বুঁদ হয়ে ছিল।

আচ্ছা সংবাদপত্রে যে নিউজ বের হয়েছে—সেদিন রাত আটটা নাগাদ কার কাছ থেকে একটা ফোন-কল পেয়ে শশধর সরকার বের হয়ে যান বাড়ি থেকে—

হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী তো বলতে পারলেন না, ফোন-কলটা কোথা থেকে এসেছিল! কেবল

বললেন, তাঁর স্বামী নাকি তাঁকে বলেছিলেন ফোন-কলটা জরুরী।

জরুরী তো বটেই—একেবারে মৃত্যু-পরোয়ানা। তাই বলছিলাম, সেটার কোন ট্রেস করা যায় কিনা দেখ।

কেমন করে সম্ভব তা? অটোমেটিক ফোন—

তবু দেখ, চেষ্টা করলে হয়ত জানতেও পার। তারপর ওই বিনয়ভূষণ—

সেখানেও একটা ধোঁয়া।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। ওই বিনয়ভূষণকে শশধরবাবুর স্ত্রী জানতেন না। তবে একটা সংবাদ পেয়েছি, দিন পনের আগে দোকানের চাকরি থেকে নাকি বিনয়কে বরখাস্ত করেছিলেন শশধর সরকার।

কি করে জানলে?

দোকানের একজন কর্মচারী, যতীন সমাদ্দারই বললে এনকোয়ারির সময়। যে ফোন করেছিল শশধরের স্ত্রী সুনয়না দেবীকে সে বিনয়ভূষণের নাম করে ওই সব বলে। তা-ছাড়া আরও একটা কথা আছে, সে-রাত্রে নাকি বিনয়ভূষণ কলকাতাতেই ছিল না।

তবে কোথায় ছিল?

অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, বিকাশ বললে, বিনয়ভূষণ দিন দশেক আগে থাকতেই তার বৌবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামপুরে চলে গিয়েছিল সেখানে একটা দোকানে চাকরি পেয়ে। সে-রাত্রে শ্রীরামপুরেই ছিল। ওই দিন সকালে কলকাতায় আসে কি একটা কাজে।

কিরীটী বললে, তা বিনয়ভূষণের চাকরি গিয়েছিল কেন, জানতে পেরেছ কিছু?

হ্যাঁ, চুরির ব্যাপারে—

চুরি?

হ্যাঁ। কিছু দামী জুয়েলস চুরির ব্যাপারে সন্দেহে তার চাকরি যায়।

আচ্ছা, শশধর সরকারের ফ্যামিলি মেম্বারস ক'জন? কে কে আছে বাড়িতে?

নিঃসন্তান ছিলেন উনি। স্ত্রী এবং একটি পোষ্য ভাইপো রাজীব সরকার—আর চাকরবাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার।

রাজীব সরকার কি করে?

সেও তার কাকার সঙ্গে দোকানেই বসত। এখন বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা যেমন ধোঁয়াটে তেমনি রীতিমত রহস্যজনক। আমি তো মিঃ রায়, কোন আলোর বিন্দুও কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

সুনয়না দেবী ও রাজীব সরকারকে ভাল ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলে?

করেছি।

তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু জানতে পারা গেল না?

না। তাঁরা বললেন, শশধরবাবু নাকি অত্যন্ত অমায়িক ও সৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। কখনও কারও সাতে পাঁচে থাকতেন না। তাঁর কোন শত্রুও ছিল না। ওই ভাবে তাঁর মৃত্যুটা তাঁদের কাছে কল্পনাতীত।

আচ্ছা দোকানটা কত দিনের? কিরীটী প্রশ্ন করে।

শুনলাম দোকানটা নাকি উনিই করেছিলেন—বছর পাঁচেক হল। ছোট দোকান থেকে পাঁচ বছরে বিরাট কারবার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় তাহলে? পাঁচ বছরের ঐশ্বর্য?

হ্যাঁ। ওঁর বাপ রামজীবন সরকার সামান্য একজন কারিগর ছিলেন। শশধরও তাই ছিলেন। বাপ বছর আষ্টেক আগে মারা যান। বছর পাঁচেক আগে কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন বসে ছিলেন, তারপর ছোট্ট একটা দোকান খোলেন। তারপর ধীরে ধীরে—

নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে সরকার জুয়েলারীর আবির্ভাব—তাই তো?

হ্যাঁ।

তা শশধর কোথায় চাকরি করত, কোন্ দোকানে—কিছু জানা গেছে?

সে খবরও নিয়েছি, বিরাট জুয়েলার্স বি. কে. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের নামটা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—

মনে থাকবে না কেন? সে তো প্রায় বছর পাঁচেক আগে কি সব আভ্যন্তরীণ কারণে প্রতিষ্ঠানটা বন্ধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, সেখানেই চাকরি করতেন শশধর সরকার এক সময়।

কিরীটী কিছুক্ষণ যেন কি ভাবল। তারপর বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা খোঁজ নিতে পার বিকাশ?

কি বলুন তো?

বি. কে. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের মালিক বা মালিকদের মধ্যে কেউ আছেন কিনা এবং যদি থাকেন তো বর্তমানে কে কোথায় আছেন, কি করছেন?

তা পারব না কেন?

হ্যাঁ, খবরটা সংগ্রহ কর তো। ভাল করে সন্ধান নাও। আলোর বিন্দু হয়ত দেখতে পাব এক-আধটা, আর—

আর কি?

সংবাদপত্রের ওই বিজ্ঞাপনের কথাটাও যেন ভুলে যেও না।

একটা কথা বলব মিস্টার রায় ?

বল।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞাপনটার সঙ্গে নীল রুমাল হত্যা-রহস্যগুলোর সত্যিই কোন যোগাযোগ আছে বলে কি আপনি মনে করেন মিস্টার রায় ?

নাও থাকতে পারে। হয়ত কোনটার সঙ্গে কারও কোন সম্পর্ক নেই। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

তবে ?

সেই যে একটা কবিতা আছে না—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, মিলিলে মিলিতে পারে—, কিন্তু আর না বিকাশ, এবার আমি একটু বেরোব।

বিকাশ বুঝতে পারে, কিরীটী আপাততঃ বর্তমান প্রসঙ্গের ওপরে যবনিকাপাত করতে চায়। কিরীটী রায়কে বিকাশ ভাল করেই চেনে। যতটুকু সে বলেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, তার বেশি একটি কথাও তার মুখ থেকে আর এখন বের করা যাবে না।

তাহলে আমিও উঠি।

এস।

বিকাশ সেন উঠে পড়ল।

॥ তিন ॥

ঘণ্টাখানেক বাদে কিরীটীও বের হচ্ছে দেখে কৃষ্ণা শুধোয়, বেরোচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, একটু ডালহাউসি যাব।

সংবাদপত্র 'প্রত্যহে'র অফিসে বোধ হয় ?

ঠিক।

তোমার কি সত্যিই মনে হয়—

কি ?

ওই বিজ্ঞাপনটার সঙ্গে—

নীল রুমাল হত্যা-রহস্যের কোন যোগাযোগ আছে কিনা ?

হ্যাঁ, মানে—

কিন্তু কৃষ্ণার কথা শেষ হল না, নিচের কলিংবেলটা বেজে উঠল। কৃষ্ণা বললে, ওই

দেখ, আবার যেন কে এল। সুব্রত ঠাকুরপো বোধ হয়—

মনে হচ্ছে না। তার বেল বাজানো ঠিক ওই রকম নয়।

ওই সময় জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবুজী!

কি রে?

একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

ভদ্রলোক! কোথা থেকে আসছেন?

তা তো কিছু বললেন না, বললেন আপনার সঙ্গে কি বিশেষ দরকার আছে।

যা, ডেকে নিয়ে আয়।

জংলী নিচে চলে গেল। কৃষ্ণাও ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিরীটী তাকে সম্বোধন করে বললে, এখন আর বেরোব না।

সেই ভাল, ফুলকপির সিঙাড়া ভাজছিলাম—

সুব্রতকে খবর দিয়েছ?

কালই ফোনে বলেছি, এখুনি হয়ত এসে পড়বে।

ঠিক আছে, তুমি যাও।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। কিরীটী কান পেতে শোনে। দু-জোড়া শব্দ। প্রথম শব্দটা জংলীর, তার সঙ্গে যে শব্দটা কানে আসে, সেটা থেমে থেমে। হাতে বোধ হয় একটা লাঠি আছে, লাঠির শব্দও কানে আসে।

সত্যিই তাই। পরমুহূর্তে জংলীর পেছনে পেছনে যে লোকটি ঘরে এসে প্রবেশ করে, তার বয়স খুব বেশি না হলেও দেখলে মনে হয় যেন অকালে বুড়ো হয়ে গেছে। রসকষ-হীন শুকনো পাকানো চেহারা, মুখটা লম্বাটে ধরনের, মুখে চাপদাড়ি, কণ্ঠার হাড় দুটো প্রকট, কপালে একটা জড়ুল চিহ্ন। দুটি চোখে যেন শৃগালের মত অস্থির সতর্ক দৃষ্টি। ডান পা-টা মনে হয় পঙ্গু, হাতে একটা মোটা লাঠি। পরনে দামী শান্তিপুরী ধুতি, গ্রে কালারের গরম সার্জের পাঞ্জাবির ওপরে একটা দামী কাশ্মিরী শাল জড়ানো।

নমস্কার।

কিরীটী প্রতিনমস্কার জানায় হাত তুলে, নমস্কার। বসুন।

হ্যাঁ, এই যে বসি। ভাঙা ভাঙা একটু যেন মোটা কর্কশ স্বর।

কোনমতে আগন্তুক কিরীটীর মুখোমুখি সোফাটার ওপরে বসে পাশে তাঁর লাঠিটা রাখলেন। তারপর বললেন, আপনিই নিশ্চয় রায়মশাই?

হ্যাঁ।

আগন্তুক পকেট থেকে একটা দামী সোনার সিগারেট কেস বার করেন, কেস থেকে একটা দামী বিলাতী সিগারেট নিয়ে কেসটা কিরীটীর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, সিগারেট!

না, ধন্যবাদ।

সিগারেট চলে না বুঝি? ধূমপানে বুঝি অভ্যস্ত নন? তা ভাল, বড় বদ অভ্যাস—

চলে, তবে সিগারেট নয়—সিগার আর পাইপ।

সুদৃশ্য দামী একটা ম্যাচবক্স-হোলডার থেকে একটি কাঠি বের করে সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করতে তৎপর হন আগন্তুক।

কিরীটী লক্ষ্য করে, আগন্তুকের দু'হাতের তিন আঙুলে আংটি, তার মধ্যে ডান হাতের অনামিকায় যে আংটিটা রয়েছে, সেটায় বেশ বড় সাইজের হীরে বসানো রয়েছে এবং অন্য আংটি দুটো মীনে করা।

হীরেটার দাম খুব কম করেও হাজার দশেক তো হবেই। দামী হীরে। ঝলমল করছে। বেশভূষা, সোনার সিগারেট কেস, হাতের হীরের আংটি—সব কিছুই যেন নির্দেশ করছে যে আগন্তুক একজন ধনী ব্যক্তি।

সিঁড়িতে ওই সময় দ্রুত জুতো-পরা পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী বুঝতে পারে সুব্রত আসছে।

পরমুহূর্তেই সুব্রত ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে, বৌদি—

কিন্তু বাকি কথা সে শেষ করতে পারে না। ঘরের মধ্যে কিরীটীর সামনে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে থেমে গেল এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকাল।

আয় সুব্রত, বস্।

বৌদি—

বস্, এখনও দেরি আছে।

সুব্রত বুঝতে পারে, কিরীটী তাকে বসতে বলছে। আর কোন কথা না বলে সে কিরীটীর পাশেই বসে পড়ল।

হ্যাঁ, এবারে বলুন তো আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন? প্রশ্নটা করে কিরীটী আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

আমার নাম শিবানন্দ বসু। বালিগঞ্জে বোস অ্যাণ্ড কোং যে জুয়েলারী শপটা আছে তার প্রোপ্রাইটার—মানে মালিক আমি।

তা আমার কাছে কি প্রয়োজন বলুন তো বোস মশাই?

ভদ্রলোক কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকেন। আড়চোখে সুব্রতর দিকে তাকান।

ও, সুব্রত আমার অন্তরঙ্গ ও সহকারী। আমাকে যা বলার, ওর সামনে আপনি তা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন শিবানন্দবাবু। তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, মনে হচ্ছে বিশেষ কোন কারণে আপনি একটু চিন্তিত?

সত্যিই তাই রায় মশাই। ব্যাপারটা হচ্ছে—

বলুন?

আপনার নজরে পড়েছে কিনা জানি না, গত দু'মাসের মধ্যে এই শহরে—

আপনি কি সেই নীল রুমালের ফাঁস লাগিয়ে যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সেই কথাই—

ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য, বুঝলেন কি করে?

আপনি একজন নামকরা জুয়েলার বললেন না? যাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁরাও সবাই জুয়েলার ছিলেন কিনা—

ঠিক। সেই কারণেই আমি এসেছি আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্য।

কিসের পরামর্শ বলুন তো?

আমার কেমন একটা ভয় ঢুকেছে মনে। কে জানে এবার আমারই পালা কিনা।

কিরীটী হেসে ফেলে।

হাসছেন যে রায় মশাই?

হাসছি এই কারণে, কলকাতা শহরে তো অনেক জুয়েলারই আছেন—, বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী শিবানন্দের বাঁ-হাতের মধ্যমায় মীনা করা আংটিটার দিকে তাকিয়ে থেমে যায়।

শিবানন্দর দৃষ্টি এড়ায় না বোধ হয় ব্যাপারটা। বলেন, কি দেখছেন?

না, কিছু না। কি বলছিলেন বলুন?

বুঝতেই পারছেন রায়মশাই, ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছি।

কেন বলুন তো?

বলেন কি! বেটাদের যত আক্রোশ তো দেখছি সব আমাদের জুয়েলার্সদের ওপরেই। বেটারা যেন আমাদের সব খতম করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। তাই ভয়ে ভয়ে আছি সর্বক্ষণ। রাতে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই—জেগে জেগে যেন কেবলই ওই নীল রুমালের আতঙ্ক দেখছি, ভয়াবহ এক বিভীষিকা—

তা শিবানন্দবাবু, সেজন্য আমার কাছে এসেছেন কেন? আমি তো আর আপনাকে

কোন প্রোটেকশান দিতে পারব না! তা যদি কেউ পারে তো পুলিসই পারবে।

তা কি আর জানি না রায় মশাই—

তবে?

পুলিস হয়ত আমার কথায় কানই দেবে না।

তা কেন? বলেন তো টালিগঞ্জ থানার ও. সি.কে আমি বলে দিতে পারি—

না না, মশাই, বরং আপনি যদি কোন পথ বাৎলাতে পারেন—

না, ক্ষমা করবেন। তাছাড়া—

আহা, সাহায্য না করতে পারেন, উপদেশ তো কিছু দিতে পারেন!

বাড়িতে গোটা দুই দারোয়ান রাখুন।

তা কি আর বাকি রেখেছি রায় মশাই—তিন-তিনজন দারোয়ান বহাল করেছি। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না, স্বস্তিতে বাইরে ঘোরা-ফেরা পর্যন্ত করতে পারছি না।

সুব্রত কিরীটীর পাশে বসে নিঃশব্দে এতক্ষণ শিবানন্দ বোসের কথাবার্তা শুনছিল। এবারে বললে, আপনি বরং এক কাজ করুন শিবানন্দবাবু—

কি বলুন তো?

মাসখানেকের জন্য কাউকে কোথায় যাচ্ছেন না জানিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসুন।

সেই পরামর্শ দিচ্ছেন!

হ্যাঁ। নীল রুমালের ব্যক্তিটির সত্যিই যদি আপনার উপরে কোন আক্রোশ থাকে তো মাসখানেক অন্ততঃ তো আপনার খোঁজ পাবে না—

কিন্তু তারপর? সব কিছু ফেলে দিয়ে তো আমি অজ্ঞাতবাসে বাকি জীবনটা কাটাতে পারি না। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত যদি তারা আমাকে খুঁজে বের করে ফেলে!

শিবানন্দবাবু? কিরীটী আবার কথা বলে।

আজ্ঞে!

আপনার ছেলেমেয়ে কটি?

নেই।

নেই মানে? আপনার কোন সন্তানাদি নেই?

না। আমার স্ত্রীর কোন সন্তান হয়নি। দুঃখের কথা আর বলেন কেন?

তবে আপনার বিষয়-আশয়ের ওয়ারিশন কে?

কে আর—ওই নাম্বু, বোম্বেটে ভাগ্নেটারই শেষ পর্যন্ত হবে পোয়া বারো।

ভাগ্নে!

হ্যাঁ, ভাগ্নে নয়—বলতে পারেন কুলাঙ্গার। লেখাপড়া করল না, মানুষ হল না, কাজকর্মও শিখল না। সর্বক্ষণ পার্টি করে বেড়ায়।

কোন্ পার্টির লোক তিনি?

কে জানে মশাই, এদেশে তো হাজারটা পার্টি। নামও জানি কি ছাই তার যে বলব কোন্ পার্টি শ্রীমানের। বুঝলেন, দিতাম গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে বাড়ি থেকে, কিন্তু ওই যে—

কি?

তার মামী—আমার অর্ধাঙ্গিনীটি, সে যে নাম্নু বলতে অজ্ঞান! বলেছিলাম একবার তাড়িয়ে দেব, তা ঘন ঘন ফিট হতে শুরু করল গিন্নীর। শেষে সাপের ছুঁচো গেলার মত চুপ করে বামবুদ্ধু হয়ে বসে আছি। মরুক গে—যা খুশি ওরা করুক গে। অথচ মশাই, ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালই ছিল—

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। স্কুল ফাইন্যাল পাস করে বিদ্যাসাগরে বি. এস্-সি. পড়ছিল, তারপরই মাথায় ঢুকল পোকা। ব্যস, সব কিছু শিকেয় উঠল। এখন দিবা-রাত্র পার্টি করছেন আর আমার অন্নধ্বংস, ধনক্ষয় করছেন।

কিরীটী মনে মনে বলে, ঠিকই করছে—বর্বরস্য ধনক্ষয়! কিন্তু মুখ দিয়ে তার সে কথাটা বের হয় না, কেবল মিটিমিটি হাসে।

শিবানন্দ এবারে বললেন, আমি অবিশ্যি আপনার পরামর্শ এমনি চাই না, তার জন্যে পারিশ্রমিক দিতে আমি কার্পণ্য করব না—

ঠিক আছে শিবানন্দবাবু. আপনার কথাটা আমি ভেবে দেখব।

দেখবেন?

হ্যাঁ, দেখব।

ব্যস, ব্যস—তাহলেই আমি খুশি। বড় বিপদে পড়েছি রায় মশাই, এ বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন—আমিও আপনাকে খুশি করে দেব। আচ্ছা, তাহলে আমি উঠি। নমস্কার।

নমস্কার।

শিবানন্দ অতঃপর উঠে পড়লেন এবং লাঠির সাহায্যে পঙ্গু ডান পা-টা সামান্য টেনে টেনে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী একদৃষ্টে শিবানন্দর ক্রমঅপস্রিয়মাণ দেহটা ও চলার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে ছিল।

সুব্রতর সেদিকে নজর পড়ায় বললে, কি দেখছিস রে কিরীটী ?

কিরীটী সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, কেমন বুঝলি সুব্রত !

কিসের কি বুঝলাম ?

বলছিলাম, ভদ্রলোকের আগমন ও প্রত্যাগমন থেকে কি তোর মনে হল !

বেশ ভয় পেয়ে গেছেন মনে হল।

তা ঠিক, তবে ওই যে একটা কথা আছে না আমাদের দেশে—

কি ?

ভেক না নিলে ভিক্ষে মেলে না !

সুব্রতর কথার জবাব দেওয়া হল না, কৃষ্ণা এসে ঘরে প্রবেশ করল। হাতে তার প্লেটে গরম গরম সিঙাড়া।

সুব্রতও সব কিছু ভুলে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণার হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে নিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সিঙাড়ার সদ্ব্যবহার শুরু করে দিল।

কৃষ্ণা মুখোমুখি বসতে বসতে বললে, কে এসেছিল গো ?

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে হেসে বললে, নীল রুমাল।

মানে !

ওই আর কি, নীল রুমালের আতঙ্কে আতঙ্কিত এক ভদ্রলোক। সুব্রত বললে।

তাই নাকি ? কি রকম ?

সুব্রতই সংক্ষেপে ব্যাপারটা বিবৃত করে গেল সিঙাড়ার স্বাদ নিতে নিতে।

কিরীটী হঠাৎ ওই সময় বলে ওঠে, ব্যাপারটা নিয়ে আজ সকাল থেকে চিন্তা করতে করতে একটা ব্যাপার আমার কাছে যেন এখন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুব্রত—

কি বল তো ?

নীল রুমালের ব্যাপারটায় পূর্বপরিকল্পিত দৃঢ় সঙ্কল্প কারও-না-কারও আছে। কিরীটী তার সামনের নিচু টেবিল থেকে সুদৃশ্য চন্দনকাঠের সিগারের বাক্সের ডালাটা খুলে একটা সিগার তুলে নিয়ে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে।

পূর্বপরিকল্পিত দৃঢ় সঙ্কল্প !

হ্যাঁ। এই দুই তিন—তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে, এবারে চতুর্থ ব্যক্তির পালা, চারের অঙ্ক আর কি—

বলিস কি !

কিন্তু ভাবছি, সেই চতুর্থ কে ? কার জন্য হত্যাকারীর নীল রুমাল অপেক্ষা করছে ?

॥ চার ॥

সুব্রত বললে, তাহলে তুই বলতে চাস কিরীটী, নীল রুমালের ফাঁস আরও একজনকে গলায় নিতে হবে!

তাই তো মনে হচ্ছে। তবে—

তবে কি? এবারে ওই শিবানন্দরই পালা নাকি?

কিরীটী মৃদু হাসল।

হাসছিস যে! আমারও মনে হয়—

কি মনে হয় রে?

ভদ্রলোক যেভাবে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তোর কাছে ছুটে এসেছিলেন—

কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীতও তো হতে পারে?

মানে?

অতি সতর্কতায় মতিভ্রম! যাকগে সে কথা। তারপরই হঠাৎ যেন কি মনে পড়েছে এমনি ভাবে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ রে সুব্রত—

কি?

হীরেন সরকারের সঙ্গে তোর জানাশোনা ছিল না?

কোন্ হীরেন সরকারের কথা বলছিস?

আরে ওই যে সরকার জুয়েলার্সদের বাড়ির ছেলে—

হ্যাঁ, ছিল তো। তা কি হয়েছে তাতে?

তাকে একবার ডাকাতে পারিস?

পারব না কেন? দীর্ঘকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই অবিশ্যি, তাহলেও দেখা করে তোর কথা বললে আসবেই। কিন্তু কেন?

কেন আবার কি—একটু আলাপ-সালাপ করতাম ভদ্রলোকের সঙ্গে আর কি।

কি হবে আলাপ করে?

কোথা থেকে কি হয়, কেউ কি কিছু বলতে পারে—না তাই কিছু বলা যায়?

বেশ, কালই যাব তার ওখানে একবার।

তাই যাস। আচ্ছা তোরা বস্, আমি বিকাশকে একটা ফোন করে আসি। বলতে বলতে কিরীটী উঠে পড়ল সোফা থেকে।

কিন্তু ফোনে বিকাশ সেনকে থানায় পাওয়া গেল না, তখনও সে থানায় ফিরে যায়

নি। এ. এস. আই. বললেন, কখন ফিরবেন তিনি বলতে পারেন না।

কিরীটী ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে বললে, খুব করিৎকর্মা ব্যক্তি আমাদের এই বিকাশ সেন। হয়ত সকালে আজ যা বলেছি, সেই সব নিয়েই সে মেতে উঠেছে। যাক গে, মরুক গে—তারপর তোর ব্যাপার কি বল্ তো সুব্রত!

কেন? ব্যাপার আবার কি?

এদিকে যে ভুলেও পা মাড়াস না?

কে বললে? প্রায়ই তো আসি, কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা কর্।

সুব্রত কখনও কৃষ্ণাকে নাম ধরে ডাকে. কখনও বৌদি বলে ডাকে।

কি করিস বাড়িতে বসে বসে?

কি আর করব, বই পড়ি।

তা ভাল। শেষ পর্যন্ত দেখবি, ওই শুকনো বইয়ের পাতাগুলো ক্রমশঃ আরও নীরস হয়ে উঠছে। বুঝলি না তো সময়ে! অত করে বললাম তখন, চোখ কান নাক মুখ বুজে ঝুলে পড়্।

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, দুঃখ হচ্ছে?

আমার নয়, তোর—তোর কথা ভেবে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। কুন্তলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিস?

না।

কেন?

কেন আবার কি, প্রয়োজন হয় না বলে!

মেয়েটাও হয়েছে তেমনি কৃষ্ণা, সুব্রতটা বুড়বাক বলে সেও গোঁ ধরে বসে আছে।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকতে পারে না, বলে, দায় পড়েছে তার! হ্যাংলামি করতে যাবে কেন—তার নিজস্ব একটা প্রেসটিজ নেই!

প্রেসটিজ! একে তুমি প্রেসটিজ বল কৃষ্ণা!

তা নয় তো কি?

বাইরে প্রেসটিজের মিথ্যে একটা মুখোশ মুখে এঁটে, ভেতরে ভেতরে সর্বক্ষণ চোখ মোছা—

থাম তো—মেয়েদের তুমি ভাব কি!

ঠিক যা ভাবা উচিত তাই ভাবি।

সুব্রত ওদের কথা শোনে বসে বসে, আর মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

তরল হাসি-গল্পের মধ্যে দিয়ে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়ে একসময় সুব্রত যাবার জন্য

যেমন উঠে দাঁড়িয়েছে, কৃষ্ণা বললে, এ কি, উঠছ কোথায় ?

বাঃ, যেতে হবে না !

হবে। তবে বিকেলে—দুপুরের খাওয়া এখানে।

সুব্রত বসে পড়ে বললে, তথাস্তু দেবী।

হাতে কিছু কাজ ছিল বিকাশের। কাজগুলো সারতে সারতে বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়। প্রায় দেড়টা নাগাদ সে থানায় ফিরে এল।

অতক্ষণ ধরে কাজ করলেও তার মাথার মধ্যে কিন্তু সর্বক্ষণ কিরীটীর সকালের কথাগুলোই ঘোরাফেরা করছিল।

কিরীটী যা বললে, তা কি সত্যি! তিন-তিনটি হত্যার মধ্যে সত্যিই একটা সুস্পষ্ট যোগাযোগ আছে। অবিশ্যি তিনটি হত্যার মধ্যে দুটি ব্যাপারে অদ্ভুত মিল আছে—প্রথম, প্রত্যেকেই শহরের জুয়েলার্স, অবস্থাও ভাল; দ্বিতীয়, প্রত্যেকেরই গলায় নীল রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে! আর সেই কারণেই কি কিরীটীর ধারণা, একই ব্যক্তি তিন-তিনটি ওই নিষ্ঠুর হত্যার পেছনে রয়েছে? একজনেরই অদৃশ্য হাতের কারসাজি তিনটি হত্যাই ?

আশ্চর্য নয়!

কিন্তু কথা হচ্ছে, উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে ওই ধরনের নৃশংস হত্যার ?

কি উদ্দেশ্যে একটা লোক অমন নৃশংস ভাবে একটার পর একটা জুয়েলারকে এ শহরে হত্যা করে চলেছে ?

ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ কি ?

কিন্তু কিসের আক্রোশ ? কি ধরনের আক্রোশ ?

ঝনঝন করে পাশের টেলিফোনটা টেবিলের উপরে বেজে উঠল। আঃ শালারা একটু নিশ্চিন্তে বসে বিশ্রামও করতে দেবে না! ঘণ্টা চারেক হন্তদন্ত হয়ে রোদে ছোটাছুটি করে এসে একটু বসেছি—, একান্ত বিরক্ত ভাবেই ফোনটা তুলে নিল: ও-সি, বৌবাজার স্পিকিং!

ও-প্রান্ত থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে বিকাশ—আমি কিরীটী!

সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ সেনের মুখের ওপর থেকে বিরক্তির মেঘটা যেন কেটে যায়। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, সোজা হয়ে বসে।

বলুন, বলুন রায় সাহেব—

তুমি এখান থেকে যাবার পর সকালে একবার ফোন করেছিলাম।

আমি এই ফিরছি। কি ব্যাপার বলুন তো? ফোন করেছিলেন কেন?

সকালে তখন কয়েকটা কথা তোমাকে বলতে পারিনি—

কি কথা?

এর আগে যে দুজন জুয়েলার এ শহরে নীল রুমালের ফাঁসে নিহত হয়েছে, তারা কোথায় কি ভাবে কখন নিহত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে ডিটেলস্ খবরাখবর একটা যোগাড় করতে পার?

কিছুটা সংগ্রহ করেছি রায়সাহেব—

করেছ? খুব ভাল সংবাদ—

হ্যাঁ। আর সেই খবরের জন্যই এতক্ষণ বাইরে ঘুরে এলাম।

কি জানতে পারলে বল?

টেলিফোনেই বলব, না—

না, শোন, আমি আগামী কাল সকালেই দিন-কয়েকের জন্য দিল্লী যাচ্ছি প্লেনে—

হঠাৎ দিল্লী?

ওখানে এক মন্ত্রী মশাইয়ের দপ্তর থেকে একটা গোপন কনফিডেনসিয়াল দলিল বেপাত্তা হয়ে গেছে, তাই মন্ত্রী মশাই কিছুক্ষণ আগে এক জরুরী ট্রাঙ্কল করেছিলেন আমায়—

তাহলে?

কি তাহলে?

এদিককার কি হবে?

কিসের—তোমার নীল রুমাল রহস্যের?

হ্যাঁ!

ভয় নেই, আমার ধারণা বা অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে আমাদের নীল রুমালের ভদ্রলোকটি এখুনি আবার তাঁর হাত প্রসারিত করবেন না, কিছুটা অন্ততঃ সময় নেবেন।

কিন্তু যদি না নেয়—

নেবে। অন্ততঃ দিন পনেরো-কুড়ি তো নেবেই—সাধারণ যুক্তিতে। কারণ—

কি?

পুলিসকে সে তৃতীয়বার বোকা বানাল, সেই আত্মশ্লাঘা বা আত্মতৃপ্তিটা অন্ততঃ কিছু দিন তো একটু যাকে বলে চেখে চেখে উপভোগ করবেই, মনে মনে হাসবে। ভয় নেই ভায়া, তার ওই আত্ম-অহমিকাই তার রথচক্র গ্রাস করবে ঠিক সময়ে। গতি রুদ্ধ হবে।

বলছেন!

হ্যাঁ, বলছি। যাক, যা বলছিলাম, ওই খবরগুলো কিভাবে সংগ্রহ করলে?

ফোনেই বলি?

না থাক। বরং তুমি এখন আছ তো?

হ্যাঁ।

আমিই কিছুক্ষণের মধ্যে যাচ্ছি। সংবাদটা ফোন মারফৎ আদান-প্রদান না হওয়াই ভাল।

অন্য প্রান্তে কিরীটী ফোন রেখে দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কিরীটী থানায় এসে হাজির হল।

বিকাশ তখন স্নান সেরে চাটি মুখে দিয়ে কোনমতে সবেমাত্র নিচের অফিসে এসে বসেছে।

আসুন মিস্টার রায়!

তারপর, বল। কিরীটী বসতে বসতে বললে, কতটুকু কি সংবাদ সংগ্রহ করলে?

প্রথম ব্যক্তি নিহত হয় নীল রুমালের ফাঁসে, ঠিক আজ থেকে দু'মাস আগে এক শনিবার রাত্রি আটটা-নটার মধ্যে কোন এক সময়। কারণ—

কারণ? কিরীটী বিকাশের মুখের দিকে তাকাল।

রাত সোয়া আটটা নাগাদ শ্যামবাজার অঞ্চলে তাঁর জুয়েলারীর দোকান বন্ধ করে বেরুতে যাবেন শ্রীমন্ত পোদ্দার, ঠিক তখন একটা ট্যাক্সি এসে থামে তাঁর দোকানের সামনে—

বলে যাও।

লোকটির যে বর্ণনা দোকানের কর্মচারীদের একজনের কাছে পাওয়া গেছে তা হচ্ছে, লোকটি মধ্যবয়সী, রোগা। পাকানো চেহারা, পরনে দামী স্যুট ছিল।

আর কিছু? আর কোন বিশেষত্ব?

না, তেমন কিছু রিপোর্ট নেই আর।

হুঁ, বলে যাও।

॥ পাঁচ ॥

বিকাশ সেন আবার শুরু করে, আগন্তুক বলে, সে আসছে কোন এক বনেদী ধনীর বাড়ি থেকে। তার কর্তা তাকে পাঠিয়েছেন, কিছু গয়নার অর্ডার দেবেন ; তাই তাঁকে একটি-বার তাঁর ক্যাটালগ বইটা নিয়ে তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীমন্ত পোদ্দার, বলাই বাহুল্য, উৎফুল্ল হয়ে সেই আগন্তুকের সঙ্গে দোকান বন্ধ করে তারই ট্যাক্সিতে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যান।

তারপর ?

সারাটা রাত তিনি বাড়িতে ফেরেন না, কাজেই ছোট ভাই ও তাঁর স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর করেন।

অবিবাহিত ছিল শ্রীমন্ত পোদ্দার ?

হ্যাঁ। তারপর যা বলছিলাম, পরের দিন সকাল ছটা নাগাদ তাঁকে গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোডে এক বেঞ্চির উপর এক ভদ্রলোক বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করেন। বেঞ্চির ওপর উপবিষ্ট, শ্রীমন্ত পোদ্দার, গলায় নীল রুমালের ফাঁস—মৃত। তিনিই একজন প্রহরারত পুলিসকে ডেকে সংবাদটা দেন। পকেটে ছিল শ্রীমন্ত পোদ্দারের একটি ব্যাগে শ'দুই টাকা, গোটা দুই চেক—প্রায় হাজার পাঁচেক টাকার, কিছু খুচরো পয়সা আর দোকানের চাবির গোছাটা।

অবিকল দেখছি তোমার শশধর সরকারের মতই ব্যাপারটা! স্রেফ হত্যার জন্যই হত্যা করা হয়েছিল শ্রীমন্ত পোদ্দারকেও তাহলে! কিরীটী বললে।

তাই তো দেখা যাচ্ছে।

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি ?

তাঁর নাম হারাধন সামন্ত। তাঁরও জুয়েলারীর একটা দোকান ছিল রাধাবাজারে। দোকানের নাম সামন্ত জুয়েলার্স। বছর চারেক হল সাজিয়ে-গুছিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গেই দোকানের পত্তন। শ্রীমন্ত পোদ্দারের মৃত্যুর ঠিক কুড়ি দিন পরের ঘটনা, তিনিও রাত আটটার পর দোকান বন্ধ করতে যাবেন, সেই সময়—

আবার এক আগন্তুকের আবির্ভাব তো ?

হ্যাঁ, তবে এবার ট্যাক্সি নয়, একটা প্রাইভেট গাড়িতে চেপে তার আবির্ভাব ঘটে। কিছু দামী জড়োয়ার গয়না কিনবে, তাই এসেছিল। সঙ্গে হাতে ঝোলানো একটা কালো রঙের অ্যাটাচি কেস।

আগন্তুককে নিয়ে সামন্তমশাই তাঁর দোকানের প্রাইভেট রুমের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন। আধঘণ্টা পরে ভদ্রলোক বের হয়ে গেলেন। কর্মচারীদের মধ্যে জনা-দুই ও দারোয়ান তখনও প্রভুর ঘর থেকে বেরোবার অপেক্ষায় বসে, কিন্তু সামন্তমশাই আর ঘর থেকে বেরোন না। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কেটে গেল, তখন একজন কর্মচারী অধৈর্য হয়েই গিয়ে দরজার সামনে এসে ডাক দিল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না সামন্তর, তাই না?

হ্যাঁ, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে কর্মচারীটি চিৎকার করে উঠল। চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট সামন্তমশাই, গলায় নীল রুমালের ফাঁস, মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে, চোখের মণি দুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসছে।

হুঁ। আচ্ছা সেই আগন্তুকের চেহারার কোন বর্ণনা পেয়েছ?

পেয়েছি। রোগা পাকানো চেহারা, চোখে কালো কাচের একটা চশমা, পরনে দামী স্যুট।

কিরীটী যেন চিন্তিত। কি যেন ভাবছে মনে হল।

বিকাশ বলতে লাগল, এবারেও কোন কিছু চুরি যায়নি।

স্বাভাবিক। কিরীটী মৃদু গলায় বললে, কারণ হত্যার জন্যই যেখানে হত্যা সেখানে তো অন্য কিছুর নিদর্শন থাকতে পারে না। ভাল কথা, সামন্তমশাই বিবাহিত ছিলেন?

হ্যাঁ। স্ত্রী ও দু ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর বছরখানেক আগেই খুব ধুমধাম করে। ছেলেদের একজনের বয়স বারো, আরেকজনের আট বছর। কিছুদিন আগে বালিগঞ্জ অঞ্চলে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতেও শুরু করেছিলেন।

আচ্ছা বিকাশ—

বলুন।

সেই রুমাল দুটো দেখেছ?

হ্যাঁ। একজিবিট হিসেবে লালবাজারেই আছে। দেখে এলাম। অবিকল সেই একই ধরনের আকাশ-নীল রঙের রেশমী রুমাল এবং তাদের একটির কোণায় ইংরাজী সাঙ্কেতিক অক্ষর '1' ১ ও অন্যটিতে '2' ২ লেখা।

কিরীটী বললে, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তিনটি হত্যার পেছনে একই ব্যক্তির অদৃশ্য হাত রয়েছে, সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইল না।

আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। বিকাশ সেন বললে।

আরও একটা ব্যাপার হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার নজরে পড়েছে বিকাশ—

কি বলুন তো?

প্রথম ব্যক্তি শ্রীমন্ত পোদ্দারের মৃত্যুর কুড়ি দিন পরেই নিহত হলেন হারাধন সামন্ত, এবং তার ঠিক দিন-কুড়ি পরে তৃতীয় ব্যক্তি নীল রুমালের ফাঁসে প্রাণ দিলেন আমাদের শশধর সরকার।

হিসেব তো তাই দাঁড়াচ্ছে!

এবং দুর্বার এক আগন্তুকের আবির্ভাব এবং তৃতীয় কিস্তিতে সামান্য অদল-বদল—a telephone call from some unknown person! হয়ত শশধরেরও দোকানে প্রবেশ করে সেই রোগা লম্বা পাকানো চেহারার আগন্তুকের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল। তাহলেই ভেবে দেখ, মোটামুটি হত্যাকারীর একটা চেহারার বর্ণনা যেমন আমরা পাচ্ছি, তেমনি এও বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারী একজন—একাধিক ব্যক্তি না। খুব planned wayতে সে হত্যা করে চলেছে একের পর এক।

আপনার কথায় তাই তো মনে হচ্ছে মিস্টার রায়!

তোমাকে এখন বাকী কাজটি করতে হবে সেন—

কোন্ কাজটা বলুন তো?

বছর,পাঁচেক আগে কি সব আভ্যন্তরিক কারণে তুমি বলছিলে না, সরকার অ্যাণ্ড সন্স বিখ্যাত জুয়েলারী প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়—

হ্যাঁ।

কেন বন্ধ হয়েছিল,—কারণটা কি, এবং সেই পরিবারের সকলে এখন কে কোথায় আছে, কে কি করে, তাদের প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম না—নিয়েছ?

না। কিন্তু আপনার কি মনে হয় মিস্টার রায়—

কি?

সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারের সঙ্গে বর্তমান হত্যা-রহস্যগুলোর কোন যোগাযোগ আছে বলে আপনার মনে হয়?

হয়ত নেই, অবার হয়ত থাকতেও পারে।

তাছাড়া ব্যাপারটা তো অনেক দিন আগেকার—

হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগেকার ব্যাপার। কি জান বিকাশ, হত্যার বীজ যে এক-এব সময় কখন কোথায় কিভাবে রোপিত হয় বা অঙ্কুরিত হতে থাকে, কেউ তা বলতে পারে না। বিশেষ করে এই ধরনের হত্যার ব্যাপার। তাই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি জানতে চাই।

বেশ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংবাদগুলো আমি আপনাকে জানাবার চেষ্টা করব। সে আর এমন কঠিনই বা কি।

আজ তাহলে আমি উঠি, বুঝলে?

চা খাবেন না?

না।

কিরীটী উঠে পড়ল।

থানা থেকে বের হয়ে কিরীটী সোজা গেল তার গাড়িতে করে ডালহৌসি স্কোয়ারে 'প্রত্যহ' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের নতুন হেড অফিসে।

সেখানকার একজন নিউজ-এডিটর সঞ্জীব লাহিড়ীর সঙ্গে কিরীটীর বিশেষ পরিচয় ছিল। অল্প বয়স, খুব চালাক-চতুর এবং চট্‌পটে ছোকরা।

সঞ্জীব তার অফিস-কামরায় ছিল না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই হয়ত সে ফিরবে একজন বলায় কিরীটী তার ঘরে বসে অপেক্ষা করতে থাকে।

বিশ মিনিট পরে সঞ্জীব ফিরে এল।

কিরীটীকে দেখে সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, দাদা যে! কি খবর?

একটা খবর চাই।

কি খবর?

কিরীটী তখন 'প্রত্যহে' প্রকাশিত বিচিত্র বিজ্ঞাপনটির কথা উল্লেখ করে বললে, একটু খোঁজ নিয়ে বলতে পার সঞ্জীব, ওই বিজ্ঞাপটা কতদিন থেকে প্রকাশ হচ্ছে এবং কে দিয়েছে?

বসুন, আমি দেখছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সঞ্জীব যা সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে এল তা হচ্ছে—বিজ্ঞাপনটি গত মাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। দিল্লী থেকে নতুন এক পাবলিশার্স কনসার্ন বিজ্ঞাপনটি দিচ্ছে। বেদপাল পাবলিশিং কোম্পানি। দরিয়াগঞ্জে তার অফিস।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে কিরীটী উঠে পড়ল।

পরের দিন সকালের প্লেনেই কিরীটী দিল্লী চলে গেল।

সেখানে মন্ত্রী মশাইয়ের বাড়িতেই তার সঙ্গে দেখা হল কিরীটীর। প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মশাই রামস্বামী বললেন, ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়ের, তেমনি অতীব দুশ্চিন্তাজনক মিস্টার রায়!

খুলে বলুন।

দপ্তরের এক বিশেষ secret document—যার মধ্যে ভারতের বর্ডারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার details ছিল, সেটা অফিস-ঘরের আয়রন সেফ থেকে খোয়া গেছে।

শেষ কবে documentটা দেখেছিলেন ?

তা দিন পনের আগে।

চুরি গেছে যে জানতে পারলেন কবে ?

দিন সাতেক আগে। প্রধান মন্ত্রী documentটা দেখতে চাইলে খোঁজ করতেই ব্যাপারটা জানা গেল।

সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকে ?

Of course সর্বদা আমারই জিম্মায়।

তার মানে, সেফটা আপনি ছাড়া আর কারও খোলবার উপায় ছিল না ?

নিশ্চয়ই না।

কে কে জানত আপনার অফিসের documentটা সম্পর্কে ?

আমার personal secretary মিস্টার প্রতাপ সিং ছাড়া আর কেউ জানত না।

তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

করেছি। সে কিছু বলতে পারছে না।

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব বিশ্বাসী ?

নিঃসন্দেহে।

কোথায় যেতে পারে বলে দলিলটা আপনার মনে হয়—মানে documentটা ? Any idea ?

খবর পেয়েছি সেটা পাকিস্তানে চালান হয়ে গেছে।

ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তাতে নিশ্চয়ই ?

ক্ষতি! তা কিছুটা তো আছে বটেই। কিন্তু তার চাইতেও বেশি যেটা চিন্তার কারণ হয়েছে, এভাবে যদি secret documents সেফ থেকে পাচার হয়ে যেতে থাকে—

সমূহ বিপদ!

বলুন তাই নয় কি ? প্রধান মন্ত্রী তো বিশেষ খাপ্পা হয়েছেন—

স্বাভাবিক।

একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে, যেমন করে হোক!

আপনাদের Secret Intelligence Branchএর officerরা করতে পারলেন না ?

তারা ওইটুকু সংবাদই সংগ্রহ করতে পেরেছে। সেগুলি পাকিস্তানে চালান হয়ে গেছে। I want your help, মিস্টার রায়।

দেখি কি করতে পারি।

মন্ত্রী মশাইয়ের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে কিরীটী বেদপাল পাবলিশিং কোম্পানির খোঁজে দরিয়াগঞ্জে গেল।

কিন্তু যা সে মনে মনে আশঙ্কা করেছিল—ওই নামে কোন পাবলিশিং কোম্পানির কোন অস্তিত্বই নেই।

॥ ছয় ॥

দিন চারেক বাদে কিরীটী কলকাতায় ফিরে এল।

আগেই দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ককল করে দিয়েছিল কিরীটী, গাড়ি এয়ারপোর্টে পাঠাবার জন্য।

বাড়ি পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢুকতেই দেখে সুব্রত বসে আছে।

সুব্রত জানত কেন কিরীটী দিল্লী গেছে। সে বললে, কি হল, দিল্লীর ব্যাপারের কোন হদিস করতে পারলি?

ব্যাপারটা জটিল। সময় শেষ, তবে মনে হচ্ছে—

কি?

কিরীটী সোফার ওপরে বসে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে, আমাদের বিকাশ সেনকে কথা দিয়েছি, নচেৎ কটা দিন ওখানে আরও থেকে প্রাথমিক ব্যাপারটা শেষ করে আসতাম।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল তার হাতে ছোট একটা ট্রের উপরে ধূমায়িত দু কাপ কফি নিয়ে।

শরীর ভাল আছে তো? কৃষ্ণা সহাস্যে শুধায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

কফির কাপটা হাতে নিতে নিতে কিরীটী বললে, ভাল। নে সুব্রত।

সুব্রতও একটা কাপ তুলে নিল। কৃষ্ণা পাশেই বসল কিরীটীর।

শীতের ছোট বেলা বাইরে তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পড়ন্ত আলোর সঙ্গে একটা আবছায়া ঘনাচ্ছে যেন।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললে, এখানেও বেশ শীত পড়েছে দেখছি।

সুব্রত বললে, হঁ্যা, পরশু থেকে। দিল্লীতে শীত কেমন পেলি?

রাজধানীর ব্যাপার তো, কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, হাড়-কাঁপানো! তারপর তোর হীরেন সরকারের সঙ্গে দেখা করেছিলি সুব্রত?

গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলি? কবে আসছে?

তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

কেন? আসতে চায় না বুঝি?

না। বেচারী মাস আষ্টেক ধরে একেবারে শয্যাশায়ী।

শয্যাশায়ী! কি হয়েছে কি?

লোয়ার মটোর প্যারালিসিসে পা দুটো পঙ্গু, শয্যা থেকে উঠতেই পারে না। রোগা হয়ে গেছে।

তাই নাকি!

তাই দেখলাম। বললে তুই ডেকেছিস, আলাপ করতে চাস—এ যে তার কি সৌভাগ্য! কিন্তু আসতে পারবে না—

কিরীটী বললে, তাতে আর কি হয়েছে, আমরাই না হয় যাব আজ।

আজই যাবি?

হঁ্যা। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা একটিবার বিশেষ দরকার। তা ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন দেখলি? দোকান উঠে যাবার পর—

দোকানটা ওদের তিনজনের ছিল—মানে জ্যাঠতুত, খুড়তুত তিন ভাইয়ের। ওদের বাবা কাকা জ্যাঠারা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন।

তারপর?

ওরা তিন ভাই-ই দোকানটা দেখাশোনা করছিল—চলছিলও বেশ। হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল, ভেতরে ভেতরে শনির দৃষ্টি পড়েছে দোকানটার ওপরে।

তাই বুঝি?

হঁ্যা। যেদিন ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হল, অর্থাৎ ওরা জানতে পারল, দেখলে ওদের কারিগরেরাই ওদের পথে বসিয়েছে।

কারিগরেরা পথে বসিয়েছে কি রকম?

আসলে ওদের তিনজনের একজনও কাজকর্ম কিছু জানত না। ধনী গৃহের ছেলে,—সোনার চামচ মুখে দিয়ে সব জন্মেছিল। কখনও দোকানের কাজকর্ম যেমন কিছু শেখবার চেষ্টা করেনি, তেমন কাজকর্মও বুঝত না। ওদের ছোট কাকাই সব দেখা-

শোনা করছিল, তার আর দু ভাইয়ের মৃত্যুর পর ওরা মধ্যে মধ্যে সেজেগুজে দোকানে আসত আর মোটা মাসোহারা নিত। তিন ভাই দামী দামী গাড়িতে চড়ত, বাবুয়ানী করত। একজনের ছিল রেস খেলার বাতিক, একজনের দেশভ্রমণের বাতিক, আর হীরেনের ছিল থিয়েটারের বাতিক—

থিয়েটার !

হ্যাঁ। ভাল চেহারা না থাকলেও অভিনয় সে ভালই করত। নামও করেছিল। একটা নামকরা পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অ্যামেচার অভিনেতা হিসাবে অভিনয় করত। হীরেনের বাবা আগেই মারা গিয়েছিল। ছোট ভাই কর্তাদের মধ্যে। মেজ কর্তার সন্তানাদি ছিল না। বড়কর্তার দুই ছেলে—হরেন্দ্র আর নীরেন্দ্র।

কিরীটী নিঃশব্দে শুনতে থাকে।

বাইরে আসন্ন সন্ধ্যার ধূসরতা নামে। সেই সঙ্গে শহর কলকাতার চাপ-চাপ ধোঁয়া।

সুব্রত বলতে লাগল, ছোটকর্তার মৃত্যুর পর তিন ভাই দোকানে বসতে শুরু করল। তবে ওই নামেই—সব ভরসা কর্মচারীদের ওপরেই। কেউ কোন কাজ জানে না। ওরা যা করে, যা বোঝায়—তাই ওরা বোঝে।

মাস আষ্টেক বাদে এক খরিদ্দার এল—ভদ্রলোক তো মহা খাপ্পা—

কেন ?

যে গহনা তিনি করে নিয়ে গিয়েছেন, তার যোল আনার মধ্যে বারো আনাই নাকি খাদ। পরীক্ষা করে দেখা গেল কথাটা মিথ্যা নয়, সত্যিই তাই। ওরা আর কি করে, খেসারত দিল মোটা টাকার।

Interesting !

কেবল ওই খরিদ্দারটিই নয়—বিরাট ঢালাও কারবার, মাস দুয়েকের মধ্যে আরও বিশজন খরিদ্দার ওই একই কমপ্লেন নিয়ে এল। সোনায়ই যে কেবল খাদ তাই নয়, জড়োয়া গয়নার মধ্যে যে সব জুয়েল দিয়েছে তাও মেকী।

তিন ভাই মাথায় হাত দিয়ে বসল, এ কি ব্যাপার ! কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে, তলে তলে দোকান ফাঁক। সোনা যত স্টকে ছিল এবং যত রেয়ার জুয়েলস ছিল, সব উধাও। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দোকানটা। সব চাইতে পুরনো চারজন কর্মচারী ছিল—তাদেরও তারা ডাকল, এবং কর্মচারী চারজন কারা জানিস ?

জানি। শশধর, শ্রীমন্ত আর হারাধন নিশ্চয়ই ? কিরীটী বললে।

তুই জানলি কি করে ?

জানি। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তির নামটি কি শিবানন্দ বসু ?

তুই জানলি কি করে ?

জানি। তারপর একটু থেমে বললে, তাহলে দেখছি, আমার অনুমান ভুল নয়। কিরীটীর চোখের মণি দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণা বললে, কেমন করে ওদের নাম তুমি জানলে গো? শশধর, শ্রীমন্ত আর হারাধন না হয়—

বিজ্ঞাপনের কবিতাটা তোমরা ভুলে গেলে কৃষ্ণা। তাছাড়া শিবানন্দ যে এসেছিল নিজেই।

তবে? কৃষ্ণা সুধায়।

কি তবে?

তাকেও মরতে হবে নাকি?

অঙ্ক অনুযায়ী তাই তো হওয়া উচিত। কবিতার মিলের জন্যই। যাক, ধোঁয়াটে ব্যাপারটা পরিষ্কার এখন বোঝা যাচ্ছে। খুব জটিল নয়।

হত্যাকারীকে ধরতে পেরেছ? কৃষ্ণা শুধায়।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, একেবারে যে পারছি না তা নয়। তবে উদ্দেশ্যটা—হত্যার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর মোটিভ যখন জানা গেছে, বাকি রহস্যটুকুও উদ্‌ঘাটিত করতে আর বেশি বেগ পেতে হবে না। তুই বস্ সুব্রত, স্নান করে জামা-কাপড়টা বদলে আসি।

কৃষ্ণা আর সুব্রত বসে বসে গল্প করে।

কিরীটী ভেতরে চলে যায়।

আধ ঘণ্টা পরে কিরীটী ফিরে এল। পরনে তার গরম পায়জামা ও পাঞ্জাবি, গায়ে একটা সাদা শাল।

সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, উত্তিষ্ঠ বৎস!

এখন কোথায় আবার বেরুবি?'

কোথায় মানে? তোর সেই পরিচিত পঙ্গু ভদ্রলোক হীরেন সরকারের ওখানে!

এখুনি?

আজই এবং ইমিডিয়াটলি। চল্, ওঠ্। বেশি রাত হয়নি, মাত্র আটটা—শীতের রাত, এমন কিছু নয়।

সুব্রত জানে কিরীটীকে থামানো যাবে না। ও যখন যাবে বলেছে, তখন যাবেই কাজেই সে উঠে দাঁড়াল।

এই রাত্রে না গিয়ে কাল সকালে গেলেই হত!

না না, চল্। হীরেনের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

কথন ফিরবে? কৃষ্ণা শুধায়।

বৌবাজার থেকে ফিরতে আর কতক্ষণ লাগবে! কিরীটী বলে।

সুব্রত বলে, সে তো বৌবাজারে থাকে না। সে এজমালি পৈতৃক বাড়ি তো কবেই দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে সরকারদের।

তবে? ভদ্রলোক এখন থাকেন কোথায়?

ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছে হীরেন অন্য একটা বাড়িতে থাকে।

তাই নাকি? তবে তো সে কাছেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তো তাহলে ফিরতে পারব। নে, চল্।

ওরা দুজনে বের হয়ে গেল।

॥ সাত ॥

ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছাকাছি—বাঁয়ে একটা রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে ঢুকে একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ি।

নিচের ঘরে আলো জ্বলছিল। কলিংবেল টিপতেই একটু পরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল, কে?

ওরা দুজনে দরজার গোড়াতেই তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণী। পাতলা দোহারা চেহারা। পরনে একটা সিল্কের শাড়ি। চোখ-মুখ খুব সুশ্রী না হলেও উচ্ছল যৌবনরসে ও প্রসাধনে সুন্দরই দেখাচ্ছিল তরুণীকে। দু'হাতে চারগাছা করে সোনার চুড়ি।

কাকে চান?

সুব্রতই কথা বললে, হীরেন বাড়ি আছে?

আছেন। তরুণী বললে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তখন তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুব্রত বললে, বলুন গিয়ে তাকে, সুব্রত এসেছে—সঙ্গে কিরীটী।

নিচের ঘরে ওদের বসিয়ে তরুণী ওপরে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে ওদের বললে, কিন্তু এখন তো দেখা হবে না।

হবে না? কেন?

তিনি ঘুমোচ্ছেন।

ঘুমোচ্ছে! এত তাড়াতাড়ি? সুব্রতই আবার প্রশ্ন করে।

রোজ এই সময়টা ঘুমের ওষুধ খান রাত্রে ঘুম হয় না বলে। ইঞ্জেকশান দেবার পর ঘুমোচ্ছেন।

ও:। তাহলে আর কি হবে! কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে সুব্রত।

কিরীটী বললে, হুঁ। চল্, ফেরা যাক।

আচ্ছা, নমস্কার। আসি।

তরুণীও প্রতিনমস্কার জানালো দুটি হাত তুলে, নমস্কার।

ফিরে এসে ওরা গাড়িতে উঠে বসল।

কিধার জায়গা সাব? হীরা সিং শুধায়।

একবার শ্যামবাজার চল হীরা সিং—নাট্যমঞ্চ থিয়েটারে।

হীরা সিং গাড়ি ছেড়ে দিল।

সুব্রত একটু যেন বিস্মিত হয়েই বলে, আজ তো বুধবার, থিয়েটার নেই!

জানি। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে।

তবে?

সজনীবাবু নিশ্চয়ই আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।

সজনী গুপ্ত নামকরা একজন নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক এবং দীর্ঘদিন ধরে নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত।

গাড়ি চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। কিরীটী চুপচাপ বসে সিগার টানছে।

ব্যাপার কি বল্ তো কিরীটী, হঠাৎ নাট্যমঞ্চে কেন?

সন্দেহের একটা নিরসন করব মাত্র। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

কিসের সন্দেহ?

চল্ না!

থিয়েটারের সামনে যখন ওরা এসে নামল, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। কাউন্টার বন্ধ, তবে লবিতে আলো ছিল।

লবিতে দেওয়ালের শো-কেসে বর্তমান নাটকের সব স্টীল টাঙানো। কিরীটী গেটে উপবিষ্ট দারোয়ানকেই শুধাল, সজনীবাবু হ্যায় দারোয়ান?

জী। উপরমে।

ওরা ওপরে উঠে গেল দোতলার সিঁড়ি দিয়ে। সরু প্যাসেজটার শেষপ্রান্তে সজনী গুপ্তর ঘর।

কিরীটী আর সুব্রত ঘরে ঢুকতেই সজনী বললেন, আসুন, আসুন—কি সৌভাগ্য

আমার। বসুন, বসুন।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসতে বসতে কিরীটী বললে, সজনীবাবু, আপনার নতুন নাটকের স্টীল দিয়ে নিশ্চয়ই একটা অ্যালবাম তৈরি করেছেন ?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

আছে সেটা এখানে ?

আছে।

একবার দেখতে পারি ?

দাঁড়ান, আগে চায়ের কথা বলি। সজনী বেল বাজালেন।

বেয়ারা রামলাল এসে ঘরে ঢুকতেই তিনি আবার বললেন, তিন কাপ ভাল চা নিয়ে আয় রামলাল।

রামলাল চলে গেল।

সজনী ঘরের আলমারী খুলে একটা ফটোর অ্যালবাম বের করে কিরীটীর সামনে এগিয়ে দিলেন।

সুব্রত তখনও বুঝে উঠতে পারছে না, ব্যাপারটা কি ! কেন কিরীটী এখানে এল আর কেনই বা তার চলতি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যগুলোর অ্যালবামের প্রয়োজন হল।

কিরীটী অ্যালবামটা টেবিলের উপরে রেখে পাতা উল্টোতে উল্টোতে চতুর্থ পৃষ্ঠায় একটি ফটোর প্রতি সজনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, এই মেয়েটি কে সজনীবাবু ?

ও তো সঞ্চারিণী বিশ্বাস !

সুব্রতও ততক্ষণে ফটোটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে এবং ঝুঁকে পড়েই চমকে উঠেছে। কোথায় যেন মেয়েটিকে সে দেখেছে ! কিন্তু কোথায় দেখেছে, সেই মুহূর্তে কিছুতে মনে করতে পারলে না।

মেয়েটি কতদিন আপনার থিয়েটারে আছে ?

তা প্রায় বছর পাঁচেক হল। কিছু বেশিও হতে পারে। Talent আছে মেয়েটির। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ঘরের মেয়ে—, কেন বলুন তো ?

হীরেন সরকারকে আপনি জানেন ?

জানব না কেন— এক সময় তো এখানে অভিনয় করত, এখানকারই আর্টিস্ট ছিল !

অভিনয়-ক্ষমতা কেমন ছিল ?

খুব ভাল অভিনয় করত। বেচারী হঠাৎ মাস আষ্টেক আগে কি হয়ে যেন পঙ্গু হয়ে গেছে—একেবারে শয্যাশায়ী।

থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন ?

হ্যাঁ।

সঞ্চারিণী বিশ্বাসের সঙ্গে হীরেন সরকারের যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল, তাই না?

সজনী হাসলেন।—ঠিক। এখনও বোধ হয় তার keepingয়েই আছে সঞ্চারিণী।

হীরেন সরকারের তো আর্থিক অবস্থা এখন তেমন সুবিধার নয়, তবে—

তবু কেন সঞ্চারিণী তার সঙ্গে আছে, তাই না?

হ্যাঁ।

ওসব মশাই ভালবাসাবাসির ব্যাপার—দুর্জ্ঞেয়!

কিরীটী হেসে বললে, তাই দেখছি।

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল।

চা পান করতে করতে একসময় কিরীটী বললে, অসুখ হবার পর হীরেন সরকারের সঙ্গে আপনার আর কখনও দেখা হয়েছে সজনীবাবু?

না। ওই সঞ্চারিণীর কাছেই মধ্যে মধ্যে তার খবর পাই।

রাত নটা নাগাদ অতঃপর কিরীটী উঠে দাঁড়াল।—আজ চলি সজনীবাবু।

কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, হঠাৎ সঞ্চারিণী ও হীরেন সরকারের খোঁজখবরের আপনার কি প্রয়োজন হল রায়সাহেব? সজনী প্রশ্ন করলেন।

একটা কবিতার শেষ পংক্তি মিলছিল না, সেটা মেলাবার জন্য এসেছিলাম আপনার কাছে।

কবিতার শেষ পংক্তি! কথাটা বলে সজনী কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকান কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ। আচ্ছা চলি। Good night.

সুব্রতর কাছে ব্যাপারটা তখন স্পষ্ট হয়ে গেছে।

দুজনে এসে আবার গাড়িতে উঠে বসল।

কিরীটী বললে, কোঠি চল হীরা সিং।

হীরা সিং গাড়ি ছেড়ে দিল।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আহারাদির পর কিরীটী, সুব্রত ও কৃষ্ণা তিনজনে বসবার ঘরে এসে বসল। জংলী ওদের কফি দিয়ে গেল।

এতক্ষণ কিরীটী একটা কথাও বলেনি, সুব্রতও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তবে কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও, সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছিল, কোন কিছুর একটা সমাধানের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে সে পৌঁছেছে।

ভ্রূ-যুগল সরল। চোখে একটা আনন্দের দীপ্তি ঝকঝক করছে।

কিরীটী ?

উঁ।

মনে হচ্ছে যেন—

কিসের কি মনে হচ্ছে ?

নীল রুমালের রহস্য যেন তোর কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে !

তা এসেছে। চারের অঙ্ক প্রায় মিলের মুখে। এখন কেবল শেষ পর্বের শেষ অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়টি বাকি।

মানে ?

শিবানন্দ-কাহিনী—

শিবানন্দ !

হ্যাঁ। প্রথমে শ্রীমন্ত, তারপর হারাধন, তারপর শশধর, এইবার শ্রীমান শিবানন্দের পালা। আর তাহলেই গ্রন্থ সমাপ্ত। কিন্তু ওই সঙ্গে একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানিস ?

কি ?

ওরা প্রত্যেকেই deserved it ! তাহলেও একটা কথা থেকে যাচ্ছে—

কৃষ্ণা শুধোয়, কি গো ?

কিরীটী বললে, আইন যদি সবাই যে যার খুশি মত হাতে তুলে নেয়, তাহলে আইন বলে আর কোন কিছুই থাকে না। আইন-আদালত সব প্রহসন হয়ে যায়। তাই বলছিলাম—

কি ? স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা প্রশ্নটা করে।

আইন ভাঙার দণ্ড আইনভঙ্গকারীকে মাথা পেতে নিতেই হবে। শান্ত গলায় কিরীটী জবাব দিল।

সুব্রত বললে, শিবানন্দকে তুই বাঁচাতে পারবি ?

পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করব। তার বাড়ির চারপাশে পাহারাও রাখা হয়েছে।

বাইরে শীতের রাত তখন নিঝুম হয়ে এসেছে।

সুব্রত হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, এবারে তাহলে উঠি রে—

কিরীটী বলে, মাথা খারাপ নাকি !

কৃষ্ণা বলে, আরে, তোমার বিছানা আমি করে রেখেছি।

॥ আট ॥

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, একেই বলে সুগৃহিণী।

কৃষ্ণাও হাসতে হাসতে প্রত্যুত্তর দেয়, তুমি কি বুঝবে গৃহিণীর স্বাদ—চিরটা কাল তো ব্রহ্মচর্য আশ্রমেরই পাণ্ডাগিরি করলে!

সুব্রত সখেদে বলে ওঠে, হায় ব্রুটাস, তুমিও—না, একটা ব্যবস্থা এবারে করতে হয় দেখছি—

কৃষ্ণা উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, সত্যি বলছ! কুন্তলাকে তাহলে সুসংবাদটা—

তিষ্ঠ—তিষ্ঠ দেবী, অত ব্যাকুল হয়ো না। সুব্রত বলে, আগে কৌশলে না হয় তার মতামতটা জেনে নাও।

সে আর জানতে হবে না, কৃষ্ণা বলে, হুঁ—বলে পাগলা খাবি, না আঁচাব কোথায়!

না না দেবী কৃষ্ণা, সে ভদ্রমহিলাটিকে তাহলে এখনও সম্যক চিনতে পারনি।

তাই বুঝি! আচ্ছা দেখি—

কিরীটী বাধা দেয়, কেন বাজে সময় নষ্ট করছ কৃষ্ণা, ও মহাপাষণ্ড, ওর মুক্তি নেই।

সুব্রত হো হো করে হেসে ওঠে, দেখছ! কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তোমার স্বামীরত্নটি আমাকে কেমন চিনেছে! কিন্তু রাত কত হল?

সকলেই দেওয়ালের গায়ে বসানো সুদৃশ্য ইলেকট্রিক ওয়াল-ক্লকটির দিকে একসঙ্গে দৃষ্টিপাত করল।

রাত এগারোটা বেজে দশ মিনিট।

সুব্রত বললে, না, এমন কিছু রাত হয়নি।

কৃষ্ণা হেসে বলে, কফি চাই তো?

সুব্রত বলে, এই জন্যই তো তোমাকে আমার এত পছন্দ—

খুব হয়েছে। বসো আনছি।

কেন, জংলী—

জংলী! তার এখন মধ্যরাত্রি।

বলতে বলতে কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রত তার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণাও এতক্ষণে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত প্রায় পৌনে একটা।

শীতের রাত্রি, বাইরে যেন বরফ ঝরছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে প্রচণ্ড। কিরীটী ঘুমোয়নি। সোফা-কাম বেডটার ওপরে পিঠের তলায় একটা ডানলোপিলোর বালিশ দিয়ে মুখে পাইপ গুঁজে আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় রয়েছে। চোখ দুটি বোজা।

ব্যাপারটা মোটামুটি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিরীটীর কাছে।

দীর্ঘদিনের স্বর্ণব্যবসায়ী সরকার ব্রাদার্সের অত বড় নামকরা প্রতিষ্ঠানের ইমারতের তলায় কতকগুলো দুষ্টু ইঁদুর বাসা বেঁধেছিল এবং পুরাতন মালিকদের মৃত্যুর পর নতুন সব অনভিজ্ঞ তরুণ মালিকদের হাতে যখন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এসে পড়ল, সেই সুবর্ণ সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে দুষ্টু ইঁদুরের দল এতটুকু দেরি করেনি।

কৌশলে ওদের অনভিজ্ঞতার সুযোগে প্রতিষ্ঠানটাকে ক্রমশঃ একটু একটু করে শোষণে শোষণে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।

নদীর এক পাড় ভেঙেছে, অন্য পাড় গড়ে উঠেছে।

হীরেন সরকাররা তিন ভাই সর্বস্বান্ত হয়েছে, আর অন্য দিকে শশধর, শ্রীমন্ত, হারাধন ও শ্রীমান শিবনাথ নিভৃতে ওই বৃদ্ধদের চোখের আড়ালে আখেরটাই নিজের নিজের কেবল গুছিয়ে নেয়নি, এক-একজন শাঁসালও হয়ে উঠেছে।

তারপর একদিন অকস্মাৎ ভ্রাতৃত্রয়ের যখন চেতনা হল, তখন ওই চার মূর্তিকে ধরা-ছোঁয়ার আর উপায় নেই। প্রমাণ নেই—কোন প্রমাণ নেই!

অতএব যা হবার তাই হল, অতদিনকার অত বড় প্রতিষ্ঠানটা পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হল।

ওর সঙ্গে নাটকের প্রথম অঙ্কের উপরে হল যবনিকাপাত।

তারপর বেশ কিছুদিন পরে শুরু হল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। আবার যবনিকা উত্তোলিত হল রঙ্গমঞ্চের।

শ্রীমন্ত, শশধর, হারাধন, শিবানন্দ—যে যার মত করে জুয়েলারি শপ খুলে ব্যবসা শুরু করে দিল, সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে অর্জিত মূলধন নিয়ে। দিনে দিনে সকলেরই ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হাস্যে তাদের প্রতি কৃপাবৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু চার মূর্তি তখনো কল্পনাও করতে পারেনি, তাদের ভাগ্যাকাশে মেঘের সঞ্চার শুরু হয়েছে।

মেঘ ক্রমশঃ ঘন হতে ঘনতর হতে থাকে।

তারপরই অতর্কিতে এল বজ্রাঘাত—সেই মেঘের বুক থেকে।

শ্রীমন্তকে তার মূল্য শোধ করতে হল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। নম্বর এক।

তারপরই বজ্র নামল হারাধনের মাথায়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তারও হল। নম্বর দুই।

দুজনের প্রায়শ্চিত্ত দিবসের মধ্যে মাত্র কুড়ি দিবসের ব্যবধান। ঠিক কুড়িদিন পরে আবার বজ্র নেমে এল। এবারে শশধর—নম্বর তিন।

কি চমৎকার অঙ্ক-শাস্ত্রানুযায়ী বিচার!

কোথাও কোন ত্রুটি বা ভুলচুক নেই। একটি একটি করে বোড়ের চাল।

এবারে মধ্যে আর দিন তের-চোদ্দ বাকি। পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী যদি চলতে থাকে তাহলে চতুর্থ—অর্থাৎ চারে বেদ—শ্রীমান শিবানন্দ।

আর তাহলেই দ্বিতীয় অঙ্কের উপরে যবনিকাপাত।

ঘটনাচক্রে তার দৃষ্টিতে যদি ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা না পড়ত, তাহলে হয়ত নাটক দ্বিতীয় অঙ্কেই নিঃশব্দে শেষ হয়ে যেত।

প্রেক্ষাগৃহে অন্ধকার নেমে আসত। আর হয়ত কোনদিনই আলো জ্বলত না।

কিরীটী কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আপন মনেই মৃদু হাসে।

কিন্তু ওই নাটকের সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে মঞ্চের গ্রীনরুমে আরও একটি যে নাটক সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রধান অভিনেতাটি কে?

নেপথ্যে থেকে কার অদৃশ্য কালো হাত একের পর এক নীল রুমালের ফাঁস গলায় পরাচ্ছে? নটশিরোমণি সেই ব্যক্তি সন্দেহ নেই!

কি গো, শোবে না?

কিরীটীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায় কৃষ্ণার ডাকে।

কে? ও, কৃষ্ণা!

শুতে যাবে না? রাত যে শেষ হতে চলল?

কটা রাত?

রাত আড়াইটে।

হ্যাঁ, চল।

কিরীটী শয়নকক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিল।

পরের দিন সকালে কিরীটীর যখন নিদ্রাভঙ্গ হল, অনেক বেলা হয়ে গেছে, বেলা প্রায় সাতটা।

প্রচুর রোদে ঘর ভরে গেছে।

কৃষ্ণা বার-দুই এসে চা নিয়ে ফিরে গেছে। ঘুমোচ্ছে দেখে কিরীটীকে আর ডাকেনি।

সাতটা নাগাদ কিরীটীর ঘুম ভাঙতেই দেখে ঘরে ঢুকছে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা বললে, চা আনি ?

কিরীটী বললে, হ্যাঁ, নিয়ে এস। কিন্তু ডাকনি কেন, এত বেলা হয়ে গেছে !

কৃষ্ণা বললে, তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও, আমি চা আনি।

সুব্রত উঠেছে ?

কখন। বিকাশবাবু তো কোন্ সকালেই এসে হাজির—তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে !

বিকাশ এসেছে। যাক, নচেৎ আমাকেই যেতে হত তার ওখানে।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী হাত-মুখ ধুয়ে বসবার ঘরে এসে যখন ঢুকল, সুব্রত তখন বিকাশ সেনকে তাদের গতরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করছিল।

কিরীটীকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিকাশ বললে, সরকার-বাড়ির সব ঠিকুজিনক্ষত্র যোগাড় করে ফেলেছি, রায়সাহেব !

বসতে বসতে মৃদু হেসে বললে কিরীটী, চা-জলখাবার হয়েছে ?

মিসেস রায় কি বাকি রেখেছেন তা—অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

জংলী ওই সময় ট্রেতে করে তিন কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

চা পান করতে করতে কিরীটী বললে, বল, এবার শোনা যাক, কি সংবাদ সংগ্রহ করলে !

তিন ভাই—, বিকাশ বললে।

তা তো জানি।

শুনেছেন তাহলে ? মেজ ভাইয়ের কোন সন্তানাদি ছিল না। বড় ভাইয়ের দুই ছেলে নীরেন্দ্র, হরেন্দ্র, আর ছোট ভাইয়ের এক ছেলে হীরেন্দ্র।

তা আগেই শুনেছি, কিন্তু হরেন্দ্র এবং নীরেন্দ্র এখন কি করছে ? কি করে তাদের চলে, জানতে পারলে কিছু ?

হীরেন্দ্র অসুস্থ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কারও সঙ্গে দেখা করে না।

তাও জানি। আর বাকি দুজন ?

ওদের মধ্যে দেখলাম, সদ্ভাব নেই। বিজনেস গুটিয়ে ফেলবার পর—যদিও একই বাড়িতে থাকে এখনও, ধার-দেনা শোধ করেও যা অবশিষ্ট ছিল তাও কম নয়।

কলকাতার ওপরে খান-দুই বাড়ি। একটা ল্যান্সডাউন মার্কেটের সামনে, অন্যটা শ্যামবাজার অঞ্চলে। নীরেন্দ্র ও হরেন্দ্রের ভাগে শ্যামবাজারের বড় বাড়িটা পড়ল, ছোট বাড়িটা পেল হীরেন্দ্র। নগদ টাকাও ওদের কিছু ছিল, তাও ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল।

তারপর? কিরীটী শুধায়।

নীরেন্দ্র বড় ভাই ওদের মধ্যে, কোন মতে সামলে-সুমলে নিয়ে এখন পুরাতন মোটরের বেচা-কেনার ব্যবসা করে। মোটামুটি ভালই চলে যাচ্ছে। হরেন্দ্রের আগে থাকতেই রেস খেলার নেশা ছিল, এখনো আছে। সংসারে স্ত্রী ও দুটি মেয়ে, দুটিই বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। শ্যামবাজারের বাড়ির নিচের তলাটা সে নিয়ে থাকে।

সংসার চলে কি করে তার? রোজগারপত্তর কি?

সেটাই আশ্চর্য! কিছুই তেমন করে না—যতদূর সংবাদ পেয়েছি। তবে বেশ সচ্ছলতার সঙ্গেই চলে যায় বলে মনে হল। কিন্তু বেশি প্রশ্ন করতে পারিনি।

কেন?

যেমন ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কা চেহারা, তেমনি কাঠগোঁয়ার, বদমেজাজী। মানে মানে সরে এসেছি।

আর নীরেন্দ্র।

ভদ্রলোক যথেষ্ট অমায়িক, ভদ্র। বললেন, দেখুন না, বরাতের ফের—কি ছিলাম আর কি হয়েছি। কোন্ বংশের ছেলে হয়ে আজ পুরনো গাড়ি বেচাকেনার ব্যবসা করছি।

ওদের মুখে কিছু শুনলে না আর? ব্যবসাটা গেল কেন?

হ্যাঁ, ওদের কজন পুরনো কর্মচারীই নাকি ওদের পথে বসিয়েছে যোগসাজস করে, চুরি করে একত্রে।

শ্রীমন্ত, শশধর, হারাধন আর শিবানন্দ,—তাও জানি।

হ্যাঁ। ওদের ওপর দেখলাম হরেন্দ্রবাবুর ভীষণ রাগ। পারলে যেন টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে।

কিরীটী হেসে বললে, স্বাভাবিক।

॥ নয় ॥

এবার কি কর্তব্য বলুন?

কথাটা বলে বিকাশ সেন প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করতে হবে! কেন?

প্রশ্নটা করে বিকাশ সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কারণ হত্যাকারী এখন তার চতুর্থ শিকারটিকে খতম করার প্ল্যান করছে——কি-ভাবে এবারে নীল রুমাল হাতে আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটবে—

কিন্তু—

ভয় নেই বিকাশ, এবারে অত সহজে তাকে কাজ হাসিল করতে দেওয়া হবে না।

সত্যি-সত্যিই দেখা গেল কিরীটী যেন নীল রুমালের দ্বারা হত্যাকাণ্ডগুলির ব্যাপারে একেবারে হাত ধুয়ে বসে আছে। ও যেন ভুলেই গেছে ব্যাপারটা।

দিন দুই পরে আবার সে দু'দিনের জন্য ট্রাঙ্ককল-পেয়ে দিল্লী থেকে ঘুরে এল।

আরও দিন দুই পরে।

গত সন্ধ্যা থেকেই অসময়ে আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ফলে শীতটাও যেন হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

কিরীটী গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে আরাম করে বিছানার ওপর বসে-বসেই গরম গরম কফি পান করছিল।

এমন সময় জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবুজী!

কি রে?

বিকাশবাবু!

কিরীটী আর মুহূর্ত দেরি করে না। সঙ্গে সঙ্গে কফি শেষ করে কম্বলটা গা থেকে ফেলে উঠে দাঁড়াল। পাশে খাটের বাজু থেকে গরম ড্রেসিং গাউনটা টেনে গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা এসে বসবার ঘরে ঢুকল।

কি খবর বিকাশ—সকাল বেলাতেই—

যা হবার তা হয়ে গেছে মিস্টার রায়। হতাশায় স্বরে বলে উঠল বিকাশ সেন।

সত্যি!

হ্যাঁ, নীল রুমাল আবার ফাঁস লাগিয়েছে—

কোথায়?

বালিগঞ্জে বোস অ্যাণ্ড কোং জুয়েলারী শপের প্রোপ্রাইটার—

কে, শিবানন্দ?

হ্যাঁ, শিবানন্দ বসু। বিকাশ বলে।

আশ্চর্য! ভাবতে পারিনি, সে এত তাড়াতাড়ি আবার নীল রুমাল হাতে নিয়ে আবির্ভূত হবে। এবারে আমার ক্যালকুলেশনটা দেখছি ভুল হয়ে গেল।

ভুল হয়ে গেল!

হ্যাঁ। ভেবেছিলাম, হত্যাকারী এবারে আরও সতর্ক হবে। কিন্তু দেখলাম, হাতের পাঁচ আর সে হাতে রাখতে চায় না—আগেভাগেই মিটিয়ে দিয়ে প্রোগ্রামটা তার খতম করতে চায়। তা সংবাদটা পেলে কখন? কার কাছে?

রথীন তালুকদার তো এখানকার থানার ও. সি—সেই-ই আমাকে ঘণ্টাখানেক আগে জানাতেই, সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে, সংবাদটা দিতে আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

রথীনবাবু কখন জানতে পারলেন?

শেষ রাত্রে।

কি করে জানলেন?

Some unknown person ভোর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ তাকে ফোন করে সংবাদটা দেয়—

কি সংবাদটা দিয়েছিল?

Rather interesting! ফোনে তাকে বলে, ও মশাই থানা-অফিসার, ঘুমোচ্ছেন এখনও? আপনার এলাকায় যে নীল রুমাল ফাঁস পরিয়েছে—বোস অ্যাণ্ড কোং জুয়েলারি শপের প্রোপ্রাইটারকে! বলেই ফোন কনেকশন কেটে দেয়। বুঝতেই পারছেন, এ শহরের সব থানা-অফিসারদের মধ্যে আমাদেরও এ নীল রুমালকে কেন্দ্র করে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল—প্রত্যেকেই যেন আমরা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। তাই ফোনটা পাওয়া মাত্রই রথীন কালবিলম্ব না করে তখুনি ছুটে যায়।

তারপর?

দোকানঘরের কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া ছিল না, রথীন দুজন কনস্টেবল নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল, ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছিল—

দারোয়ান—কোন দারোয়ান ছিল না?

না। দোকানে রাত্রে যে দারোয়ানটি পাহারায় থাকত, তার কোন পাত্তাই নেই। পরে অবিশ্যি তাকে মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দোকানের পেছনে একটা ঘরে পড়ে থাকতে দেখা যায়—গোঁ গোঁ করছিল, যাক যা বলছিলাম, দোকানের কোলাপসিবল গেটটায় তালা দেওয়া ছিল না, কেবল টানা ছিল।

রথীনবাবু কি করলেন?

ওই সময় সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল।

বিকাশ বলতে থাকে, সে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল, ভেতরে আলো জ্বলতে দেখে। দোকানের মধ্যে সব আলোগুলো জ্বলছে। তীব্র চোখ ঝলসানো আলোতেই চোখে পড়ল, কাউন্টারের সামনেই শিবানন্দ বসুর মৃতদেহটা পড়ে আছে। তার গলায় ফাঁস দেওয়া একটি আকাশ-নীল রঙের রুমাল।

রুমালটা দেখেছেন আপনি ?

হ্যাঁ, সেই একই ধরনের রুমাল। এবং রুমালের কোণে ইংরাজি সাঙ্কেতিক অক্ষর '4' লেখা এবারে।

মৃতদেহ এখন কোথায় ?

দোকানেই পড়ে আছে। দোকানে পুলিস-প্রহরা বসানো হয়েছে। রথীন আমার অনেককালের বন্ধু। সেই-ই দোকান থেকে আমাকে ফোন করায় তার থানায় আমি ছুটে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি সংবাদটা আপনাকে দিতে।

চল, একবার যাওয়া যাক সেখানে।...একটু অপেক্ষা কর বিকাশ, আমি এখুনি আসছি।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং মিনিট কয়েক পরেই বিকাশের জীপেই কিরীটী ও সুব্রতকে নিয়ে বিকাশ রওনা হল :

গাড়িতেই বসে সুব্রত সব শুনল।

দোকানের মধ্যে তখনও রথীন ছিলেন।

তিনি নানা ভাবে দারোয়ানটাকে প্রশ্ন করছেন তখন, অনেক কষ্টে তার জ্ঞান ফেরানো হয়েছে। বেচারা কেবলই বলছে, দোহাই হুজুরের, সে কিছু জানে না। রাত সোয়া দুটো কি আড়াইটে নাগাদ তার মালিক এসে তাকে ডাকাডাকি করতেই সে ঘুম থেকে উঠে দোকানের গেট খুলে দেয়।

তারপর কি হল, বল ?

আমি দরজা খুলে দিলাম, মালিক দোকানে এসে প্রবেশ করলেন।

তারপর ?

তারপর তাজ্জব কি বাৎ! মালিক সহসা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মাথায় একটা ভারি ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করতেই আমি পড়ে যাই—জ্ঞান হারাই। তারপর আর কিছু জানি না।

কিরীটী বললে, রথীনবাবু, কিছু চুরি বোধ হয় যায়নি ?

ঠিক বলতে পারছি না, তবে কোন তালা বা আয়রন সেফের তালা তো ভাঙা দেখছি না।

হুঁ! মৃতদেহটা কোথায় ?

ওই যে কাউন্টারের পেছনে।

হঠাৎ ওই সময় কিরীটীর নজরে পড়ে কাউন্টারের নিচে কি যেন একটা পড়ে আছে। ঝুঁকে জিনিসটা তুলে দেখেই সে চমকে ওঠে। কিন্তু সে কিছু না বলে সবার অলক্ষ্যে সেটা পকেটে রেখে দেয়।

অতঃপর সকলে উঁচু কাউন্টারের পেছনে এগিয়ে গেল।

মৃতদেহটা তখনও উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রেশমী রুমালটা কেবল গলা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে। গায়ে একটা শাল জড়ানো, পরনে ধুতি।

কিরীটী মুহূর্তকাল মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে আরও সামান্য একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে মৃতদেহটা উল্টে দিতেই মৃতদেহটা চিৎ হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বের হয়ে এল, এ কি!

কি হল ? একই সঙ্গে রথীন, সুব্রত ও বিকাশ প্রশ্নটা করে।

না, কিছু না। কিরীটী বললে।

সুব্রত এতক্ষণে চিনতে পারে। কিছুদিন আগে শশধরের মৃত্যুর পরদিন শিবানন্দ বসু পরিচয়ে যে আতঙ্কিত খঞ্জ ভদ্রলোকটি কিরীটীর গৃহে গিয়েছিল, এ সে লোক নয়।

সুব্রত বলে, তাই তো! এ কে তাহলে ?

রথীনের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী শুধাল, আর ইউ সিওর রথীনবাবু, ইনিই শিবানন্দ বসু ?

নিশ্চয়ই। দারোয়ান সনাক্ত করেছে, শিবানন্দর ছেলে একটু আগে এসেছিল, সেও তো সনাক্ত করে বলে গেছে, এ তারই বাপ। রথীন বললেন।

তবে—, কিরীটী যেন মুহূর্তকাল কি চিন্তা করে। তারপর বলে, রথীনবাবু, এখুনি আমাদের বেরোতে হবে।

কোথায় ?

হত্যাকারীকে ধরতে চান তো ?

হত্যাকারী! সে কি আর এতক্ষণ ত্রিসীমানায় কোথাও আছে ?

ত্রিসীমানায় না থাকলেও মহাশয় ব্যক্তিটি তার নিজস্ব ডেরায় সুস্থ বহাল তবিয়তেই নিশ্চিন্তে বসে বা শুয়ে আছে।

কি বলছেন ?

হ্যাঁ, চলুন—আর দেরি নয়। চল বিকাশ।

রথীন জানতেন কিরীটীকে, তার শক্তির কথাও জানতেন—ইতিপূর্বে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোন সুযোগ না ঘটলেও। কাজেই তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন না। সঙ্গের পুলিস-প্রহরীর জিম্মায় আপাততঃ দোকানঘর ও মৃতদেহ রেখে, বাইরে এসে বিকাশের জীপেই উঠে বসল সকলে।

বিকাশই জীপ চালাচ্ছিল। শুধালে, কোন্ দিকে যাব ?

বেলগাছিয়ায়।

বিকাশ বিনা বাক্যব্যয়ে জীপে স্টার্ট দিয়ে এগোতে লাগল।

সকাল নটা বাজে প্রায় তখন।

সুব্রতর কাছে তখনও সমস্ত ব্যাপারটা যেমন ঝাপসা, তেমনি অস্পষ্ট। সেও বুঝতে পারছিল না, কিরীটী কেন বেলগাছিয়ায় চলেছে।

রাস্তায় আর কথা হল না! কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, কেন তারা বেলগাছিয়ায় চলেছে!

সকালের দিকে রাস্তায় তখন তেমনি ভিড় জমে ওঠেনি।

বেলা পৌনে দশটা নাগাদ ওরা বেলগাছিয়া ব্রীজ ক্রস করে একটা সরু রাস্তার সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে কিরীটীর নির্দেশে সকলে নামল।

রথীনবাবু, আপনার সঙ্গে পিস্তল আছে ?

আছে। রথীন জবাব দেন।

চলুন।

॥ দশ ॥

সরু রাস্তাটা থেকে সকলে এসে একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্যে প্রবেশ করল।

আগে আগে কিরীটী, পশ্চাতে ওরা তিনজন। নিঃশব্দে ওরা তিনজন কিরীটীকে অনুসরণ করে।

একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কলিংবেলটা টিপতেই একজন প্রৌঢ় ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু লোকটা চারজনের মধ্যে পুলিসের পোশাক পরা দুজনকে দেখে হঠাৎ যেন কেমন বোবা হয়ে যায়।

তোমার মা বাড়িতে আছেন ?

মা !

হ্যাঁ। আছেন ? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

আছেন। লোকটি বলে।

কোথায় ?

দোতলায়। খবর দেব ?

না। আসুন রথীনবাবু। এস বিকাশ। বলে কিরীটীই প্রথমে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ভৃত্যটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিসের লোক বলে বাধা দিতে সাহস পায় না বোধ হয়।

দোতলায় উঠতেই সামনের ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে যে ভদ্রমহিলা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, বিকাশ ও রথীন তাকে চিনতে না পারলেও, সুব্রত তাকে চিনতে পারে।

নমস্কার সঞ্চারিণী দেবী। চিনতে পারছেন ! কিরীটীই কথা বললে।

সঞ্চারিণী বিশ্বাসের মুখের ভাবটা হঠাৎ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, না তো।

চিনতে পারছেন না ! কয়েকদিন আগেই তো আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল !

কোথায় বলুন তো ?

বলছি। আপনার 'তিনি'টি নিশ্চয় এখানেই আছেন ?

তিনি !

হ্যাঁ, হীরেন সরকার ?

তিনি এখানে থাকতে যাবেন কেন ?

যে কারণে আপনি সেদিন তাঁর ওখানে ছিলেন, সেই কারণেই হয়ত তিনিও আপনার এখানে ! সরে দাঁড়ান, আমরা ঘরে যেতে চাই—

ঘরে যাবেন !

কেন, আপত্তি আছে ? কিরীটী শুধোয়।

তা আছে বৈকি ! বিনা ওয়ারেণ্টে আমার ঘরে আপনাদের ঢুকতে দেব কেন ?

মিথ্যে চেষ্টা করছেন সঞ্চারিণী দেবী। তাকে পালাবার সুযোগ আপনি করে দিতে

পারবেন না। কারণ আমি জানি, ওই সিঁড়ি ছাড়া দোতলা থেকে নামবার আর কোন রাস্তা নেই। এ বাড়িটার details আপনাদের থিয়েটারেরই এক অভিনেত্রীর কাছ থেকে পূর্বাহ্ণেই আমার সংগ্রহ করা আছে।

সঞ্চারিণী বিশ্বাস যেন বোবা।

সরে দাঁড়ান।

সঞ্চারিণী সরে দাঁড়াল। সকলে ঘরে প্রবেশ করল।

শয্যার ওপরে কে যেন পেছন ফিরে আগাগোড়া একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

কিরীটী মুহূর্তকাল দাঁড়াল, তারপরই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে এক হেঁচকা টান দিয়ে কম্বলটা ফেলে দিতেই যে লোকটি উঠে বসল, সে হীরেন সরকার।

হীরেন সরকার বলে ওঠে, কে আপনারা? এসবের মানে কি?

হীরেনবাবু, নমস্কার। এঁরা দুজন থানা-অফিসার, আর আমাকে আপনার না চেনার কথা নয়—

না, আপনাকে আমি চিনি না—never seen you before in my life।

সুব্রতও অবাক হয়ে হীরেন সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিরীটী আবার ব্যঙ্গভরে বলে ওঠে, চিনতে পারছেন না? আশ্চর্য! আমার বাড়িতে গিয়ে আমার মুখোমুখি বসে শিবানন্দ বোস সেজে অত কথা বলে এলেন, আর এর মধ্যেই সব ভুলে গেলেন? না না, তাও কি হয়!

কি আবোল-তাবোল বকছেন মশাই! আট মাসের ওপর আমি—

আপনি পঙ্গু—শয্যাশায়ী, তাই না? আর তাইতেই বুঝি খোসমেজাজে একবার ল্যান্সডাউনের বাড়িতে আর একবার এখানকার বাড়িতে যাতায়াত করে থাকেন? শুনুন হীরেনবাবু, আর যার চোখেই ধুলো দিন না কেন, কিরীটী রায়ের চোখে আপনি ধুলো দিতে পারেন নি। প্রথম দিনই মোলাকাতের সময় আমার ওখানে আপনার সত্যকার পরিচয়টা আমার চোখের সামনে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

হীরেন সরকার বোবা।

হ্যাঁ, আপনার হাতের মীনা করা একটা আংটি—ওই যে এখনও আপনার ডান হাতের অনামিকায় রয়েছে, বাংলায় লেখা ওপরে 'হীরেন'—অন্য আংটিগুলো পরার সময় ওটা যদি খুলে রেখে যেতেন! কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছেন, পাপ আর গরল চাপা দেওয়া যায় না!

সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আংটিটার ওপরে।

সত্যিই আংটিটার ওপরে মীনা করা 'হীরেন' নামটা।

সহসা হীরেনের চোখেমুখে একটা হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। সে কালো কালো একঝাঁক দাঁত বের করে বললে, বেশ। মেনে নিলাম, আপনারওখানে শিবানন্দ ছদ্ম-পরিচয়ে আমি গিয়েছিলাম। তা তাতে হয়েছেটা কি ?

আর কিছুই হয়নি, কেবল ধরা পড়ে গেছেন।

ধরা পড়ে গেছি!

হ্যাঁ। আপনিই যে শ্রীমন্ত, হারাধন, শশধর ও শিবানন্দর হত্যাকারী—কি পাগলের মত যা তা বলছেন!

পাগল কিনা সেটা আদালতেই প্রমাণ হবে।

বেশ বেশ, তাই না হয় প্রমাণ করবেন। আপনারা আমার অতিথি—বসুন, চা খান। সঞ্চারিণী—, বলে উঁচু গলায় ডাক দিল হীরেন সরকার।

সঞ্চারিণী এসে ঘরে ঢুকল।

এঁদের চায়ের ব্যবস্থা কর, এঁরা আমার অতিথি।

এখানে চা পান করতে আমরা আসিনি হীরেনবাবু। উঠুন, আমাদের সঙ্গে এখুনি আপনাকে যেতে হবে। কিরীটী শান্ত কঠিন গলায় বললে।

যাব যাব, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? যেখানে খুশি নিয়ে যেতে চান আমাকে যাব—My mission is over, যে চারজন শয়তান একদিন ষড়যন্ত্র করে আমাদের পথে বসিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে কীটের মত শ্বাসরোধ করে ধ্বংস করেছি।

বিকাশ সেন অবাক হয়ে চেয়েছিল হীরেন সরকারের মুখের দিকে।

অবাক বিস্ময়েই শুনছিল যেন ওর প্রতিটি কথা।

লোকটা শয়তান, না বদ্ধ উন্মাদ!

হীরেন সরকার অতঃপর উঠে দাঁড়াল। রোগা, পাকানো চেহারা।

কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ।

পঙ্গুত্ব কোথাও তার শরীরে নেই।

এখন বুঝতে পারছি, সেদিন আপনার বুদ্ধির দৌড়টা যাচাই করবার জন্য আপনার সামনে শিবানন্দ পরিচয়ে না গেলেই হয়ত ভাল করতাম কিরীটীবাবু!

সবাই চুপ, কারও মুখে কোন কথা নেই।

হীরেন সরকার বলতে থাকে, আপনার কীর্তিকলাপ ও অত্যাশ্চর্য শক্তির সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন পরিচিত মিস্টার রায়। চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ আমাদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয়ের সৌভাগ্য না ঘটলেও, আপনার কথা শুনে শুনে মনে হত কি জানেন?

কি?

পড়তেন আপনি মুখোমুখি সেরকম একজনের পাল্লায়, বোঝা যেত সত্যিকারের আপনার ক্ষুরধারটা—যাচাই হয়ে যেত হাতে হাতে ব্যাপারটা। আর তাই ওই চার-চার বিশ্বাসঘাতক শয়তানের ধ্বংসযজ্ঞে নেমে পরপর তিনজনকে হত্যা করবার পরও যখন দেখলাম আপনার টনক নড়ল না, আর স্থির থাকতে পারলাম না।

নিজেই গেলেন আমার কাছে?

হ্যাঁ।

এবং সেটাই হয়ে দাঁড়াল আপনার জীবনের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল।

তা হয়ত হয়েছে। তবু জানি, আপনি ছাড়া বোধ হয় দুনিয়ায় কারও সাধ্য ছিল না আমাকে ধরে। ধরা পড়েছি বলে আমার কোনা দুঃখ নেই মিস্টার রায়, আমার প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ করেছি। I have done my duty!

কিন্তু এ কাজ কেন করতে গেলেন হীরেনবাবু? কেন যেন কিরীটীর মনের মধ্যে হীরেনের প্রতি একটা মমতা জাগে।

কেন করতে গেলাম!

হ্যাঁ। আইন ছিল দেশে, আইনের আশ্রয় নিলেই তো পারতেন।

কিছু হত না তাতে করে। আইনের সাধ্য ছিল না ওই পাষণ্ডদের কেশ স্পর্শ করে। ওই ধূর্ত শয়তান শৃগালের দলকে ধরা যেত না হাতেনাতে। তাই ওই পথটাই আমি বেছে নিয়েছিলাম।

তারপর একটু কেসে বললে হীরেন সরকার, কিন্তু আপনি সত্যি বলুন তো, আমাকে সন্দেহ করলেন কি করে?

যে মুহূর্তে জানতে পেরেছিলাম, ওরা চারজনই আপনাদের পূর্বতন কর্মচারী ছিল এবং ওদেরই জন্য আপনাদের ব্যবসায় ভরাডুবি হয়েছিল তখুনি—

কি?

ওদের হত্যার মোটিভটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তবে—

তবে?

মোটিভটা খুঁজে পেলেও তখনও স্থির নিশ্চিত হতে পারিনি, আপনাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে কে এ কাজ করেছেন! কিন্তু আপনার আমার গৃহে আসা ও তারপর আপনার হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার আটমাস আগে থাকতে পঙ্গু বনে যাবার ইতিহাস, আপনার অভিনয়-ক্ষমতা সব মিলিয়ে আপনার উপরেই আমার সন্দেহটা পড়ে।

কেবল কি তাই?

আরও আছে।

কি ?

সংবাদপত্র 'প্রত্যহে' প্রকাশিত ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনটাও চোখের দৃষ্টি আমার খুলে দিয়েছিল। আর শেষ ও মোক্ষম প্রমাণ—

কি ?

পকেট থেকে কিরীটী সোনার একটা সিগারেট কেস বের করল।

এই সোনার সিগারেট কেসটা! এটা শিবানন্দর দোকানের শো-কেসের তলায় পড়ে থাকতে আমার নজর পড়ায় সবার অলক্ষ্যে তুলে নিতেই আর মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্রও রইল না আমার।—চিনতে পারছেন এটা ?

হীরেন সরকার হেসে হাত বাড়াল—নিশ্চয়ই। দিন ওটা।

উঁহু, এটা আদালতের property এখন—

দেবেন না ?

না।

আদিম রিপু

ফোনের রিসিভারটা হাতে করেই সুভাষ বসে রইল।

রিসিভারটা যে ফোনের উপর নামিয়ে রাখবে তাও যেন ভুলে গিয়েছিল সুভাষ।

রিসিভারটা হাতের মধ্যেই ধরা থাকে।

আর সুভাষ শয্যার উপর বসে থাকে।

গীতা মারা গিয়েছে।

প্রতুল বলল, গীতা সুইসাইড করেছে—আত্মহত্যা করেছে গীতা।

কিন্তু কেন?

গীতা সুইসাইড করতে যাবে কেন? মাত্র তো কয়েক ঘণ্টা! রাত বারোটার পর গীতার বাড়ি থেকে ওরা তিন বন্ধু বের হয়ে গেছে, হাসি মুখে শুভরাত্রি জানিয়ে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে।

আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

গীতা থাকে বালিগঞ্জে, আর ওরা তিনজনেই থাকে উত্তর কলকাতায়। সুভাষ ফড়িয়া-পুকুরে, প্রতুল বিডন স্ট্রীটে, আর কুনাল শ্যামপুকুর স্ট্রীটে।

গতরাত্রে বাস-ট্রাম সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুভাষই তার গাড়িতে করে দুই বন্ধু প্রতুল ও কুনালকে যে যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়েছে।

গাড়িটা পোর্টিকোতেই এখনও পড়ে রয়েছে, গ্যারাজ করা হয়নি।

গ্যারাজ করবে কি গাড়ি, ঘুমে তখন তার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। বাড়িতে সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যি সদরের একটা ডুপলিকেট চাবি তার কাছে থাকে। দরজা খুলে সোজা এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। তাহলেও সীতারাম টের পেয়ে গিয়েছিল ও যখন ঘরের দরজা খুলছে। ওর ঘরের কাছে বারান্দায় সীতারাম বরাবর শোয়।

সীতারামের ঘুমটাও পাতলা।

দরজা খোলার শব্দ পেয়েই সীতারাম ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কে, দাদাবাবু?

হ্যাঁ রে।

এত রাত হল ফিরতে?

নীচের ল্যানডিংয়ের গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটায় ঢং করে তখন রাত দেড়টা বাজল।

কটা বাজল?

রাত দেড়টা।

সীতারামের প্রশ্নের জবাবে বলেছিল সুভাষ।

অনেক রাত করে কাল শুয়েছিল বলেই বোধ হয় সকাল সকাল ঘুমটা ভাঙেনি সুভাষের।

নচেৎ সাধারণতঃ সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যেই ঠিক ঘুম ভেঙে যায় সুভাষের।

আজ অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে।

খোলা জানালাপথে রোদ এসে ঘরে ঢুকেছে। কালকের মেঘলা আকাশ আর নেই।

মেঘমুক্ত পরিষ্কার নীল আকাশ।

সামনেই টেবিলের উপরে হাতঘড়িটার দিকে তাকাল সুভাষ।

বেলা সোয়া আটটা।

এখনও হয়ত ঘুম ভাঙত না। মাথার কাছে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দেই ঘুমটা ভেঙেছে।

গীতা নেই।

হঠাৎ কথাটা যেন আবার মনে পড়ে গেল। একটু আগে প্রতুলই তাকে ফোনে সংবাদটা দিল।

গীতাকে তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—মনে হচ্ছে সুইসাইড-ই করেছে।

আত্মহত্যা।

পাশেই ছোট একটা টেবিলের উপরে বিষের শিশি একটা পাওয়া গিয়েছে। একটা আইলোশনের শিশি। নীচে লেখা পয়জন—বিষ!

প্রতুল ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিল, একবার যাবি না ওখানে?

সুভাষ কোন জবাব দেয়নি।

জবাব দেবে কি সে! বিমূঢ়, কেমন যেন বোবা হয়ে গিয়েছে সুভাষ।

একসময় বিমূঢ় ভাবটা যখন কাটে সুভাষ হাতের রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল।

ফোনটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেজে উঠল। আবার রিসিভারটা তুলে নিল সুভাষ।

সুভাষ—

বল।

কি রে, কোন কথা না বলে কনেকশনটা কেটে দিলি? যাবি না গীতার ওখানে?

তুই কার কাছে শুনলি যে গীতা—

গীতার চাকর শম্ভু ফোন করেছিল, সে-ই প্রথমে জানতে পারে ব্যাপারটা। পুলিস এসেছে বাড়িতে। ও আর সৌদামিনী মাসী ছাড়া তো কেউ নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে।

ভয় পেয়েছে!

শম্ভু ভয় পেয়েছে কেন? সুভাষ প্রশ্ন করে।

ভয় পাবে না! কি রকম একটা unexpected ব্যাপার। শোন্, তুই বরং আমার বাড়িতে চলে আয়, আমি কুনালকেও একটা সংবাদ পাঠাচ্ছি আমার বাড়িতেই আসতে, তিনজনেই যাব।

সুভাষ কোন জবাব দেয় না।

কি রে, আসছিস তো?

আসছি।

প্রতুল ফোন ছেড়ে দেয়। সুভাষ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

গীতা সুসাইড—আত্মহত্যা করেছে!

কিন্তু কেন? তার মত শান্ত ধীর প্রকৃতির মেয়ে কোনদিন আত্মহত্যা করতে পারে সুভাষের যেন চিন্তারও অতীত ছিল।

গীতাকে তো ওরা এক-আধদিন নয়, প্রায় গত পাঁচ বছর থেকে চেনে। ওদের দলে গত পাঁচ বছর ধরে একসঙ্গে এক পার্টিতে কাজ করছে।

যেমন শান্ত ধীর গীতা তেমনি কোন সেন্টিমেন্টেরও ধার ধারে না। জীবনটাকে সে সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবেই নিয়েছিল।

বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে।

বাপ ছিল শহরের নামকরা ডাক্তার। বর্তমানে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বছর তিন হল। গীতার মাও সেখানে।

এক ছেলে এক মেয়ে—শান্তনু ও গীতা। শান্তনু বড়, শহরের নামকরা একজন সার্জন।

দিন পাঁচেক হল নেপালে রানা ফ্যামিলির কার একটা অপারেশনের ব্যাপারে গিয়েছে। আজ-কালই ফেরার কথা।

ভাই-বোন কেউ বিয়ে করেনি।

বাড়িতে ঠাকুর, ড্রাইভার, দারোয়ান, বুড়ী ঝি মানদা ও শম্ভুচরণ আর অভিভাবিকা

প্রৌঢ়া সৌদামিনী মাসী। সৌদামিনী মাসী নিঃসন্তান বিধবা। বিধবা হবার পর থেকেই গত পনরো-ষোল বছর বোনের কাছেই আছে। বোন ও ভগ্নীপতি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরী চলে যাবার পর বাধ্য হয়ে সৌদামিনী মাসিকেই সংসারের হালটা ধরতে হয়েছে।

সংসার তো ভারী!

পয়সার অভাব নেই, কলকাতা শহরে বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্কব্যালেন্স কোন কিছুরই অভাব নেই।

শান্তনুও প্রচুর উপার্জন করে।

গীতা এম-এ পাস করে পার্টি করে বেড়ায় এবং এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপিকা।

মাসী অনেক চেষ্টা করেছে ভাই-বোনকে বিয়ে দেবার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শান্তনু বলে, বুঝি মাসি, বিয়ে একটা করা উচিত আর ইচ্ছেও ষোল আনা আছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—

তার আবার মুশকিলটা কি? বিয়ে করলেই তো হয়। মাসী বলে।

মুশকিল হচ্ছে গীতা।

গীতা!

হ্যাঁ। ও বিয়ে করলেই আমি নিশ্চিন্ত। ঝাড়া হাত-পা একেবারে সটান গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারি।

গীতা পাশেই ছিল, সে মুখ ভেংচে বলে ওঠে, ওঃ, কী দরদ রে! গীতা না বিয়ে করলে উনি বিয়ে করতে পারছেন না! মনে করলেই তো হয় গীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সেটা শান্তনুর ব্যাপারেও মনে করে নিলে হয়।

সত্যি দাদামণি, বিয়ে কর না একটা। একটা বেশ sweet বৌদি আসবে।

আর আমার বুঝি একজন ভগ্নীপতির শখ নেই।

ইতর—গীতা বলে ওঠে।

ক্রুয়েল—শান্তনু জবাব দেয়।

হিপক্রিট্!

আনসিমপ্যাথেটিক!

কাওয়ার্ড!

আনসোস্যাল!

কথা-কাটাকাটি করতে করতে ভাই-বোন একসময় ক্ষান্তি দিয়েছিল।

গীতাই হাসতে হাসতে পরের দিন সবিস্তারে ব্যাপারটা বর্ণনা করেছিল ওদের তিন

বন্ধুর কাছে।

সত্যি, দাদামণিটা ভারী ইণ্টারেস্টিং।

ঐ সময় হঠাৎ প্রতুল বলেছিল, কিন্তু সত্যি গীতা, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো?

কিসের ব্যাপার?

বিয়ে কি সত্যিই তুমি করবে না নাকি?

করব না কবে আবার বললাম!

তবে?

কি তবে?

করছ না কেন?

মনের মতো স্বামী জুটবে তবে তো। যার তার হাত ধরে তো কিছু আর বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়তে পারি না।

প্রতুল বলেছিল আবার, কেন, আমাদের পার্টিতেও এত ছেলে রয়েছে—মিত্রা, রেবা, রীতি ওরা তো পার্টির ছেলেদেরই বিয়ে করল।

করেছে বটে, তবে ভুল করেছে।

ভুল!

হ্যাঁ। কমরেডদের ভিতর থেকে বিয়ে করা উচিত হয়নি। কারণ পার্টি-পলিটিকস্ ও সংসার-পলিটিকস্ সম্পূর্ণ দুটো আলাদা ব্যাপারকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করানো ওদের বুদ্ধির কাজ হয়নি।

কুনাল ঐ সময় বলেছিল, কিন্তু কারও প্রতি কারও যদি ভালবাসা হয়ই—

একটা কথা ভুলে যেও না কুনাল, পার্টির কর্মী হলেও প্রত্যেকে মানুষ মেসিন নয়। এবং কতকগুলো জায়গায় তাদের সংসারের আর দশজন মানুষের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই।

ল্যান্সডাউন যখন পুরোপুরি ল্যান্সডাউন হয়নি, গীতাদের বাবা ডাঃ সুকান্ত চক্রবর্তী এসে জায়গা কিনে বাড়ি তৈরী করেছিলেন।

তারপর অবিশ্যি ক্রমে বহু ঘর-বাড়ি তৈরী হয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে।

বাড়ির নাম নিরালা।

তিনতলা বাড়ির মধ্যে অনেকগুলো ঘর।

একতলার খান-দুই নিয়ে শান্তনুর চেম্বার এবং বাকি দুটো ঘরে গীতাদের পার্টির আড্ডা।

নন-রেজিস্টার্ড শাখা-অফিস।

দোতলার দুটো পাশাপাশি ঘরের একটাতে থাকে সৌদামিনী মাসী আর একটায়,

গীতা। বাকি সব খালিই পড়ে।

তিনতলায় শাস্তনুর আড্ডা।

ব্যাপারটা অবিশ্যি দাসী মানদাই প্রথমে জানতে পারে। সাধারণতঃ বেলা করে কখনও ওঠে না গীতা। কিন্তু বেলা সাতটা বেজে গেল, গীতা ওঠেনি দেখে মানদা ডেকে তুলতে গিয়েছিল দিদিমণিকে।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল—মাত্র ভেজানো।

ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই মানদা কেমন যেন থমকে দাঁড়ায়।

শয্যাটা এলোমেলো। আড়াআড়ি ভাবে গীতা শয্যার উপর শুয়ে। একটা হাত অসহায় ভাবে খাটের পাশ দিয়ে ঝুলছে, অন্য হাতটা ছড়ানো।

চোখ দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে, মুখটা ঈষৎ হাঁ করা। ডানদিকের কষ বেয়ে ক্ষীণ একটি রক্তের ধারা।

তবু সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মানদা এবং বুঝতে পারে গীতার দেহে প্রাণ নেই।

তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে আসে।

সোজা একেবারে একতলায়। শম্ভু ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে উপরে যাচ্ছিল গীতার ঘরে।

শম্ভু! চিৎকার করে ওঠে মানদা।

কি হল? চমকে ফিরে তাকায় শম্ভু।

ওটা রাখ, শীগ্‌গিরি ওপরে চল।

কেন? কি হয়েছে?

দিদিমণি—

কি হয়েছে দিদিমণির?

মরে গেছে।

সে কি!

হ্যাঁ—চল শীগগিরি—

শম্ভু তাড়াতাড়ি ছুটে তখুনি উপরে যায়। গীতার ঘরে ঢুকে গীতার দিকে চেয়ে সেও বুঝেছিল গীতা আর বেঁচে নেই, তবু সে বাড়ির পারিবারিক প্রৌঢ় চিকিৎসক ডাঃ সান্যালকে ফোন করে দেয়।

ডাঃ সান্যাল এসে দেখেন, শয্যার উপরে একপাশে একটা খালি পয়জন আই-লোশনের শিশি পড়ে আছে।

ব্যাপারটা সুইসাইড ভেবে তিনিই তখন নিকটবর্তী থানায় পুলিস অফিসারকে

ফোনে সংবাদ দেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিস এসে পড়ে।

নানারকম জেরা করে শম্ভু ও মানদাকে জানতে পারেন থানার ও. সি. মিঃ দস্তুরায় গতকাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত গীতা তার পার্টির বন্ধু সুভাষ, কুণাল ও প্রতুলকে নিয়ে আড্ডা দিয়েছে।

শম্ভু জানত গীতার ঐ তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা।

তখন সে প্রতুলকে ফোন করে।

প্রতুল এসে পৌঁছল বেলা তখন সাড়ে নটা।

থানার ও. সি. দস্তুরায় তখন গীতার শয়নঘরের পাশের ঘরে বসে মানদার জবানবন্দি নিচ্ছিলেন, সৌদামিনীর জবানবন্দি শেষ করে।

সোদামিনী বিশেষ কিছু বলতে পারেনি।

বয়েস হয়েছে, তাছাড়া ইদানীং চোখে ছানি পড়ায় ভাল দেখতে পায় না। বাতও আছে। কদিন ধরে বাতের কষ্টটা বেড়েছে।

গতকাল তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছিল। গীতা ঐ সময় নীচের তলায় তার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল।

মানদা তার জবানবন্দিতে বললে, দিদিমণি ও তার বন্ধুরা রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নীচের ডাইনিং হলে বসে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করে। গীতা নিজে মার্কেট থেকে মাংস এনে রান্না করেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার ওরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসে। বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে।

মানদা ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করে শুতে চলে যায়। তারপর সে আর কিছু জানে না। কখন দিদিমণির বন্ধুরা কত রাত্রে গিয়েছে, গীতা শুতে গিয়েছে—

কোথায় তুমি শোও?

নীচের তলায় একটা ঘরে।

অতঃপর শম্ভুচরণের ডাক পড়ল। এই বাড়িতে সে-ই সব চাইতে বেশীদিন ধরে কাজ করছে।

দাদাবাবু দিদিমণি যখন বলতে গেলে বাচ্চা তখন থেকে।

সে শোয় উপরেই একটা ঘরে।

দস্তুরায় প্রশ্ন করেন, তুমি কখন কাল রাত্রে শুতে যাও?

রাত বারোটা।

অত রাত হল কেন?

শুয়ে পড়েছিলাম, দিদিমণি ডেকে কফি দিতে বলল। কফি দিয়ে শুতে শুতে রাত বারোটা হয়ে যায়।

দিদিমণির বন্ধুরা কখন যায় জান? কত রাত হয়েছিল তখন?

ঠিক বলতে পারব না হুজুর, তবে কফি খাবার কিছু পরেই।

তখন তুমি কি করছিলে? শুয়ে পড়েছিলে কি আবার?

আজ্ঞে না। বসে একটা বিড়ি খাচ্ছিলাম। দিদিমণি ওদের বিদায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে তার ঘরে গেল।

তারপর?

আজ্ঞে আমার মনে পড়ছে একটা কথা, দিদিমণি বোধ হয় উপরে এসে আবার নীচে গিয়েছিল।

কখন?

মনে হয় ঘন্টাখানেক পরে।

কি করে বুঝলে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার পায়ের শব্দ পেয়েছিলাম।

সে যে তোমার দিদিমণিই কি করে বুঝলে? অন্য কেউ তো হতে পারে?

তা হতে পারে। কিন্তু আর কে হবে? মাসীমা তো কখন শুয়ে পড়েছেন—মানদাও শুয়ে পড়েছিল। আমিও আমার ঘরেই ছিলাম। তাই মনে হয় দিদিমণিই।

দত্তরায় অতঃপর আরও কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করে শম্ভুচরণকে নিষ্কৃতি দিলেন।

প্রতুল, সুভাষ ও কুণাল ঐ ঘরেই দাঁড়িয়েছিল। এবারে তাদের কয়েকটা প্রশ্ন করলেন।

একটা প্রশ্ন বিশেষ করে তিনজনকেই জিজ্ঞাসা করলেন, গীতার সঙ্গে তো তাদের অনেক দিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা, সুইসাইড করবার মত কোন কারণ ছিল কিংবা ঘটেছিল কিনা গীতার?

তিনজনেই বলে, না।

প্রতুল বললে, গীতা সুইসাইড করতে পারে কথাটা যেন এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ দত্তরায়। She was full of life and energy—তার কোন অভাব ছিল না বা কোন problemও ছিল না, তবে কেন সে সুইসাইড করতে যাবে!

মিঃ দত্তরায় তখনকার মতো মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন।

॥ দুই ॥

পরের দিন সকালেই জরুরী তার পেয়ে গীতার দাদা শান্তনু প্লেনে কলকাতায় ফিরে এল। গীতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা যেন তাকে কেবল মর্মাহতই নয়, যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। আইলোশনের শিশিটা গীতারই চোখে দেবার জন্য ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছিল।

সবাই বলছে, গীতা সুইসাইড করেছে ঐ বিষাক্ত লোশন খেয়ে। কিন্তু কেন? কোন্ দুঃখে সে সুইসাইড করতে যাবে? বোনকে তো সে কোনদিন এতটুকু অনাদর করেনি, তার কোন কাজে কোনদিন বাধা দেয়নি, কখনও ভুলেও এতটুকু তিরস্কার করেনি—তবে?

তাছাড়া গীতার মত বুদ্ধিমতী, বিবেচক, প্রাণচঞ্চল মেয়ে আত্মহত্যা করেছে—কথাটা যেন ভাবাও যায় না।

নিজের ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল শান্তনু। দত্তরায় এলেন।

শান্তনুবাবু, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আজ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু রিপোর্টটা সম্পূর্ণ অন্য রকম বলছে।

অন্য রকম!

হ্যাঁ, cause of death—বিষ নয়।

তবে? উৎকণ্ঠিত শান্তনু দত্তরায়ের মুখের দিকে তাকায়।

গীতা দেবী সুইসাইড করেননি। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা! কি বলছেন আপনি?

তাই। গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা করা হয়েছে তাকে? কে—কে তাকে হত্যা করল?

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মনে হচ্ছে বাড়ির মধ্যেই কেউ। কারণ সে-সময় তো বাইরের কেউ ছিল না। আচ্ছা, আপনাদের ঐ চাকর শম্ভুচরণ—

না না, এ আপনি কি বলছেন! শম্ভু একপ্রকার গীতাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে—

তাহলেও পুরনো চাকরবাকরের অমন দুষ্কৃতির নজিরেরও অভাব নেই।

কিন্তু কেন—কেন সে গীতাকে হত্যা করবে?

সে কথা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারব না আরও ইনভেসটিগেশন না করে।

শম্ভুকে একবার আমি থানায় নিয়ে যেতে চাই। তাকে একবার ডাকুন।

কিন্তু আশ্চর্য!

শম্ভুকে ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না। এবং খোঁজ করে জানা গেল, গত রাত থেকেই নাকি শম্ভু নেই।

কোথায় গেল শম্ভু?

মানদা বললে, তা তো জানি না।

আমাকে এ কথা এতক্ষণ জানাওনি কেন? শান্তনু প্রশ্ন করে।

ভেবেছিলাম আপনিই হয়ত তাকে কোন কাজে কোথাও পাঠিয়েছেন দাদাবাবু। মানদা বলে।

॥ তিন ॥

শম্ভুচরণ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। দুদিন ধরে সারা কলকাতা শহর তোলপাড় করেও তার কোন সন্ধান করা গেল না। পুলিস হন্যে হয়ে যেন শম্ভুচরণকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার গ্রামের বাড়িতেও ধাওয়া করেছিল পুলিস, কিন্তু সেখানেও তার কোন সন্ধান পায়নি।

পুলিসের একপ্রকার ধারণাই হয়ে গিয়েছে, ঐ শম্ভুচরণই দোষী। সে-ই গীতাকে হত্যা করেছে।

শান্তনু কিন্তু এখনও বলছে, শম্ভু গীতাকে হত্যা করতেই পারে, কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। তবে শম্ভুচরণ গীতাকে না হত্যা করলেও, কেউ-না-কেউ হত্যা করেছে তাকে ঠিকই—কিন্তু সে কে? কে হত্যা করতে পারে গীতাকে? আর কেনই বা হত্যা করল? গীতার মৃত্যু হয়েছে, কথাটা যেন এখনও কিছুতেই ভাবতে পারছে না শান্তনু।

হঠাৎ মনে পড়ে শান্তনুর একজনের কথা। প্রেসিডেন্সিতে একসময়ে বছর-দুই পড়েছিল। তারপর দুজন দুদিকে চলে যায়। তাহলেও মধ্যে মধ্যে দেখা হয়েছে।

তার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর দেরি করে না শান্তনু, সেইদিনই সন্ধ্যার দিকে সোজা তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

বাইরের ঘরেই ছিল সে, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। শান্তনুকে দেখে বলে, এস শান্তনু, বস।

শান্তনু বসল। একটু পরে ভদ্রলোককে বিদায় করে দিয়ে সে তাকাল শান্তনুর মুখের দিকে। বললে, অনেক দিন পরে দেখা তোমার সঙ্গে। কিন্তু কি ব্যাপার? মুখ দেখে যেন মনে হচ্ছে, you are very much worried—খুব চিন্তিত!

কিরীটী!

শান্তনুর ডাকে কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল. বস, একটু চায়ের কথা বলে আসি।

ওসব এখন থাক ভাই। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই আমার এক বোন ছিল—ঐ একটি মাত্রই বোন গীতা, তাকে গলা টিপে গত শনিবার রাত্রে কে যেন হত্যা করেছে।

হত্যা করেছে!

হ্যাঁ। প্রথমে সবার ধারণা হয় ব্যাপারটা বুঝি সুইসাইড, কিন্তু পরে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলছে, না, গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কোথায়?

তার শোবার ঘরে।

কিরীটীর অনুরোধে তখন শান্তনু সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া বলে যায়, তারপর বলে, কিন্তু কে—কে হত্যা করতে পারে গীতাকে? কেনই বা হত্যা করল? পুলিসের ধারণা বাড়িরই কেউ—আর ঐ শম্ভুচরণই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

কিরীটী জবাবে কিছু বলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর একসময় বলে, ঐ যে তিনটি ছেলের নাম করলে, গীতার সহকর্মী ও বিশেষ পরিচিত—কুনাল, প্রতুল ও সুভাষ—ওরা কি বলছে?

ওরা তো রীতিমত shocked!

ওদের তো তুমি সকলকেই চেন?

হ্যাঁ, খুব চিনি।

কি রকম মনে হয় ওদের?

কালচার্ড, সভ্য—আর যতদূর মনে হয় ওরা গীতাকে সত্যিই ভালবাসত।

They are all bachelors? কেউই বিয়ে করেনি?

না।

কে কি করে?

সুভাষের অবস্থাই ওদের মধ্যে সব চাইতে ভাল। কোন রকম চাকরিবাকরি করে না, পার্টি নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। লেখাপড়া বোধ হয়—বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল। কুনাল প্রফেসারী করে, তাছাড়া একজন কবি। অবস্থা মোটামুটি। প্রতুল একটা সংবাদপত্রের অ্যাসিস্টেন্ট

এডিটর। ওদের পার্টির একজন প্রচণ্ড উৎসাহী পাণ্ডা। সুভাষকে মনে হয়েছে আমার একটা অহংকারী ও উদ্ধত প্রকৃতির, কুনাল খুব শান্ত ও নিরীহ, প্রতুল ভীষণ বদরাগী ও অস্থির প্রকৃতির; একসময় কলেজ জীবনে নামকরা একজন অ্যাথলেট ছিল।

কাল সন্ধ্যার দিকে ওদের একটিবার তোমার বাড়িতে ডাকতে পার? ওদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চাই আমি।

বেশ তো।

পরের দিন সন্ধ্যায়—নিরালায়। এক এক করে প্রশ্ন করছিল ওদের কিরীটী।

প্রথমেই প্রতুল। দু-চারটে কথাবার্তার পর কিরীটী প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে, এবারে একটা কথার শুধু স্পষ্ট জবাব চাই প্রতুলবাবু, আপনি গীতাকে ভালবাসতেন এবং গীতাও আপনাকে ভালবাসত জানি। আপনাদের পরস্পরের ঐ ভালবাসার মধ্যে কি কোন কারণে চিড ধরেছিল?

চিড!

হ্যাঁ, কারণ ঐ ধরনের ভালবাসা যেমন selfish তেমনি blind—অন্ধ। কখনও কখনও তাই সামান্যতম কারণেও, সামান্য সন্দেহে—

না, সেরকম কিছু ঘটেনি। কারণ সামনেই জানুয়ারীতেই আমরা বিয়ে করব স্থির ছিল—

এ কথাটা কুনাল ও সুভাষবাবু জানতেন?

স্পষ্ট করে আমরা না বললেও, ওরা বোধ হয় সন্দেহ করেছিল।

কিসে বুঝলেন?

মধ্যে মধ্যে ওদের কথাবার্তায় ইদানীং মনে হত।

আপনারা তিনজন সহকর্মী ও বন্ধু জানি, দীর্ঘদিনের পরিচিতও—ওদের দুজনার মধ্যে কাকে আপনি বেশী পছন্দ করেন?

সুভাষ অত্যন্ত selfish—আত্মসর্বস্ব, আর একটু অহংকারীও। I like কুনাল more than সুভাষ।

আচ্ছা সে-রাত্রে কখন ঠিক—মানে কত রাত্রে আপনারা বের হয়ে যান এই নিরালা থেকে মনে আছে?

হুঁ, মনে আছে—রাত বারোটা বেজে পনেরো মিনিট।

সে-সময় গীতাকে আপনার কি রকম মনে হয়েছিল?

অত্যন্ত স্বাভাবিক, হাসিখুশি।

আর একটা কথা প্রতুলবাবু, গীতার মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার ঐ দুই বন্ধুর মধ্যে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন ?

না, না। এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায় !

প্রেম মানুষকে যেমন দুর্বল অসহায় ভীরু করতে পারে, তেমনি অন্ধ অবিবেচক হিংস্রও করে তুলতে পারে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলি, এই প্রেম—যার অন্য সংজ্ঞা পুরুষ বা নারীর একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ, যেটাকে মানুষের আদিম রিপুও বলতে পারেন।···আচ্ছা ঠিক আছে, আপাততঃ আর আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। আপনি যেতে পারেন।

॥ চার ॥

বসুন কুনালবাবু।

কিরীটীর আহ্বানে কুনাল সামনাসামনি সোফাটার উপর বসল। মামুলী কয়েকটা প্রশ্নের পর তাকেও কিরীটী ঐ একই প্রশ্ন করে।

চিড় ধরেছিল কিনা জানি না, কুনাল বলে, তবে প্রতুলের সঙ্গে যে আড়ালে-আবডালে একটা ব্যাপার ওর চলেছে আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেটা। আর তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে আমাদের কথা-কাটাকাটিও হয়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। আমি সবটাই গীতাকে বলেছিলাম। তার মনের মধ্যে যদি অন্য কিছু থাকে সে আমাকে যেন স্পষ্টই বলে দেয়। আমি একটি বোকা বনতে চাই না।

কি বলেছিল তাতে গীতা ?

বলেছিল, আমার পছন্দমত কাউকে বিয়ে করারও কি আমার অধিকার নেই, তুমি বলতে চাও কুনাল !

কেন থাকবে না ? কিন্তু বিট্রে করবার নিশ্চয়ই তোমার কোন যুক্তি নেই !

তাতে কি জবাব দিয়েছিল গীতা ?

মৃদু হেসেছিল কেবল।

কুনালবাবু, আর একটা কথা, গীতার মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার ঐ দুই বন্ধুকে কোন রকম সন্দেহ করেন ?

কুনাল চুপ করে থাকে।

কি, জবাব দিচ্ছেন না যে !

জানি না। তবে প্রতুল—ওকে আমি বিশ্বাস করি না, রাগলে ওর অসাধ্য কিছু নেই।

সর্বশেষে এল সুভাষ।

কিরীটীর সেই একই প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলে, রাত ঠিক বারোটা পনের।

আপনার গাড়ি করেই তো সকলকে আপনি পৌঁছে দেন?

হ্যাঁ।

রাত কটায় আপনি বাড়ি ফিরে যান?

তা একটা হবে।

কি রকম speed-এ আপনি গাড়ি চালান?

বেশ একটু speed-এ চালাই।

আচ্ছা সুভাষবাবু, আপনি কি জানতেন যে আপনার বন্ধু প্রতুলবাবুর সঙ্গে গীতা দেবীর বিয়ের ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল?

জানব না কেন?

জানতেন! তারাই বুঝি আপনাকে জানিয়েছিল—গীতা ও প্রতুলবাবু?

হ্যাঁ—না—they were coward; সোজা কথা স্পষ্ট করে যারা বলতে পারে না, বলবার courage রাখে না—তাদের আমি ঘৃণা করি। সুভাষের কণ্ঠস্বরে যেন একটা বিরক্তি, ঘৃণা ঝরে পড়ল। অথচ ব্যাপারটা নিয়ে লুকোচুরি করবার কিছুই ছিল না, আর জানালেও যে আমরা কেউ ভেঙে পড়তাম হতাশায় তাও নয়।

আপনি কি করে প্রথম কবে জানতে পারলেন ব্যাপারটা? কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে।

কি করে জানলাম সেটা বলব না, তবে মাসখানেক আগে জানতে পারি প্রথম।

আপনি যে জানতে পেরেছেন সেটা ওদের জানিয়েছিলেন?

না।

কেন?

ওসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা আমার রুচি ও শিক্ষায় বেধেছিল বলে।

নোংরা ব্যাপার!

তাছাড়া কি? যারা ভালবাসার নাম করে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের দেহ নিয়ে টানাটানি করে তাদের সবটাই নোংরামি। যাদের রুচি আছে, শিক্ষা আছে—তাদের অতখানি

বিকৃতি কখনও হয় না।

কিরীটী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, মনে হচ্ছে আপনি গীতাকে ভালবাসতেন—if I am not wrong!

ক্ষেপেচেন? ভালবাসতে যাব আমি ঐ মনোবৃত্তির একটা তুচ্ছ মেয়েছেলেকে? গীতা জানত না যে তাকে আমি কতখানি ঘৃণা করতাম, তার চরিত্রের ঐ দুর্বলতা আর হ্যাংলামির জন্য!

তাহলেও বুঝতে পারছি, কখনও সে কথা গীতাকে আপনি জানতে দেননি—নচেৎ সব কিছু জানবার পরও আপনি তার সঙ্গে মিশতেন না বা হেসে কথা বলতেন না।

বরং বলুন অতখানি নীচে কখনও আমি নামতে পারিনি!

আপনি বোধ হয় শুনেছেন গীতার মৃত্যুর কারণ বিষ নয়?

বিষ নয়!

না, কেউ তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে সে-রাত্রে।

না, না,—তা কেন হবে—

তাই। ময়নাতদন্তেও তাই বলেছে। আচ্ছা কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?

না।

অতঃপর সেদিনকার মত কিরীটী সকলকে বিদায় দিল।

দিন-দুই পরে।

সন্ধ্যারাত্রি তখন। কিরীটী হঠাৎ গিয়ে হাজির হল সুভাষের গৃহে। সুভাষ গৃহে ছিল না।

সীতারাম বললে, দাদাবাবু তো বাড়িতে নেই!

কোথায় গিয়েছেন জান?

না।

কখন ফিরবেন, তাও জান না?

না।

তোমার নাম কি?

আজ্ঞে সীতারাম।

কতদিন এ বাড়িতে আছ?

তা দশ-বারো বছর হবে।

তুমি শুনেছ বোধ হয় গীতা দিদিমণি মারা গিয়েছেন?

শুনেছি বৈকি বাবু। আহা দিদিমণি বড ভাল ছিল। হাসি ছাড়া কখনও দেখিনি।

এখানে আসত না?

হ্যাঁ, প্রায়ই আসত।

তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল, তাই না?

আজ্ঞে। আমি তো ভেবেছিলাম দাদাবাবু গীতা দিদিমণিকেই বিয়ে করবে।

আচ্ছা সেদিন রাত্রে কখন তোমার দাদাবাবু ফিরেছিল মনে আছে?

রাত তখন একটা হবে। না—ঠিক তা নয় বোধ হয়, রাত প্রায় দেড়টা হবে।

একবার বলছ রাত একটা, আবার বলছ রাত দেড়টা—

হ্যাঁ, বাবু, ঘড়িটা আধ ঘণ্টা স্লো হয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ছে আমার—

ঘড়িটা আধ ঘণ্টা স্লো হয়ে গিয়েছিল কি রকম?

হ্যাঁ, পরের দিন দেখি—দাদাবাবু গীতা দিদিমণির বাড়ি থেকে ফিরে এসে ঘড়িটা ঠিক করছে। আধ ঘণ্টা এগিয়ে দিলে দেখলাম।

কোন্ ঘড়িটা?

সীতারাম ঘড়িটা দেখিয়ে বলে, ঐ ঘড়িটা।

ওটা স্লো-ফাস্ট থাকে নাকি?

কখনও না। একেবারে ঠিক ঠিক টাইম দেয়। কখনও আগে-পিছে হতে গত দশ বছর দেখিনি।

আচ্ছা সীতারাম, আমি চলি।

কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন, কি নাম আপনার—বললেন না তো?

আমি আবার আসব। কথাটা বলে বের হয়ে এল কিরীটী।

সেখান থেকে বের হয়ে কিরীটী সোজা গেল নিরালায়।

শান্তনু গৃহেই ছিল।

শান্তনু!

বল?

তুমি সেদিন বলেছিলে না, তোমার মাসী গীতার পাশের ঘরেই শোন!

হ্যাঁ, কেন বল তো?

তাঁকে একটিবার ডাকবে? তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

শান্তনু তখনি গিয়ে সৌদামিনীকে ডেকে নিয়ে এল।

বসুন মাসীমা। কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব।

কি বাবা?

রাত্রে আপনার ঘুম হয় কেমন?

ঘুম কি আর চোখে আছে—

সে-রাত্রে তো আবার বাতের ব্যথাটা আপনার বেড়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, সাড়ে বারোটা পৌনে একটার সময় কোনরকম শব্দ বা চেঁচামেচি শুনেছিলেন পাশের ঘরে?

চেঁচামেচি নয়, তবে—

বলুন—থামলেন কেন?

দেখ বাবা—সেদিন আমি দারোগাবাবুকে বলিনি, তবে আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে সে-রাত্রে গীতা যেন কার সঙ্গে কথা বলছিল—

আর কিছু শোনেননি?

না।

ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।

মাসী চলে যাবার পর কিরীটী বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলে, ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে শান্তনু।

কি? কিছু জানতে পেরেছ?

হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি কে তোমার বোনকে হত্যা করেছে।

কে? শম্ভু?

না। ভাল কথা, শম্ভুকে পাওয়া গেছে জান না?

না তো! কোথায়? কখন?

মেদিনীপুরে এক গাঁয়ে তার আত্মীয়-বাড়িতে।

সে পালিয়েছিল কেন?

ভয়ে।

ভয়ে!

হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা তুমি কি জানতে, গীতা প্রতুলকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছিল?

জানতাম।

And that is the cause—

কি বলছ তুমি?

তাই। প্রতুল সুভাষ ও কুনাল তিনজনই গীতাকে ভালবাসত—সবাই মনে মনে গীতাকে চাইছিল, কিন্তু গীতা যখন প্রতুলকে বেছে নিল জীবনে, ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল। যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাকে ঐ নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে হয়।

সত্যি বলছ ?

হ্যাঁ। প্রেম যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, তেমনি প্রচণ্ডতম নিষ্ঠুর ও হিংস্র হতে পারে। আর এক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই—

কিন্তু কে ?

গীতার তিন বন্ধুরই মধ্যে একজন।

কে ?

কাল বলব। তুমি ওদের তিনজনকে কাল সন্ধ্যায় ডেকে পাঠাও।

পরের দিন সন্ধ্যায়।

ঘরের মধ্যে সকলেই উপস্থিত। শান্তনু, কিরীটী, দত্তরায়, সুভাষ, কুনাল ও প্রতুল।

কিরীটী বলছিল, আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হবেন শুনলে, গীতাকে আপনাদের তিন-জনের মধ্যেই একজন খুন করেছেন !

প্রতুল বলে, কি আবোল-তাবোল বকছেন মশাই ?

আবোল-তাবোল নয়, নিষ্ঠুর সত্য—

সুভাষ বলে, কিন্তু আমরা তো কেউ সে-রাত্রে ছিলামই না। একসঙ্গে তিনজন বের হয়ে যাই।

গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু আবার সে-রাত্রে ফিরে আসা তো অসম্ভব কিছু ছিল না !

তার মানে ? সুভাষ বলে।

তার মানে ভেবে দেখুন, কে এবং আপনাদের তিনজনের মধ্যে কার পক্ষে সে-রাত্রে আবার ফিরে আসা সম্ভবপর ছিল !

কার ?

কেন—আপনি সুভাষবাবু ! আপনার গাড়ি ছিল, আপনি বন্ধুদের পৌঁছে দিয়ে এখানে সোজা আবার চলে আসতে অনায়াসেই পারতেন না ! আর তাই হয়েছিল, আপনি সে-রাত্রে আবার ফিরে আসেন নিরালায়।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি !

মাথা যে আমার খারাপ হয়নি, আপনার চাইতে সে-কথা আর কেউ ভাল জানে না সুভাষবাবু। আর আপনি যে ফিরে এসেছিলেন তার প্রমাণও আছে।

প্রমাণ! প্রশ্নটা প্রতুল করে এবার।

হ্যাঁ। ১নং, সে-রাত্রে গীতার ঘরে কথাবার্তা শুনেছিলেন মাসীমা, আপনারা তো কেউ সে-রাত্রে উপরে গীতার ঘরে আসেননি, নীচ থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন। শান্তনুও বাড়ি ছিল না। তবে সে কে? ২নং, সে-রাত্রে গীতা ওপরে আসবার পরও শম্ভুচরণ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেছিল। সে কার পায়ের শব্দ? ৩নং, আপনার বাড়ির ঘড়ির কাঁটাটা আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানটা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এর পরও অস্বীকার করতে চান সে-রাত্রে আবার আপনি আসেননি?

হঠাৎ সুভাষ হো হো করে হেসে ওঠে—চমৎকার। যদি ধরুন আমিই—প্রমাণ কি তার?

হ্যাঁ। ৪নং, এই রুমালটা আপনার—কোণে আপনার নামের মনোগ্রাম করা আছে দেখুন।

সুভাষ একেবারে বোবা। যেন পাথর।

এটা কোথায় পাওয়া গেছে জানেন? গীতার ঘরে। এটাই শম্ভুচরণ পাঠিয়েছে। আপনাকে—

শম্ভু!

হ্যাঁ, তাকে আপনি ভয় দেখিয়ে কলকাতা ছাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ আপনার সন্দেহ হয়েছিল সে কিছু জানে। বেচারী ভয় পেয়ে পালিয়ে না গেলে হয়ত শেষ পর্যন্ত এই মোক্ষম প্রমাণটা তার কাছ থেকে পেতাম না—আপনি হয়ত তাকেও হত্যা করতেন। শুনুন সুভাষবাবু, সেদিন আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রোশ আপনার কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছিল গীতা সম্পর্কে, সেটাই আমাকে সর্বপ্রথম অনুসরণের আলো দেখায়।

সুভাষ নির্বাক।

—সমাপ্ত—